পুণ্য কাহিনী

দেবতারে দেখিনিত কভু জানিনাত সে কেমন তর।
তুমি পিতা দেবতা আমার তুমি মোর সকলের বড় ॥

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥

সংগ্রাহিকা—পুষ্পদেবী

সংগ্রাহিকা
শ্রীমতী পুষ্পদেবী,
১৯৩ ল্যান্স ডাউন রোড ।
কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫৫

মুদ্রাকর
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

পিতৃদেবের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু—
ডাঃ হেমেন্দ্র নাথবক্সী ও
শ্রীবিনোদবিহারী সরকার মহাশয় দ্বয়ের করকমলে—

দুঃখের দিনে দিলে যে গভীর স্নেহ
ভরা সে কাহিনী মনের সোনার পাতে,
নয়নের জলে পিতার পুণ্য স্মৃতি,
লিখিয়া দিলাম তোমাদের ওই হাতে।
দূর্ব্বা যেমন পদতলে সদা থাকে
কত শত জন যায় তারে পায়ে দলে,
পূজার তরেতে আহরি দূর্ব্বা সেই
সাজায় অর্ঘ্য দেবতা চরণমূলে।
তেমনি এ লেখা ভালো যদি নাহি হয়,
তনয়ার শত অক্ষম ত্রুটী লয়ে,
তবু ম্লান নাহি হবে সে কখনো হীন
দেব চরিত্র পরশ মানিক ছুঁয়ে।
অক্ষম লেখা ভাষার দীনতা শত
পড়িবেই জানি সবার দৃষ্টি পথে,
নিজের দৈন্য মেনে নিয়ে নত মুখে
পুণ্য কাহিনী গাহিলাম কোন মতে।
পরশমাণিকে ছুঁয়ে সব হবে সোনা
মুগ্ধ পরাণ হবে সে বাক্যহারা,
সুন্দরতম হয়ে সে উঠিবে ফুটি
স্মরিয়া তাঁহার দেব চরিত্র ধারা।

পুষ্প

ভূমিকা

সংসারে কত লোক আস্‌ছে, কতলোক চ'লে যাচ্ছে—অনন্ত সৃষ্টির এই চিরন্তন ধারা এর মধ্যে কেউ কেউ তাঁর জীবনের কার্য্যকলাপের ভেতর দিয়ে এমন একটা ছাপ্‌ রেখে যান, যাকে আশ্রয় ক'রে অনাগত ভবিষ্যৎ সতেজ ও সমৃদ্ধ হয়। তাঁদের জীবন কাহিনী সমাজের একটা অমূল্য সম্পদ কিন্তু সমাজের এমনি ভাগ্য যে এই সম্পদ সব সময় আহরণ ক'রে রাখবার তার হয় না সুযোগ।

ধার্ম্মিক মহাপুরুষদের জীবনী ধর্ম্ম জগতের পথ প্রদর্শক, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি যুগ প্রবর্ত্তক মনীষীদের নব নব উদ্ভাবনী নব নব সৃষ্টির সহায়ক, বিপ্লবী দেশপ্রেমিকের বীরত্ব কাহিনী, আত্মত্যাগ, অপূর্ব্ব উন্মাদনার অবশ্যম্ভাবী পরিপূরক। এঁদের জীবনগাথা যেমন জগতের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি যাঁ'রা দেশের সর্ব্বহারার জন্যে জীবন ভ'রে অশ্রুপাত ক'রে যান, তাদের সুখ দুঃখের সাথী হ'য়ে জীবনের শেষ রক্তবিন্দুপাত করেন, তাদের কাজের গণ্ডী ছোট হলেও সমাজের কল্যাণের দিক দিয়ে বিচারে তাঁদের আদর্শও বিরাট মহীয়ান। তাঁরাও ওঁদেরই মত চির নমস্য। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যাঁর জীবন কাহিনী সঙ্কলিত হ'লো, সেই দেব চরিত্র সুকুমার বাবুও ছিলেন, এমনি একজন খাঁটী দরদী সমাজসেবী কর্ম্মী তাঁর প্রতিভা যে কত বিভিন্নমুখী ছিল, তার জলন্ত প্রমান হ'চ্ছে, তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধবের সুধীবর্গের দেশ বিদেশ থেকে লেখা চিঠি। প্রতি দিনের অতি ক্ষুদ্র কাজেও পরিচয় পাওয়া যেতো, তাঁর বিরাট অন্তঃকরণের। তাঁর সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী পুষ্পরাণী দেবী বুকভরা ব্যথা নিয়ে গুছিয়েছেন পিতার পুণ্যস্মৃতি—অর্ঘ,—ধন্য সেই পিতা, যিনি রেখে যেতে পারেন এমন সন্তান, যে তার ব্যথার বোঝা খালি করতে দুয়ারে দুয়ারে বিলিয়ে দিতে পারে, পিতার "পুণ্য কাহিনী"—

৩২ বি রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার — নিবেদক

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

যাঁকে ভালবাসি যাঁকে ভক্তি করি, মৃত্যুর পরে তাঁর পুণ্য স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার ইচ্ছা স্বাভাবিক ও সান্ত্বনার বিষয় হ'লেও, এই পুস্তিকা সংকলনে লেখিকার প্রয়াস কেবল এই দুটি কারণ প্রণোদিত নয়। আমরা, যারা রায় বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটু নিবিড় ও অন্তরঙ্গ ভাবে জানতাম, তাঁর মধ্যেএমন কিছুর সন্ধান পেয়েছিলাম যা' সচরাচর চোখে পড়ে না আর যাকে ঠিক "সাধারণ" আখ্যা দেওয়া চলে না। এই অসাধারণ কিছুর সঙ্গে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেবার ভার পড়েছে, তাঁর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী পুষ্পরাণীর ওপর—সোজাসুজি এইটুকু বল্লেই বোধ হয় পুস্তিকাটির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হবে।

সুকুমার বাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পরে সংযুক্ত বাংলার ইনস্পেক্টর জেনেরাল অফ রেজিষ্ট্রেশন হিসাবে তাঁর কার্য-দক্ষতা রাজ-সরকার পুরস্কৃত করেছিলেন "M. B. E" ও "রায় বাহাদুর" খেতাব দিয়ে। তারা পেয়েছিল তাঁর মেধার, তৎপরতার, বিশ্বস্ততার ও নির্ভিকতার পরিচয়—তাঁর মনের পরিচয় তারা পায় নি! বহুমুখী প্রতিভার পশ্চাতে ছিল তাঁর কোমল অন্তঃকরণ যার প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর গোপন দানে নৈহাটিতে অস্পৃশ্যদের উন্নয়ন কার্য্যে, নিরক্ষর দুর্গতদের মানুষ ক'রে তোলবার প্রচেষ্টায়।

১৯২৮ সালে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তিনিই প্রথম জন-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর অধীনস্থ শত শত সাব রেজিষ্ট্রারদের সহযোগে তিনি গ্রামে গ্রামে বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন ও শিক্ষা বিস্তারে বহু অর্থ ব্যয় করেন, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান "বঙ্গীয় বয়স্ক-শিক্ষা পরিষদের" একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও কর্ম্মী ছিলেন।

তাঁর অনমনীয় মনোভাব, স্পষ্টবাদীত্ব, নির্ভিক প্রতিবাদ, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর অসহিষ্ণু ও অধৈর্য্য প্রতিকারের প্রয়াস ও সেই সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্রে ও ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য আমাদের বহুবার স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে! মৃত্যু শয্যায়, মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্বে, যন্ত্রণা-মিশ্রিত অবসাদের মধ্যেও তাকে নির্ভুল আবৃত্তি করতে শুনেছি :—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বানমৃচ্ছতি॥

"রবীন্দ্র পাঠ-চক্রের" তিনি ছিলেন প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। আজও মনে পড়ে ১৩৪৪ সালের "২২ শে শ্রাবণ", স্টুডেন্টস্ হল্-এ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে, ভাব ও আবেগপূর্ণ তাঁর "মরণ" আবৃত্তির কয়েকটি লাইন :—

আমি নিজে লব তব শরণ......
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

শ্রীবিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সংগ্রাহিকার নিবেদন

১৬ই ডিসেম্বর বাবার জন্মদিন! এই স্মরণীয় দিনটিকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁরই জীবনের পুণ্য কাহিনী দিলুম তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু আত্মীয় প্রিয়জন ও শোক সন্তপ্ত দুঃখী দেশবাসীর হাতে। এই বইটি লেখায় পিতৃবন্ধুদের কাছ থেকেই আমি পেয়েছি উৎসাহ ও প্রেরণা। মনে হয় যাঁরা বাবাকে চিনতেন ও ভালো বাসতেন তাঁরা এ বই পড়ে আনন্দ গৌরব ও তৃপ্তি পাবেন।

বাবার প্রকাশ ও প্রচারহীন স্বভাবের জন্য তাঁর অনেক মহৎ কাজ অনেক পরিকল্পনা অনেক অক্লান্ত পরিশ্রম জনসাধারণের অলক্ষ্যেই রয়ে গেছে। অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী ও নির্ভিক চেতা হওয়ায় এ জগতে তাঁর উপযুক্ত সম্মানও তিনি পান নি।

মৃত্যুর পরে তাঁর জন্মোৎসব করা চলে কিনা এ সম্বন্ধে আমার কন্যাকে লেখা বাবারই একটি চিঠি নিচে উদ্ধৃত করে দিলুম।

[illegible] - ২৩ শ্রাবণ

বুড়ুমণি তোমার চিঠি পেয়েছি -
তোমরা খুব ঘটা করে উৎসব করেছ :
অনেকেই নেমন্তন্ন খেয়ে খেয়ে সুখী হয়েছে।
এবার থেকে তোমাদের সভা ছিল -
সেখানে থাকতে আহূত হয় নি। তাতে
একেবারে পাড়ায় খুব সুখের গল্প ঠেকে
শুনছিলেন।
— একেবারে তর্ক উঠেছে যে
মানুষ মারা যাবার পর তার
জন্মোৎসব করা - সঙ্গত কী না? —
তার উত্তর এই যে অনেক মানুষ আছে -
যার কিছুকাল পরে মারা যায় — তাদের
জন্ম মৃত্যু তাদের নিজের সাড়াও নেই।
কিন্তু এক এক লোকের মধ্যে অমর
বড় বড় জন আছেন, যাঁরা জগতকে কিছু—

দিয়ে যান, তাতে লোকের যে আনন্দ
বা উপকার হয়, তার জন্য লোকে
অনেকদিন তাঁদের মনে রাখে।
তাঁরাই প্রকৃত মানুষ, তাঁদের কখনও মৃত্যু
নেই। আর বাকী আমরা সব—
সংসারী জীব, সাধারণ মানুষ।
সুতরাং ঠাকুরদেরও মৃত্যুর পর
তাঁর জন্মোৎসব করা কোনও দোষ নেই।

ইতি
শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তাঁর কর্ম্মময় জীবনের কতটুকুইবা জানি কতটুকুই বা সংগ্রহ করতে পেরেছি? তবুও যদি আমার বা তাঁর বন্ধুদের লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর অপূর্ব্ব চরিত্রের কিছুও জনসাধারণের কাছে প্রকাশ পায় তাহলে আমার সব পরিশ্রম সার্থক হবে।

আমাদের ও তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধুদের মতে তিনিও আমাদের মত সাধারণ ছিলেন না তাই মৃত্যুর পর তাঁরও জন্মোৎসবে বাধা নেই।

সংসারের নানা দৈব দুর্ব্বিপাকে বাবার জীবন এত জটিল ও দুঃখময় হয়ে ওঠে যে তার জন্য তাঁর ঐ কঠিন রোগের মধ্যেও বহু আত্মীয় বন্ধুকে জনে জনে আমাদের অনেক অবাঞ্ছিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। ঐ দুঃখের দিনে নিজেদের যে দুর্ভাগ্যের কথা সকলকে বলতে বাধ্য হয়েছি তারই কিছু এর ভেতরও রইল। নইলে জীবনীটি দুর্জ্ঞেয় ও অসত্য হয়ে পড়ে।

এই নিষ্কলঙ্ক দেব চরিত্রের মধ্যেও যে কথা লিখে আমায় তার মাধুর্য্য নষ্ট করতে হল তার জন্য আমার দুঃখও গ্লানির শেষ নেই। এর জন্যে অন্য কে কে অসন্তুষ্ট হবেন ভাবার আগে ভাবি যাঁর অপূর্ব্ব চরিত্র বর্ণনার জন্য এ-বই লেখার প্রয়াস তিনিই দুঃখ পাবেন সব চেয়ে বেশী কারণ তিনি এসব কালি গ্লানির অনেক উর্দ্ধেই ছিলেন। আশাকরি সুধী বৃন্দ আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন।

*　　*　　*　　*

বইটি ১৬ই ডিসেম্বর বিতরণের ইচ্ছায় আমার লিখিত অংশ আমি মাত্র সাতদিনে লিখেছিলুম। কিন্তু বাকি লেখাগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পাওয়ায় বইটি প্রকাশে প্রচুর বিলম্ব হল। এই লেখকরা সবাই প্রবীন ও নানা কর্ম্মব্যস্ত, এই লেখার জন্য তাঁদের প্রচুর মূল্যবান সময় তাঁরা দিয়েছেন সে কারণ তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

দেশ দেশান্তর থেকে অযাচিত ভাবেও বহু বিশিষ্ট লোকের লেখা আমি পেয়েছি তাঁদেব জানাচ্ছি আমার একান্ত শ্রদ্ধায় ভরা প্রণাম। এত লেখা যে পাব তা আমার ধারণার অতীত ছিল। বার বার তিনবাব আমায় কাগজ সংগ্রহ করতে হয়েছে। আগে ছাপান না হয়ে গেলে আমার নিজের লেখা অংশটি আমি বাদ দিতুম, কারণ অন্য লেখকদের লেখনীর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে বাবার চরিত্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও মহিমার পরিপূর্ণ ছবি—। যা শুধু আমার লেখনী নিঃসৃত হলে অনেকে অন্ধভক্তি বা অত্যুক্তি মনে করে ভুল করতে পারতেন। আমার লেখার মধ্যে তবু ও আমার কুণ্ঠা ও দ্বিধার শেষ নাই। সত্য অক্ষুন্ন রাখার কারণে পিতৃদেবের আমার প্রতি স্নেহের অপরিমেয় প্রকাশ ও লেখনীর মুখে আনিতে বাধ্য হয়েছি।

লেখাগুলি মর্য্যাদা বা বয়স হিসাবে সাজান হয়নি যখন যেমন ভাবে পেয়েছি তেমনি ভাবেই দেওয়া হয়েছে।

আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য ব্যতীত এ বই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। নিবেদন ইতি—

———

"বাবা"

শৈশবের বন্ধু যত দেখিয়াছি তাঁহাদের মাঝে
সরল তরল হাস্যে আনন্দের মূর্ত্তি তব রাজে,
কৈশরের শিক্ষা মাঝে তুমি ছিলে গুরুর আসনে
পবিত্র মধুর মূর্ত্তি স্নিগ্ধ হাসি প্রশান্ত আননে।

পূজিয়াছি দেবতারে যবে গঙ্গোদক বিল্বপত্র দিয়া
ধ্যানে বসে তোমারে দেখেছি ভরিয়া রয়েছ হিয়া।

আজিকে রয়েছি বহুদূরে ব্যস্ত শত সংসারের কাজে
তবুও পেতেছি সদা তোমা দেখা রেছ সকলেরি মাঝে।

প্রভাতে উঠিয়া যবে নমি সংসারের মঙ্গল চাহিয়া
দেখি তুমি সমুখে দাঁড়ায়ে আশীষিছ মাথে হাত দিয়া।
শিশুদের হাঁসির মাঝেতে তব হাঁসি মিশান রয়েছে
তাহাদের অস্ফুট ভাষায় তব ভাব ফুটিয়া উঠেছে।

রোগ শয্যা পরে কত রাতি কাটায়েছি তোমারে ডাকিয়া,
তন্দ্রা মাঝে স্বপনের ঘোরে দাঁড়ায়েছ সমুখে আসিয়া।
শুধু তুমি জনক নহ গো শুধু নহ পিতাই আমার
শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের সবটুকু দিয়া গড়িয়াছি মুরতি তোমার।

মহৎদেবতা সম তুমি জীবনের আদর্শ আমার,
ক্ষমার মুরতি তুমি পিতা তুলনা যে না পাই তোমার।
মোর কত অপরাধ গ্লানি হেরে সবে দূরে চলে যায়
তুমি শুধু করুণ নয়নে ডাকিযাছ আয় ওরে আয়।

চলে আয় মোর কোলে ওরে ওরে মূঢ় অবুঝ সন্তান,
যেই তোরে দিক দূরে ঠেলে হেথায় অটুট তোর স্থান
শুধু সন্তানের প্রতি নহে যত দুখী অপরাধী জন,
সবা তরে আছে তব স্নেহ কাঁদে তব ব্যথাতুর মন।

যে যত অন্যায় করিয়াছে বেদনা দিয়াছে তব বুকে,
তাহারেও তব স্নেহ দেছ চিরদিন হাঁসিভরা মুখে।
অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে কারে কভু দাওনিত দুখ,
বহু ব্যথা যাতনা সহিয়া অচপল স্নেহ হাসি টুক।

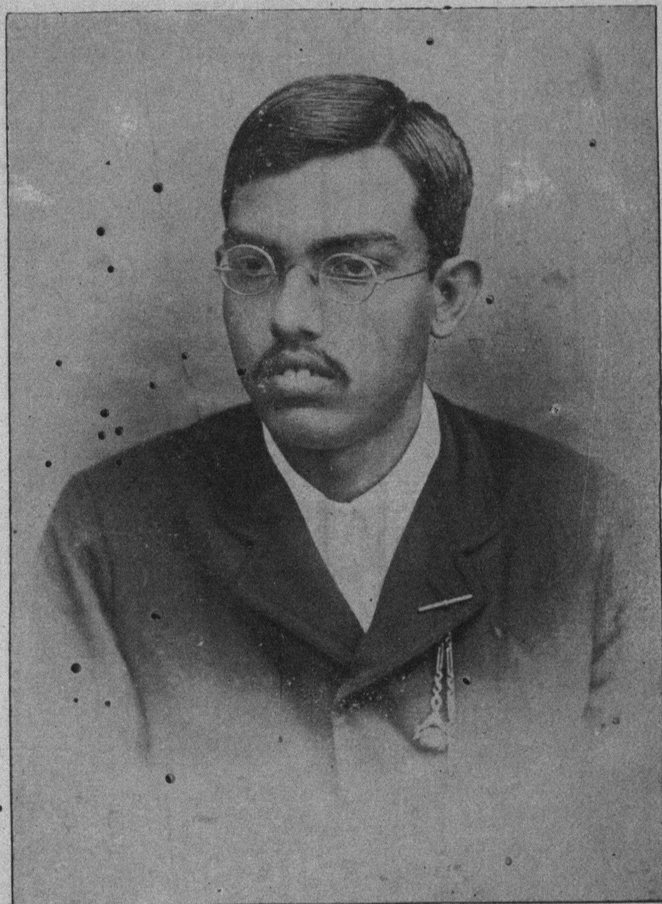
সকলের আড়ালে থাকিয়া সকলের মঙ্গল চেয়েছ
অমৃত সবারে বাঁটি দিয়ে বিষটুকু আপনি নিয়েছ।
কারো কোন উৎসবের দিনে সেথা তোমা কেউ না দেখেছে,
বিপদের দিনে না চাহিতে তব স্নেহ আপনি পেয়েছে।

নীরবে সাধিছ নিজ কাজ জনহিত হৃদয়েরই ব্রত
নাই শুধু প্রকাশের সাধ নামতব চির পদানত,
দেবতারে দেখিনিত কভু জানিনাত সে কেমনতর
তুমি পিতা দেবতা আমার তুমি মোর সকলের বড়।

১ ডাঃ শ্যামাদাস রো "পুষ্প" ১৯২৮

সূচীপত্র

চিঠি :—



সুকুমার বাবু—১৯১০

সমগ্র চরিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ

আজ যাঁর কথা লিখতে বসেছি, তাঁর অসংখ্য গুণরাজি, অপরিমেয় অতুলন স্নেহ, অসীম ধৈর্য্য, অদ্ভুত কর্ত্তব্যজ্ঞান, ঐকান্তিক দেশপ্রেম, সকল ধর্ম্মে সমান শ্রদ্ধা, সকল জীবে সমান ভালোবাসা, আদর্শ সত্য নিষ্ঠা, নিষ্কলুষ চরিত্র এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিবরণ দিই এমন সাধ্য আমার নেই। এ সত্য সত্যই পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের সাধ।

পাছে আমার লেখার কোথাও কেউ অত্যুক্তি ভেবে পিতৃদেবকে ভুল বোঝেন সে ভয়ও আছে। তাই যথাসাধ্য সংযমের চেষ্টাই করেছি। ভরসা করি অত্যুক্তি দোষ কোথাও স্পর্শ করেনি।

এই চরিত্র বর্ণনায় প্রথমেই মনে পড়ে কবিগুরুর ভাষা ও ছন্দে রঘুপতি রামের চরিত্র বর্ণনা—

"কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করেনি অতিক্রম ?
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম,—
ধরেছে সুন্দর কান্তি, মাণিক্যের অঙ্গদের মত !
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত ?
সম্পদে কে থাকে ভয়ে ? বিপদে কে একান্ত নির্ভীক ?
কে পেয়েছে সব চেয়ে ? কে দিয়েছে তাহার অধিক ?
কে লয়েছে নিজশিরে, রাজ ভালে মুকুটের সম।
সবিনয়ে সগৌরবে, ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম ?
কহ মোরে সর্ব্বদর্শী, হে দেবর্ষি! তাঁর পুণ্য নাম ?
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম—"

এই আদর্শ চরিত্র নব দুর্ব্বাদল শ্যাম রঘুপতি রাম পিতৃদেবের ইষ্ট দেবতা তাই নিজেও ঐ পদাঙ্কই অনুসরণ করে গিয়েছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমার পিতামহ রায়বাহাদুর রামসদন ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের কর্ম্মস্থলে ১৬ই ডিসেম্বর বাবা যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় ঠাকুমা স্বপ্ন দেখেন যে তাঁর ছেলে হয়েই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে ভয় পেয়ে ঠাকুমা বলেন "এ ছেলে সহজ ছেলে নয়—"মায়ের মুখের সেই কথা ভবিষ্যৎ জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

গভীর সাহিত্যানুরাগ ও ধীশক্তি

অতি ছোট বয়েস থেকেই তাঁর মেধার পরিচয়ে শিক্ষকেরা বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বাবা নাকি বেশীক্ষণ পড়তেন না। ঠাকুমার কাছে শুনেছি ঠাকুরদা তিন ছেলেকে পড়া দিয়ে বেরিয়ে যেতেন। কাকারা ঠিক পড়তেন, কিন্তু বাবা ঠাকুরদা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে যেতেন। আবার ঠাকুরদা ফিরে আসার

মিনিট পনের আগে এসে সব পড়া করে রাখতেন। ঠাকুমার কাছে এই কথা শুনে, ঠাকুরদা দ্বিগুণ পড়া দিলেন তাতেও সেই একই অবস্থা।

ছাত্র জীবনে শুধু লেখা পড়ায় নয় খেলা ধূলো সব কাজেই বাবা বন্ধুদের অগ্রণী ছিলেন। স্কুল কলেজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর ঘরের কঠিন রোগের সেবার ভার, দুস্থের কন্যাদায় পিতৃমাতৃদায়ের সাহায্যের জন্য টিউশানি, সবই চলতো—।

বাবার বন্ধু শ্রদ্ধেয় গুরুদাস সরকার মহাশয়ের কাছে শুনেছি ঐ রকম শিক্ষার কার্য্যলব্ধ অর্থে বহরমপুরে একটি লাইব্রেরীও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাহিত্যে চিরদিনই তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতির কবিতা ও অনুবাদের প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ নিজে করেছেন। সে বিষয় একটি চিঠি পরে তুলে দিলুম। কাজেই এ বিষয় বলা বাহুল্য—। তাঁর কণ্ঠের আবৃত্তি এত সুন্দর ছিল, যে না শুনেছে তারপক্ষে ধারণা করা কঠিন। ও রকম প্রাণময় সজীব মর্ম্মস্পর্শী ও নিখুঁত শ্রুতিমধুর উচ্চারণ ভঙ্গি খুব দুর্লভ বস্তু। এ সম্বন্ধে কবিশেখর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও পূজনীয় গুরুদাস সরকার ;—এদের চিঠিতে বিশেষ উল্লেখ আছে। যখন তিনি মৃত্যু-শয্যায় তখনও গীতা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও প্রায় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য তাঁর কণ্ঠস্থ শুনেছি। গীতা তাঁর বড় প্রিয় ছিল। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ তাঁর জীবনে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল। ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বাবার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু অনেকেই জানেন না বিজ্ঞানেরও তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এফ, এ পরীক্ষায় তিনি রসায়ন পদার্থবিজ্ঞানে ডাফ্ স্কলারশিপ পান—। বি কোর্সে ফিজিক্স লইয়া ইংরাজী অনার্সে তিনি বি, এ, পাস করেন। এবং ইণ্ডিয়ান অডিট্ সার্ভিস পরীক্ষায় সামান্য পার্থক্যের জন্য তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। একজন ইংরেজ ছাত্র প্রথম হন। হয়তো ইংরেজ পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বও থাকতে পারে পিতৃ-দেবের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের বহু গদ্য রচনা ও সুকুমারের কণ্ঠস্থ দেখেছি। বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাবাকে শ্রুতিধর বলে উল্লেখ করতেন শুনেছি। সাঁওতালী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

শ্রদ্ধেয় বিনয় দাশগুপ্ত (সেক্রেটারী ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট) আমায় লিখেছেন আপনার পিতা অশেষ সদগুণশালী ছিলেন। আজকাল সে সমস্ত গুণের এক একটিও দুর্লভ একত্র সমাবেশ একেবারেই মিলে না।

তাঁর বন্ধুরা তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা বলে দুঃখ করে বলেছেন "সুকুমার যদি আর একটু পড়তো"—নিজে সারা দিনে আধঘণ্টা একঘণ্টার বেশী তো পড়তেনই না বন্ধুদেরও পড়তে দিতেন না। ওঁদের হিন্দু হোষ্টেলে

থাকার সময়কার কয়েকটি নির্মল হাস্যরসের কাহিনী শুনেছি। একবার নাকি ঘোষণা করা হয়—যে ছেলে সব চেয়ে মজার ব্যাপার করতে পারবে সে একটি পুরস্কার পাবে। ঐ দিন বাবা প্রতি ঘরে বেড়াতে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে গল্প করতে করতে তাঁদের প্রত্যেকের একপাটি করে জুতো বদলে নেন—। এমনি করে হোষ্টেলের ছ'শ ছেলের জুতো বদলের ব্যাপারে সেই পুরস্কার বাবা পান।

ঐ সময় আর একটি ঘটনাও শুনেছিলুম। তখন ঠাকুরদা বহরমপুরের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বাবা ও দুইকাকা ইডেন হোষ্টেলে। ঠাকুরদার নির্দ্দেশ ছিল নিয়মিত রোজ চিঠি লেখার। হঠাৎ খেলার ব্যাপারে এক সপ্তাহের জন্য তিন ভাই কলকাতার বাইরে যান। চাকরের হাতে সাত তারিখের সাতখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিয়ে বুঝিয়ে যান রোজ একটি করে চিঠি পোষ্ট করতে। কিন্তু বুদ্ধিমান ভৃত্য প্রবর সব গুলি চিঠি এক সঙ্গেই পোষ্ট করে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দেয়। ফলে পত্র পাঠ মাত্র ঠাকুরদার কলকাতায় চলে আসা—আর তার পরের কথাতো না বলাই ভালো।

এইখানে বাবার অপ্রকাশিত একটি অনুবাদ উদ্ধৃত করলুম।

'ইন মেমোরিয়াম'-এর ভূমিকা—টেনিসন থেকে।

(শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

ঈশ্বরের পুত্র তুমি শক্তির আধার
অমর প্রেমের তুমি পূর্ণ অবতার
হেরিনি নয়নে কভু
তোমা পানে ধাই তবু
নিশ্চলা ভকতি মাত্র সম্বল আমার
মানবের যুক্তি তর্ক হেথা মানে হার।

(২)

অবিশ্রান্ত ভ্রমিতেছে গগন মাঝারে
গ্রহ নক্ষত্রের রাশি রচনা তোমার
চরাচর লভে প্রাণ
তাহাও তোমারি দান
মরণ তোমারই সৃষ্টি তবু নাহি ভয়
মরণে চরণে দলি তুমি মৃত্যুঞ্জয়—।

(৩)

মৃত্যুর আঁধারে কভু
ত্যজিবে না মোরে প্রভু
নাহি জানি তবে কেন সৃজিয়াছ নর

শুধু মরিবার তরে
আসিনি ধরার পরে
স্বষ্টি কর্ত্তা তুমি যে গো স্থায়ের নিঝ'র।

(৪)

দেব তুমি নব তুমি এই হয় জ্ঞান
আদর্শ মানব তুমি পবিত্র মহান
ইচ্ছামত কাজ করি
কেমনে বুঝিতে নারি
শুধু জানি তব কার্য্য করিয়া সাধন
তব দান শ্রীচরণে করি সমর্পণ।

(৫)

আমাদের পৃথ্বি পরে
কত ধর্ম্ম ভাঙে গড়ে
দুদিন থাকিয়া হয় কালেতে বিলীন—
তবজ্ঞান সবিতায়
বিশ্বলোক দীপ্তি পায়
এরা শুধু সে ভানুর রশ্মি রেখা ক্ষীণ

(৬)

অসীম সংশয় মাঝে
কেবল বিশ্বাস আছে
কি ঘটিছে জানিবার নাহিক উপায়
নয়নেতে হেরি যাহা
জ্ঞান হয় শুধু তাহা
তবু জানি সেই জ্ঞান তোমা হতে ধায়।

(৭)

লভুক মানব জ্ঞান পূর্ণ পরিণতি
তবু যেন তারি সনে
বিরাজে মানব মনে
অনন্ত জ্ঞানের সাথে অসীমা ভকতি
জ্ঞান ভক্তি একতানে
তব সিংহাসন পানে
তুলুক সঙ্গীত ধ্বনি তোমারি আরতি।

(৮)

উঠুক সে গীত ধ্বনি ভরিয়া আকাশ
হীনমতি মোরা সবে
ভরিনা তোমারে যবে
লইয়া তোমার নাম করি পরিহাস—
ক্ষুদ্র এই মর্ত্ত্যজনে
ক্ষমা কর নিজ গুণে
শিখাও চরণে তব রাখিতে বিশ্বাস ॥

(৯)

অপরাধ যা করেছি ক্ষম তা আমার
আমার কৃতিত্ব যাহা
দয়া করে ক্ষম তাহা
মাদের কৃতিত্ব যাহা মানবের কাছে
তোমার নিকটে মোর কীর্ত্তি কিবা আছে ।

(১০)

যে গেছে তাহার তরে
মোর আঁখি নীর ঝরে
ক্ষম দেব অজ্ঞানের শোক অশ্রুরাশি
তোমার সুন্দর সৃষ্টি
করিছে অমিয় বৃষ্টি
আমার নয়নে, তাই শোকে আজ ভাসি ।

অসীম তোমার মাঝে
এখনও সে রহিয়াছে
আরও সুন্দর তারে আরও ভালবাসি
ক্ষম মোর উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত ক্রন্দন
ব্যর্থ যৌবনের মোর আবর্জ্জনা রাশি

সত্য হতে চ্যুতি যাহা
দয়া করে ক্ষম তাহা
তবজ্ঞানে মোর জ্ঞান উঠুক বিভাসি ॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে ঐ অনুবাদটির বিষয় লেখা আছে।

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

সংসারে শ্রেণীবিভাগ আছে। একদল লোক একরকম মানুষ, কেবল ভাগ্যকে মেনে চলে, আরেকদল ভাগ্য নিয়ে খেলা করে। তোমাকে কোন লোকের কোঠায় ফেলব নিশ্চিত ছিলুম। এখন দেখছি কোনো মানুষের সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তোমার লেখনী দিয়েও ভক্তের বাণী বেরোচ্ছে তাও ভাবিনি এ দেশে অসম্ভব ছিল।

ফুলের সঙ্গে তোমার জন্মদিন মেলাবার সময় বোধ হয়
কিন্তু যদি বা তা অমূলক হয় তাতেই বা
দোষ কী। তাই এগুলো আবার
সংক্ষিপ্তই রেখে গেছি।
[illegible] আনন্দ। [illegible]
[illegible]। আশীর্বাদ করি পুরীতে
তোমার স্ত্রী স্বাস্থ্যলাভ করবেন।
ইতি ২০।১।৪০
তোমাদের
[illegible]

বাবার অনেক লেখাই অপ্রকাশিত ও অপঠিত আছে। কারণ নিজের লেখা কারুকে পড়ে শোনানোয় তাঁর গভীর কুণ্ঠা ছিল। অন্যের এই অভ্যাসও তাঁর মনমত ছিল না। লেখা যদি ভালো হয় প্রকাশ হলে যার ইচ্ছে হবে, ভালো লাগবে সে পড়বে। কিন্তু লেখক নিজে পড়ে শোনালে বাধ্য হয়ে শ্রোতাকে শুনতে হবে এ বড় অন্যায়। অপরের জন্যে যে তিনি কত বেশী ভাবতেন এই ব্যাপারেই তা বোঝা যায়। কোনও জিনিষই নামের আকাঙ্খায় তিনি করেন নি—কাজেই লেখার আনন্দেই লিখে যেতেন প্রকাশ কখনও হয়ে ওঠেনি।

বাবার আর একটি অপ্রকাশিত রচনা

শের সাহের সমাধি দর্শনে

১

একথা জানিতে তুমি ভারত সম্রাট শের সাহ
ক্ষণস্থায়ী এজীবন! • মানবের কর্ম্মকীর্ত্তি রাশি
জলের বুদ্বুদ প্রায় ক্ষণিক আলোকে করি খেলা
জলেতে মিশায়ে যায় জীবন নাট্যের অবসানে
মহাকাল টানিদেয় মরণের কালো যবনিকা
তাই তব কর্ম্মপূর্ণ জীবনের অবসব ক্ষণে
ভাবনা গভীর দৃষ্টি মেলিয়াছ দিগন্তের পানে
সুদূর আকাশ যেথা মিশিয়াছে শ্যামলধরায়
আঁধার ঘনায় যথা রৌদ্রতপ্ত দীপ্ত দিনশেষে।

২

শার্দ্দুল বিজয় করি ধরেছিলে শার্দ্দুলের নাম
দুর্ণিবার বীর্য্য তব উচ্ছসিত অগ্নিস্রোতঃ সম
প্লাবিয়াছে ভারতের দিক হতে দিগন্ত অবধি
করিয়াছে সমাচ্ছন্ন নবোদীপ্ত মোগলমহিমা
কুজ্ঝটিকা ঢাকে যথা বালসূর্য্য আকাশের ভালে
বিজয় দুন্দুভি তব নিনাদিল ভরিয়া গগন
কাঁপিল ধরণী বক্ষ সেনানীর দৃপ্তপদ ভরে।

৩

নিরন্তর কর্ম্ম মাঝে শ্রান্তি নামিয়াছে তব প্রাণে
সন্ধ্যার আঁধার সম আচ্ছন্ন করিয়া দশদিক
বিশ্রাম চেয়েছে হিয়া মরণের অনন্ত শয্যায়
জাগরণহীনসুপ্তি কামনা করেছে নিশিদিন
দুরন্ত বালক যথা খেলা করি সারা দিনমান
বিশ্রাম লভিতে চায় স্নেহসুশীতল মাতৃক্রোড়ে।
তাই বহুযত্নে তুমি বিরচিলে সমাধি মন্দির।
বিলাস প্রাসাদ নহে নহে ইহা বিজয় তোরণ
জীবনের অবসানে বিশ্রাম লভিছ আজি হেথা।

৪

শ্যাম শস্পে আচ্ছাদিত নির্ব্বাপিত অগ্নিগিরি প্রায়
তোমার সমাধি ঘেরি বিচিত্র জীবন কোলাহল

ধ্বনিতেছে নিরবধি। শিশুগন ক্রীড়ায় নিবত
বধুরা লইছে জল দীর্ঘিকার স্বচ্ছজল মাঝে
মরাল করিছে কেলি। সমাধির সৌধ শির ভাগে
কপোত বেঁধেছে নীড় মুখবিত করি সৌধ পুরী
অশ্রান্ত গুঞ্জণ স্বরে। কৌতুহলী দর্শকের দল
দূরদেশ হতে আসি চেয়ে থাকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে।

৫

আমি আসিয়াছি হেথা তাহাদেবইমত একজন
বসিয়াছি ক্ষণকাল সমাধির পাষান চত্বরে
বহে ধীরে তপ্তবায়ু মধ্যাহ্নের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
অবসন্ন হৃদিমোর বর্ত্তমান কোলাহল ভুলি
গাহন করিতে চায় অতীতের অনন্ত সাগরে
মূক প্রস্তরেব রাশি কথা কয় মোর কানেকানে
কতনাকাহিনী স্মৃতি দীর্ঘ চারিশত বর্ষব্যাপী।
ভাবতের ভাগ্যাকাশে কখনো বা উদিয়াছে রবি
নব প্রভাতের আলো ভরিয়াছে সোনার ভুবন
কভু উঠিয়াছে ঝড় আর্ত্তস্বরে কেঁদেছে ধরণী
কখনো বা অমানিশা ঘনায়েছে তমিস্রা গভীর
কতজাতি এলোগেল ভারতেব সিংহাসনপরে
বসিয়াছে কত নৃপ কত ধর্ম্ম গড়িল ভাঙ্গিল
অতীতের অন্তরালে পাষাণের স্তব্ধতা ভেদিযা
ধ্বনিতেছে মোর কানে তাহাদের বিচিত্র কাহিনী।

অহিংসা নীতি ও সমপ্রীতিতে মহাত্মাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ

তার চরিত্রের দুটি বিষয় মহাত্মাজীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। একটি তাঁর অহিংসনীতি দ্বিতীয় তাঁর সমপ্রীতির ফলে হিন্দুমুসলমানে তাঁর অন্তরে ভেদাভেদ ছিল না। এ সম্বন্ধে অপরের কোনও দূর্ব্বলতা দেখলে তিনি দুঃখিত হতেন। বলতেন "এ তোমার ভূল। ভালো মন্দ সব জাতের মধ্যেই আছে। বরং আমার মনে হয় ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞান মুসলমানদের মধ্যে আমাদের চেয়ে বেশীই আছে। একবার একটি দুস্থ ছেলেকে চিঠি দিয়া চাকরীর জন্যে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের কাছে পাঠাই। ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটি চিঠি পড়েই ছেলেটিকে বলেন—ওঃ তুমি সুকুমার বাবুর কাছ থেকে এসেছ? আর কিছু দরকার নেই কাল থেকে অফিসে এস, তুমি এ্যাপয়েণ্টেড হয়ে গেলে। আমার এতো উন্নতির মূল সুকুমার বাবুই—। এই গল্প বলে

বাবা বলেন "আমার কিন্তু মনেই ছিলনা কবে আমি তাঁর জন্যে কি করেছি—কিন্তু তিনি সেকথা এতো বড় করে মনে করে রেখেছেন—এরকম কৃতজ্ঞতা ও ভদ্রতা আমাদের মধ্যে কমই আছে।" শ্রদ্ধেয় বিনোদ বিহারী সরকার মহাশয় বাবার ঐ সমপ্রীতির কথা উল্লেখ করে বলেন—"আমার এই ৬০ বছর বয়েসে কোনও হিন্দু আফিসারকে মুসলমানদের কাছ থেকে এতো শ্রদ্ধা পেতে কখনও দেখিনি ;"

এই সমন্ধে ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের কাছে একটি গল্প শুনি "একদিন সকালে ঘরে বসে আছি এমন সময় খবর এলো সুকুমার বাবু ও বিনোদবাবু এসেছেন—বলতে বলতেই সশব্দে তোমার পিতার প্রবেশ। ঐ সময় একজন মুসলমান ভদ্রলোক আমার ঘরে বসে ছিলেন—তিনি সুকুমার বাবুকে দেখেই সসম্মানে উঠে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বল্লেন 'চিনতে পাচ্ছেন ?' আমি তো স্তম্ভিত—কারণ মুসলমানরা নিজের পিতা ছাড়া কারো পায়ে হাত দেয়না। সুকুমারবাবু ততক্ষণে বিনোদবাবুকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলছেন ঐ ভদ্রলোকটির বাবা কোথায় কি পোস্টে ছিলেন এবং কি রকম আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয় বিনোদবাবু মৃত ভদ্রলোকটিকে চেনেন ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করায়—মুসলমান ভদ্রলোকটি তাঁকে যথারীতি অভিবাদন জানালেন। তারপর সুকুমার বাবু চলে গেলে ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটি সুকুমার বাবুর মহৎ অন্তঃকরণের যে কাহিনী বললেন তা অপূর্ব্ব। সুদূর বিদেশে কর্ম্মস্থলে ঐ ভিন্নধর্ম্মী ভদ্রলোকটির কঠিন রোগে সুকুমার বাবুর অদ্ভুত সেবা ও উপযাচক হয়ে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণের কাহিনী সত্যই বিস্ময়কর। তাঁর ঐকান্তিক সহানুভূতিই সেদিন ঐ সদ্য বিধবার ও শিশু সন্তানদের বিদেশে একমাত্র সহায় ও সম্বল হয়েছিল। এই কথা বলতে বলতে আবেগ ভরে ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটি বলেন 'আমার মা যতদিন জীবিত ছিলেন শ্রদ্ধা ভরে সুকুমার বাবুর নাম করে বলতেন ভগবান ওঁকে বাঁচিয়ে রাখুন উনি থাকতে কেউই আমরা নিঃসহায় নই"। এই সূত্রে ডাঃ অধিকারী মশায়ের পিতৃদেবের প্রতি অপূর্ব্ব প্রীতি ও সৌহার্দ্দের কথা মনে পড়ে। বাবার ও অধিকারী মশায়ের পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অবধি ছিলনা। শ্রীনিকেতনে থাকার সময় রবীন্দ্র কাব্যে বিভোর হয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করতেও ওঁদের দুজনকে দেখেছি। পিতৃদেবের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে আমার কাকা পূজনীয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে ডাঃ অধিকারী মিহিজামে যান। ঐ সময় ডাঃ অধিকারীর প্রতিটি ব্যাবহারে ও কাজে যে কী অকৃত্রিম উৎকণ্ঠাও চিন্তা ফুটে উঠতো তা বলে বোঝানো যায় না। এই আপন ভোলা দেবতুল্য মানুষটির মনের কতটা জায়গা যে বাবা দখল করেছিলেন তা বাবার অসুখের সময় যাঁরা অধিকারী মশাইকে দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন।

একদিন আমাদের এক নিকটতম আত্মীয় বাবার বন্ধুভাগ্যের প্রশংসা করায় ডাঃ অধিকারী বলেন" একদিন দেখে এমন আকৃষ্ট আমি আর কারুর প্রতি হইনি। এ ভাগ্য সহজে হয়না মশাই! অনেক গোপন দান চাই, মহৎ অন্তঃকরণ চাই অনেক ত্যাগ স্বীকার চাই, নিজের চরিত্র প্রভাবে এ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জ্জন করতে হয়—এ জিনিষ হিসেবে মেলেনা।"

ডাঃ অধিকারীর নির্দ্দেশ মত যখন বাবার এডমণ্ড রোনাল্ডের চিকিৎসা হচ্ছিল তখন প্রায় প্রতিদিনই ডাঃ অধিকারী আসতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন "বুঝছি করার কিছুই নেই—এসে সুকুমার বাবুর মত কর্ম্মঠ লোকের এ অবস্থা দেখতেও কষ্ট হয়—তবুও এই ঘরে এসে বসি—না এসে পারিনা বলে—। মনে হয় এখানে আমরা যারা আছি সকলেরই এক চেষ্টা এক ইচ্ছা সবাই সুকুমার বাবুর একান্ত শুভার্থী এইটুকু ভাবতেও ভালো লাগে।" ঐ কথার মধ্যে যে কী গভীর ভালোবাসা ও প্রীতি পরিপূর্ণ তা মনে করলে আজও চোখ জলে ভরে ওঠে।

পিতৃদেবের অহিংসা নীতির ও মহাত্মাজীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। বিশেষ ব্যক্তিগত কারনে—সব খুলে বলা সঙ্গত হয়না। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। কে তাঁর প্রতি কি ব্যবহার করেছে কখনও তা মনে রাখেননি। এমন কি যাঁরা তাঁর জীবনে বহু দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়েছেন তাঁদেরও সাধ্যমত ভালোর চেষ্টাই করে গেছেন। এমনি জগৎ যে তাঁর এই দেবোপম চরিত্রের সুযোগ নিতেও অনেকে ছাড়েন নি। আমরা তাঁর শিক্ষার তলায় মানুষ হয়ে হয়তো অন্যায়ের প্রতিশোধে অন্যায় করতে পারিনা কিন্তু সে সব মানুষের কাছথেকে দূরে সরে থাকি—। আমাদের মনের এই দীনতায় বাবা মনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। বাবার বালিগঞ্জ প্রেসের নিজ বাড়ী থেকে চলে আসায় বাবার এক বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী বন্ধু বলেন "ছেলের বেনামীতে জমি কিনে বাড়ী করলেই সে বাড়ী ছেলের হয়ে যায় না। ওকে শুধু বুঝতে দাও ওর অধিকার কতটুকু আমি তোমার কোন কথা শুনবো না সুকুমার আমি নিজে এ কেসে দাঁড়াবো" এর উত্তরে বাবা বলেন ওরা নীচুতে নেমেছে বলে কি আমি অত নিচুতে নামতে পারি? আমার প্রয়োজন কতটুকু? ও বাড়ী থেকে ওকে যেতে বললে ও স্ত্রী পুত্র নিয়ে পথে দাঁড়াবে।

যে আঘাত তাঁর মৃত্যুর কারণ বলে গিয়েছেন সেখানে ঐ রকম ক্ষমা কি সত্যই দেব দুর্লভ নয়? যাঁরা তাঁর প্রচুর ক্ষতিও করেছে—তাদের প্রয়োজনে তো বটেই, সম্পূর্ণ অলক্ষ্যেও তাদের যে কত উপকার করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বাবা মহাত্মাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গিয়েছেন।

মহাত্মাজীও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শ্রীনিকেতনে থাকার সময় বাবার একবার নিউমোনিয়া হয়। তখন মহাত্মাজীও শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বাবার অসুখের খবরে মহাত্মাজী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ওষুধ নিজে হাতে করে বাবাকে দিয়ে আসেন। ঐ সময় বাবার সেবার জন্য আমার ছোট ভাই বাবার কাছে ছিলো এই কাহিনী তার মুখেই শোনা।

ঐ নিমোনিয়ার পর আমি কিছু দিন বাবার কাছে ছিলুম—। তখনও বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। ঐ সময়কার একটি ঘটনা আমি কবিতায় লিখেছিলুম।

শ্রীনিকেতনে প্লাবনে

দারুণ গ্রীষ্মের পরে অবিশ্রাম ধারে
নামিল সঘন বারিধারা
মাঠ ঘাট পথ বেয়ে ঝরে ঝর ঝর
পাগলের প্লাবনের পারা
সশঙ্কিত ছোট গ্রাম চালে খড় নাই
ভিজিতেছে চাষীরা সকলে
মাগিযাছে প্রাণ ভরে ধান তরে এরে
তবু আজ ত্রস্ত দলে দলে।
অনাহারে শুষ্কপ্রায় নগ্ন গাত্র দেহ
শিশুগুলি কাঁপিছে তরাসে
ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল যাহে ঢাকা দিতে চায়
উড়ে যায় উত্তর বাতাসে—।
ভিজে ঘরে ঠাঁই নাই শিশুদের লয়ে
ধনীর দ্বারেতে বসে থাকে
ভিজেছে উনুন নাই রান্নার কাজ
ভাত চেয়ে তবু শিশু ডাকে।
আরামী ধনীর গৃহে ঘন ঘন আজ
চলিতেছে চায়ের আসর
চলেছে তাসের মজা পাশা দাবা গান
তার সাথে ফুলুরী পাঁপর।
কেহবা ঠাণ্ডার মাঝে সুখে তন্দ্রারত
কোমল শয্যার স্পর্শ লভি
আমি শুধু ব্যর্থ আশে জানালার পাশে
আঁকিবারে বরষার ছবি—।

দূরে দেখি নগ্ন পদে জল ভরা পথে
চলেছেন বাবা এর মাঝে
কোথা বুঝি জল পড়ে ভিজিছে মানুষ
কোথা ঘরে অন্ন মেলে নাযে।

বিশ্বের সমগ্র দুখ বুকে নেছে বাসা
ভুলিযাছে আঁপনাব দুখ
জলে ভিজে কাদা পথে ছুটে চলে তাই
নাজানি এ কি সে সেবা সুখ।

মনে হয় ঐ পদ স্পর্শ লাভ তরে
কাঁদে বুঝি শ্যামলা ধরণী
ঐ পদ স্পর্শে বুঝি হয়েছিল সোনা
অযোধ্যায কাঠের তরণী।

ঐ স্নেহ স্পর্শে প্রাণ পাষাণেও পায
অন্তরেতে জাগায চেতনা
ভুলি তুচ্ছ মোহ লোভ বিশ্ব প্রেম আসে
সবা তরে সমান বেদনা।

কেন মিছে পুঁথি খুঁজি অবতার লীলা
চৈতন্য গৌরাঙ্গ লীলা পড়ি
সম্মুখে প্রশান্ত মুখ ও সৌম্য বয়ান
রয়েছে এ ধ্যান কক্ষ ভরি।

যীশু খৃষ্ট দধীচীর ত্যাগের কাহিনী
পুরাণ গ্রন্থেতে বদ্ধ ছিল
তোমার এ আত্ম ত্যাগ পুত কর্ম্ম যোগ
তাঁহাদেরই পুনঃ দেখাইল।

কাছে মিছে আড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন
সকলেরে ভালো বাস শুধু
ঘৃণিতে না ঘৃণা করি দাও কোলে ঠাঁই
সবাতরে দাও স্নেহ মধু

দুখীদের দুখ হেরি সকরুণ ওই
আঁখি যবে বেদনা বিহ্বল
মনে জাগে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মুখ
হেরি ওই মুখ শতদল।

জ্ঞান হীনে জ্ঞান দেহ বস্ত্র বস্ত্রহীনে
দরিদ্রেরে দেছ অন্নজল
অসহায় দুখীদের মুছাইয়া দুখ
তৃপ্তি ভরা মুখ ঝল মল।

নাই গর্ব্ব অহঙ্কার প্রচারের সাধ
মন্ত্র তব জনহিত ব্রত
ইষ্ট মন্ত্র সম তারে রেখেছ লুকায়ে
অপূর্ব্ব সে সাধনায় রত।

শত অপরাধীজনে দেছ সম স্নেহ
বিস্ময় মেনেছে হেরে' সবে
গীতার আদর্শ মূর্ত্তি কর্ম্ম যোগী তুমি
পুনঃ বুঝি আসিয়াছ ভবে।

ধ্যানের মূরতি সম কষ্ট সাধ্য নয়
নহে শুধু কল্পনার ছবি
বিভাসিত মহিমার অরুণ ছটায়
স্থির হৃদে ওই মুখ রবি।

দেবাদিদেবের মুখ ভ্রূকুটি কুটিল—
নহে কভু স্নিগ্ধতায় ভরা
অতুলন পিতৃরূপ জগতের পিতা
না জানিসে কত সুধাক্ষরা।

ধ্যানের দেবতা পিতা ইষ্ট দেব মম
আদর্শ এ জগতের মাঝে
আকুল হৃদয় যবে হয় দিশাহারা
হেরি তোমা স্নেহময় সাজে।

অটুট নির্ভর তব দেবতা চরণে
মন তাই প্রশান্তিতে ভরা
পেয়ে কোন অমৃতের মধুর আস্বাদ
সুখ সাধ সব তুচ্ছ করা—।

কাজ নেই মিছে খুঁজে জ্ঞানের সন্ধান
ক্ষুদ্র শক্তি করে তাহে শেষ
তোমার পদাঙ্ক ধরি যদি কিছু পারি
তাহাতেই তৃপ্তি পাবো বেশ॥

পিতৃদেবের আর একটি চরিত্রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তুলনা দেওয়া যায়। সেটি হচ্ছে তাঁর সত্যকারের আভিজাত্যের। তাঁর প্রতি আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে সুরুচির পরিচয় ফুটে উঠতো। কখনও কোনও অশোভন কথা বা অশোভন ব্যাবহার কারুর প্রতি তাঁকে করতে দেখিনি। অত্যন্ত বিরক্ত হলেও অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোককে তিনি যে ভাষায় কথা বলতেন তাতে বোঝা যেত সংযম তাঁর কতখানি ছিল। সাধারণ কর্ত্তারা যেমন চাকরকে ব্যাটা, বা নবাব পুত্র বলে সম্বোধন করেন তাঁর মুখে সে রকম কথা কখনও শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কায়মনোবাক্যে কবি ছিলেন বাবার তেমনি ছিল মনে প্রাণে আভিজাত্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঐ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বাবার আই. জি. আর. পদত্যাগ কালে আমি রবীন্দ্রনাথকে যে কবিতার অর্ঘ্য পাঠাই তা নীচে দিলুম।

কবিগুরু হে রবীন্দ্র ! সত্যদ্রষ্টা তুমি বঙ্গ ভাষা গড়া তব হাতে,
পূজনীয়, বরণীয়, স্মরণীয় তুমি গৌরব মুকুট তব মাথে।

এর চেয়ে বড় কথা কত স্তুতি গীতি গাহিয়াছে কত গুণী কবি
আমি শুধু হেরিলাম প্রশান্ত ও মুখ স্নেহ ভরা মমতার ছবি।

কীর্ত্তিমান যশস্বী ও দেশ দেশান্তরে প্রচারিত যাঁহাদের নাম
হেরিয়া তাদের ধন্য হইব ভাবিয়া গিয়াছি ত কতশত ধাম।

যাঁদের কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া কল্পনায় গড়েছি মূরতি
নিকটে যাইয়া ক্ষুন্ন হইয়াছে মন হেরি নাই ততখানি জ্যোতি।

মানুষ মানুষ সে যে দেবতা যে নহে মুগ্ধ হৃদি বোঝে না সে কথা,
বড় করে আঁকে যারে হৃদয়ের পটে তারে ছোট হেরে পায় ব্যাথা

তোমারে হেরিতে মনে ছিল বহু সাধ তারি সনে ছিল তবু ভয়,
বাস্তবের আঘাতেতে কল্পিত মূরতি কোনখানে পায় যদি লয়।

মনে বহু দ্বিধা লয়ে শঙ্কিত এ হৃদি গিয়েছিল হেরিতে তোমারে,
দেখিলাম অতুলন, অতুলন তুমি ভাষা তোমা বর্ণিতে না পারে।

একমাত্র তোমারেই হেরিলাম আমি বড় ঢের কল্পনার চেয়ে
মুগ্ধ আমি অনিমেষ হেরি সে মূরতি আনন্দেতে প্রাণ গেল ছেয়ে।

শৈশবেতে কণ্ঠে মোর প্রথম যখন ফুটিয়াছে অর্দ্ধস্ফুট কথা
তখন পিতার কোলে শুনেছি গেয়েছি তাঁরি সাথে তোমারি কবিতা।

পিতা মোর পিতা শুধু নহেন তো কভু বন্ধু মোর গুরু মোর সাথী
তাঁরি সঙ্গে মিলাইয়া শিশু কণ্ঠ মোর গানে তব করেছি আরতি।

দেখি নাই তোমারে তো তবু মনে মোর তব রূপ চিরদিন আঁকা।
আকুল হয়েছে মন ওগো কবিগুরু একবার পেতে তব দেখা।

কৈশরেই বধূ বেশে পর গৃহে এসে ঢাকিয়াছি নিজ সুখ সাধ
সংসারের আঘাতেতে তোমার কবিতা ছিল মোর শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।

দুঃখে ভয়ে বিপদেতে ধৈর্য্য হারা যবে সান্ত্বনা দিয়াছে তব গীতি
রুদ্রের মধুর রূপ তুমিই দেখালে প্রতিছন্দে কত সুধা প্রীতি।

অদেখা অচেনা তুমি শ্রেষ্ঠ প্রিয়জন সুখে দুখে মোর চিরসাথী
দূর হতে অবিশ্রান্ত দিয়েছো যে কত সাধ্য কি তা কবিতায় গাঁথি

অন্তরের একান্ত যা গোপন জিনিষ বাহিরে তা নাহি দেখাবার
নিষ্কলঙ্ক পবিত্র সে শ্রদ্ধা ভক্তি রাশি জানায়েছে পরাণ আমার,

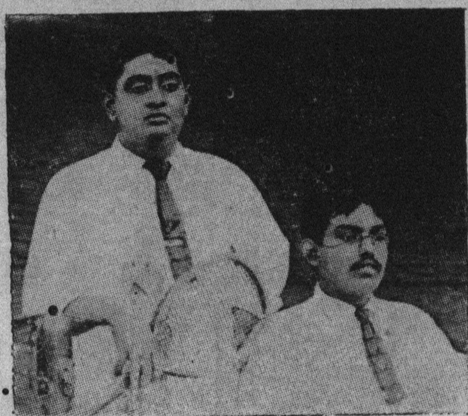
তবু তুমি যাহা দেছ বিশ্ব জন সবে তার বেশী দাওনি তো মোরে
আমি দেছি ছিল মোর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যাহা দিইনি যা আর কারো তরে

মোর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য সম্পদ বন্ধু গুরু একাধারে পিতা
তাঁহারে দিয়েছি তোমা মোর শ্রেষ্ঠ দান নিঃস্ব হয়ে বুঝিয়াছ কি তা ?

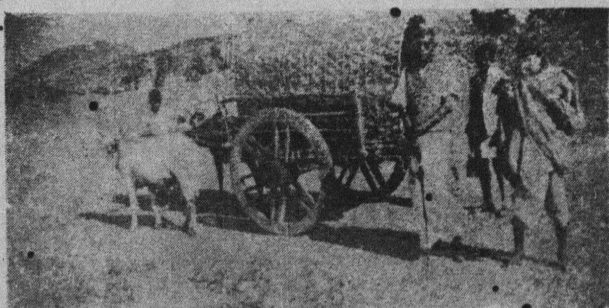
এই কবিতার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখিকাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন তা পরে রইল—

রবীন্দ্রনাথ যে কবি একথা যেমন তাঁর আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তায় মূর্ত্ত হয়ে উঠতো পিতৃদেবের চরিত্রে তেমনি ফুটে উঠতো তাঁর সুরুচি ও আভিজাত্য। তাঁর সমগ্র চরিত্র তন্ন তন্ন করে দেখলেও এমন একটু কালিমা দেখা যায় না যা মনকে দুঃখ দেয়। সন্তান ও প্রিয়জনের বুক ভরে ওঠে আত্মপ্রসাদে তাঁর দেবোপম চরিত্র স্মরণ করে।

বাইরে সামাজিক জীবনে নিজের উচ্চরূপ দেখানো তত শক্ত নয়, কিন্তু ঘরের ভেতর প্রতিটি মানুষের কাছে নিজের এমন মহত্ত্বের পরিচয় কজন দিতে পারেন ? আমাদের ত্রুটি বহু দীনতা কি আমাদের সন্তানদের আদর্শে আঘাত দেয় না।



শ্রীবিনোদবিহারী সরকার ও শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণনগর—১৯১৩



সুকুমার বাবু ও গ্রামের মোড়ল

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সন্তোষের চিঠি
এবং সেইদিন থেকে নানা কর্তব্যের
তাড়নায় তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে
দেরি হয়ে গেল। অনেক দিন পরে এবার আমার
ছুটির অবকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার
হল। এসেছে তাই সব প্রথমেই তোমাদের
উদ্দেশে আশীর্বাদ পাঠাতে বসলুম।
আবার অবিলম্বেই ঘুলিয়ে আসবে
আমার অবকাশ। তোমার কবিতার
বইখানি গ্রহণ করলুম আনন্দের সঙ্গে।
তোমাদের সঙ্গে মিলিত ফোটোগ্রাফটি
বেশ ভালো হয়েছে, তাতে দিলুম আমার
স্বাক্ষর। — এইবার এক তাড়া উত্তরের
চিঠি এসে পৌঁছল আমার এখানে

তোমার বাণী সার্থক হবে। সর্বত্রই
তোমাদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিই।
ইতি ১১ মাঘ ১৩৪৩
শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুপম শ্লীলতা বোধ

চরিত্র হীনতা বলতে যেমন লোকে বিশেষ কোনও ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতাই অনেকে বোঝেন পিতৃদেবের বিচারে তা ছিল না। হিংসা, লোভ, রাগ, পরশ্রীকাতরতা সবই তিনি চরিত্র দোষ বলে মানতেন। তবে অপরের বেলায় তাঁর ছিল প্রচুর উদারতা নিজের বেলায় শুধু ছিলেন কঠিন বিচারক।

এমন সুশ্রী ও সুষ্ঠু জীবন বড় দেখা যায় না। বাড়ীর কারো সামনে খালি গায়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। স্নানের সময় তেল মাখার সময়টুকু শুধু রোদে খালি গায় থাকতেন তাও সেখানে স্ত্রীলোকরা তো নয়ই শুধু নিজের চাকর ছাড়া অন্য পুরুষ কেউ থাকলেও কুণ্ঠিত হতেন। অতবড় অসুখের মধ্যেও মেয়ে নার্স বা কন্যা বা পুত্রবধূদের কাছে তিনি বেডপ্যান বা ইউরিনাল নেন নি। শ্লীলতা বোধ সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল এবং সে শ্লীলতা বোধ শুধু স্ত্রী বা বউদের মাথার কাপড় সকলেরই দোষ অথচ পুরুষেরর বেলা দোষ নেই এরকম পক্ষ পাত দুষ্ট ছিল না। স্নানের সময় গামছা পরা বা ঐ রকম অশোভন বা দৃষ্টি কটু অবস্থায় কেউ তাকে কখনও দেখেনি। তিনি যা অপরের করা উচিৎ মনে করতেন নিজে বর্ণে বর্ণে তা পালন করে আমাদের আদর্শ দেখিয়ে দিতেন।

সুরুচিপূর্ণ অতুলনীয় রসজ্ঞান

তার নাতনীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পিতা পুত্রীর মত। অশ্লীলতা দুষ্ট ঠাট্টা তামাসা তো দূরের কথা ঐ ধরণের কোনও কথাও তারা পিতৃদেবের কাছে শোনেনি। বড় হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে বা বন্ধু বান্ধবের কাছে তাদের দাদুদের রসিকতা শুনে তাদের কুণ্ঠা ও বিস্ময়ের সীমা থাকতো না।

অথচ সুন্দর রসজ্ঞান তাঁর পূর্ণমাত্রায় ছিল। রামায়ন কাব্যে আলেখ্য দর্শন চিত্রে সীতাদেবী দেবর লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলার ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন বৎস! ইনি কে? উত্তরে লক্ষ্মণের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্য রেখা দিল মাত্র

তিনি সসম্ভ্রমে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই রকম সুরুচি সম্পন্ন পরিহাসের মাধুর্য্যবোধ আজকাল পরস্পরের কেউই বড় মনে রাখেন না। পিতৃদেবের পরিহাস ঐ শ্রেণীর ছিল। মনে পড়ে নৈহাটিতে থাকার সময় একদিন দুপুরে আমার ছোট জামাই পতাকীচরণ কলকাতা থেকে যায়। ঐ সময় বাবা বাড়ী ছিলেন না। আমি রেকাবে খাবার সাজাচ্ছি এমন সময় বাবা এলেন বাবার কণ্ঠস্বরে পতাকী ঘর থেকে বেড়িয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই বাবা স্মিতহাস্যে বললেন—"নৈবেদ্যের আয়োজন দেখেই বুঝেছি অলক্ষ্যে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে।"

আমার মেজ মেয়ে (বুলু) বাবার বিশেষ প্রিয় পাত্রী ছিল। তার বিষয় কিছু বলতে গেলেই বাবা বলতেন "বুলুমের ব্যাপারই আলাদা" এবং অসুখের মধ্যে অনেককেই বলেছেন "বুলু যে আমার কী সেবা করেছে তা বলার নয়।" শেষের দিকে বুলুর সেবা যে কী অদ্ভুত নৈপুণ্য ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছে তাতে আমরা সবাই বাবার কথার সত্যতা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করেছি। মনে হয় বাবাও প্রচুর তৃপ্তি পেয়ে গিয়েছেন।

বাবার অসুখের আগেই পতাকীচরণ D. C. H. ও M. R. C P. পরীক্ষা দিতে বিলেত যায়। কর্ম্ম তৎপরতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের জন্য পতাকী বাবার বড় প্রিয় পাত্র ছিল। পতাকীর D. C. H. পাশের খবরে বাবা এতো উল্লসিত হয়েছিলেন যে বলেছিলেন "পতাকীকে লিখে দাও তার ডিপ্লোমার ফটো তুলে আমায় যেন একটা পাঠায়।" মৃত্যুর মাস খানেক আগে বুলুকে এই শ্লোকটি বলেন পতাকীকে লেখার জন্য। শ্লোকটি দ্বিঅর্থ বোধক।

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো
তত্রৈব নেয়া দিবসা কিয়ন্তঃ,
সম্প্রত্যযোগ্য স্থিতিরেষ দেশঃ
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি।

এর একটা মানে "ওগো পরাণ বন্ধু তোমার কাছে আমার এই নিবেদন যে 'তুমি যেখানে আছ সেখানেই আর কিছুদিন থাকো। কারণ এ স্থান তোমার বাসের উপযোগী নয় এখানে চাঁদের আলো ও তাপ দিচ্ছে।

আর একটা মানে "তোমার বিরহে চাঁদের আলোও আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে তুমি আর দেরী কোরনা।" আমার বড় জামাই শ্রীমান সত্যপ্রসাদ হাইকোর্টের উকিল, বাবা তাকে স্নেহ বশতঃ জজসাহেব বলে ডাকতেন। আমি জানতুম ঐ সরল পরিহাসের অন্তরালে তাঁর অন্তরের শুভ আশীর্ব্বাদই ফুটে উঠতো। এই রকম শ্রুতি মধুর ও সুরুচিপূর্ণ ছিল তাঁর পরিহাস। তাকে বাবা ঐ কবিতাটির অর্থ করতে বলেন।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁরই আগ্রহে শ্রীনিকেতনে

সচিব থাকাকালীন পিতৃদেবের জন্মতিথি উৎসব খুব সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হয়। এণ্ড্রুজ সাহেবের মৃত্যু শয্যায় আমার মেজ ভাই তাঁকে দেখতে গেলে তিনি আবেগ ভরে বলেন—"ওঃ তুমি আমার প্রিয় ও দরদী সুকুমারের ছেলে। প্রার্থনা করি পিতার মত মহৎ ও উদার অন্তঃকরণ লাভ কর।" এণ্ড্রুজ সাহেবের মৃতদেহ বাবা নিজে বহন করেছিলেন এবং স্বপাক হবিষ্য খেয়ে ও পাদুকা ত্যাগ করে অশৌচ গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর চরিত্রে যীশু খৃষ্টের প্রভাবও প্রচুর ছিল। তাঁর মৃত্যুকে মহাত্মাজী ও যীশু খৃষ্টের মৃত্যুর সহিত তুলনা করা যায়। যীশুখৃষ্ট ও মহাত্মাজী যেমন যাঁদের জন্যে প্রচুর করেছিলেন তাঁদের হাতেই নিহত হলেন পিতৃদেবের আকস্মিক মৃত্যুও তাই।

মনে পড়ে এই সন্তানদের ওপোর তাঁর কি নির্ভর আর কী গভীর আস্থাই ছিল। আমার কাছে তাঁর একটি চিঠিতে আছে—"ভগবান আমায় যে তোমাদের মত ছেলে মেয়ে দিয়েছেন এইই তাঁর অশেষ অনুগ্রহ বলে আমি মনে করি।" সব সুখ মানুষের হয় না। তোমাদের পেয়েই আমার জীবন সুখের হবে। যে সন্তানদের ওপোর তাঁর এমন নির্ভর ছিল সেই সন্তানের কাছ থেকেই মর্ম্মান্তিক আঘাত তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল একথা ভাবলে চোখের জল বাধা মানে না। বিপত্নীক মানুষ যেভাবে তাঁর সন্তানদের মানুষ করে তার চেয়ে অনেক বেশী বাধা বিঘ্নর মধ্যে দিয়ে বাবা আমাদের বুকে করে ঢেকে নিয়ে চলেছিলেন। জানিনা কেমন করে সন্তান এতো নির্ম্মম হয়? কেমন করে ভুলে যায় সেই বেদনা ভরা অতীত ইতিহাস।

আমার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীরা বাবাকে যীশুকেষ্ট বলে ডাকতো। আমার দৌহিত্র শ্রীমান কমলেশ ২৫শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করে ঐ সূত্রে বাবা তাঁকে যীশুখৃষ্ট বলে ডাকতেন। শিশুদের সহজ অনুকরণ অভ্যাসের বশে কমলেশও বাবাকে ঐ নামে ডাকতো। পরে নবাগতারাও বাবার ঐ নামই বাহাল রাখলো। বাবার মৃত্যুর খবরে ব্যথিত শ্রীমান পতাকী বিলেত থেকে আমায় যে চিঠি লেখে তাতে শেষ বয়সে বাবার ঐ মর্ম্মান্তিক দুঃখে মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করে লেখে—

"যে সমস্ত দিয়েই যায় তাকে কিছু দেওয়াই যে শক্ত। যে দেয় তার কাছে লোক হাতই পাতে তাকেও যে একবিন্দু দেওয়ার আছে একথা লোক যায় ভুলে। খোকনের দাদুকে যীশুখৃষ্ট নাম দেওয়াটাই সার্থক হয়েছে যীশুখৃষ্ট বা গান্ধীজীর সঙ্গে মৃত্যুর এমন সাদৃশ্য বোধ হয় আর কারুর হবে না।"

এই বিষয়ে উল্লেখ করে বাবার গুণগ্রাহী একটি ছেলের একটি কবিতা এইখানে দিলুম।

হে পিতৃব্য আর্য্যশ্রেষ্ঠ মহাঋষি বিংশ শতাব্দীর
বঙ্গের আকাশ প্রান্তে উজ্জ্বল নক্ষত্র সম স্থির।
উঠেছিলে প্রচারিতে কোন মহা আদর্শের বাণী
কর্ম্ম শেষে অস্ত গেলে নব এক ত্যাগ শিক্ষাদানি।
জাতির গৌরব তুমি মহাগুরু বাঙালীর পিতা।
কবিগুরু জানি তাই খুঁজি তোমা করেছিল মিতা।
গৌরবের রথ ত্যাজি এলে নামি পথ ধূলি পরে,
পরাধীন ব্যধি দুষ্ট বাঙ্গালীরে বাঁচাবার তরে।
অশিক্ষা ঘুচাতে তুমি বয়স্ক শিক্ষার আন্দোলনে,
শত শত অন্ধ মূকে দিলে আলো ভাষা সঙ্গোপনে!
আজি যেন তাহাদের উচ্চারিত যত বর্ণমালা,
অর্ঘদানে নবমন্ত্রে সাজাইল শুভ্র পুষ্প থালা।
দ্বিতীয় দধিচি তুমি হে মহা তাপস এ যুগের
তোমার পরশ লভি আলোকিত হৃদি যাহাদের,
হয়তো দরিদ্র তারা তবু খাঁটি ভক্ত সুসন্তান,
তোমার সাধনা তারা করিবে না কভু হীন ম্লান।
সুন্দর মহান তুমি, তাই ছিল সুকুমার নাম
অমৃত সন্তান ওগো মৃত্যুঞ্জয় তোমারে প্রণাম।

কবিতাটি ক্যানিং টাউনের এগ্রিকালচারাল অ্যাসিস্টেন্ট ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীমান হরিপদ সরকারের লেখা। এই সব বাবার হাতে গড়া ছেলেরা তাঁকে ভালবাসতো বুক দিয়ে। এরা পায়নি তাঁর আর্থিক সম্পদের ভাগ, তাই অন্তর সম্পদ নেবার যোগ্যতা এদেরই ছিল। এদের ভালবাসার মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে চির উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকবে বাবার আদর্শ অম্লান বিভাসিত হয়ে।

অসীম বন্ধুবৎসলতা

এ প্রসঙ্গে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিই—বাবার সামান্য দিনের সহকর্ম্মী * * মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং সামান্য কিছুদিন বাদেই মারা যান। তাঁর পৈত্রিক অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। কিছুদিন বাদে বাবা খবর পান তাঁর স্ত্রী শিশু পুত্র নিয়ে বড় দুঃখে পড়েছেন। বহু চেষ্টায় এক দরিদ্র পল্লী থেকে হ'ল তাদের উদ্ধার সাধন। তারপর থেকে সেই যক্ষ্মা রোগ গ্রস্থা বন্ধু পত্নী ও তার শিশু পুত্রের যাবতীয় দায়িত্ব নিজে তুলে নিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে ছেলেটিও অসুস্থ হ'ল। কাজেই লেখাপড়া শিখতে পারলো না। অথচ বাঙালীর ঘরের স্বভাব সিদ্ধ মতে বিধবা মা দিলেন ছেলের বিয়ে। পরে ছেলেটিকে কঠিন হৃদ রোগে বছরের পর বছর মেডিকেল কলেজে রাখতে

হয়েছে—বালিকা বধূ এদিকে পড়লো যক্ষা রোগের কবলে। এই দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ—তিনটি মানুষের খরচ ও দায়িত্ব বরাবর বাবা সম্পূর্ণ বহন করে চলেছিলেন। পেনসেনের পরও এঁদের কোনও রকম খরচ বাবা কমাননি। যখন নিজে পারেন নি সবটা, তখন বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে নিয়েও দিয়েছেন মফস্বল থেকে কোনও খাঁটি জিনিষ আনলে সেটা আগে যেতো তাঁদের বাড়ী। আমি জানতুম। কিন্তু পরে পুত্রও পুত্রবধূ বিরক্ত হওয়ায় বাবা ও সব জিনিষ আমার বাড়ীতে নামিয়ে বাড়ী যেতেন। পরে অফিস থেকে চাপরাশী এসে জিনিষ নিয়ে তাঁদের বাড়ী পৌছে দিত। কোথাও বিদেশে গেলে বাবার নিয়ম ছিল—স্টেশানে যাবার সময় ও ফেরার সময় আমায় দেখে যেতেন। একবার ঐ রকম বিদেশ থেকে ফেরার পর একটিন ঘী ও কিছু মিষ্টি আমার বাড়ীতে নামে এবং যথা সময়ে আমার শাশুড়ী সেগুলি ভাঁড়ার ঘরে তুলে রাখেন। তাঁরও কিছু দোষ দেওয়া যায় না। কোন মানুষ আমার ভালো জিনিষ পেলে মেয়ে জামাইকে না দিয়ে কবেকার মৃত বন্ধুর পুত্র ও পুত্রবধূকে খাওয়াতে ছোটে? তাও আবার কুটুম বাড়ীতে নামিয়ে? দুপুর বেলা বাবার চাপরাশী এসে হাজির।" সায়েব পাঠিয়েছেন' ঘীয়ের টিন জগন্নাথ ঘাটে পৌছে দিতে হবে। এখনও মনে আছে ঐ ঘীএর কথা শাশুড়ী মায়ের কাছে বলতে কি বিব্রতই আমি হয়েছিলুম। কোনও সৌখিন জিনিষ এলেও আমার আগে ঐ বন্ধুর পুত্রবধূ পেতেন। প্রকাশ বাবা নাকি সন্তানদের মধ্যে আমায় বেশী ভালো বাসতেন কিন্তু তাঁর সে স্নেহ এ ভাবে বাঁধা ছিল না। কলকাতায় থাকলেই প্রত্যহ নিজে গিয়ে তাঁদের সংসারের প্রতিটি সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাবস্থা করে আসতেন। ঐ সংক্রামক রোগের মধ্যে ও বাড়ীতে যেতে নিষেধ করে আমিই কত অনুযোগ করেছি। বাবা তার উত্তরে হেঁসে বললেন— "ঐ রোগের মধ্যে কেউ যায় না বলেইতো যেতে হবে রে।"

আমার মায়ের অসুস্থতার জন্য ও পিতৃদেবের পেনসন কমিউট করার জন্য শেষের দিকে তিনি আর্থিক অনাটনের মধ্যে কষ্ট পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বাইরের দান ধ্যান কিছুই বন্ধ হয় নি। যে সময় বাবা ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশান পদ ত্যাগ করে দেশের কাযের জন্যে শ্রীনিকেতনে যান ঐ সময় আমি বাবার কাছে কিছুদিন ছিলুম। তখন বাবার ঐ বন্ধুপত্নী মারা যান—বাবা তাতে দশদিন স্বপাক হবিষ্য খেয়ে ও পাদুকা ত্যাগ করে অশৌচ পালন করেছিলেন। কারণ সেই বন্ধুর পুত্র অসুস্থ সে অশৌচ পালন কর্ত্তে পার্কে না।" পরে ঐ বন্ধু পুত্র ও পুত্রবধূ দুজনেরই মৃত্যু হয় আমি জানি বাবা এতে কি গভীর শোকই পেয়েছিলেন।

আর এক সময় তাঁর আর এক মৃত বন্ধুর অপ্রকাশিত বই সেই বন্ধুর স্ত্রীর ইচ্ছার জন্য বহু ব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে নিজে প্রকাশ করেন। তখন নিজের

শরীর খুব অসুস্থ ও যুদ্ধের বাজারে সবই দুষ্প্রাপ্য থাকায় ঐ ব্যাপারে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। তাঁর এই অনুপম বন্ধু বৎসলতার উল্লেখ করে শ্রদ্ধেয় গিরীশচন্দ্র সেন (ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির সেক্রেটারী) লিখেছেন "বন্ধুদের জন্য সুকুমার সব করতে পারতো।" শ্রদ্ধেয় বিনোদ বিহারী সরকার মশাই লিখেছেন—"সুখে দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন এমন হিতৈষী বন্ধু—এমন উদার নিঃস্বার্থ পরপোকারী হিংসা দ্বেষ শূন্য মহাপুরুষ কয়জনের ভাগ্যে এমন সুহৃদ জোটে—আমি সত্যই মহা ভাগ্যবান।"

অতুলনীয় আশ্রিত বৎসলতা

সব চেয়ে বেশী ছিল তাঁর আশ্রিত বৎসলতা। অনেক দুঃখী পিতৃহীন—নিঃস্ব বিধবা নিরাশ্রয় বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও বিশেষ করে ছাত্রদের তিনি আশ্রয় স্থল ছিলেন। যখন বাবা ভাটপাড়ার চীফ একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন তখন সেখানে একত্র দুটি মস্ত দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাবা ছিলেন। লেখা পড়া ও চাকরীর সূত্রে আমার ভাইভাজেরা ও মা সবাই কলকাতায় ছিলেন। দুটো বাড়ীর মধ্যে বাবা দরজা করিয়ে নিয়েছিলেন—মহা সমারোহে বাবার প্রকাণ্ড সংসার চলছে। আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে বাড়ীটি সুকুমার বাবুর দান ছত্র বলে অনেকে উল্লেখ করতেন। ঐ সময় ১৫।১৬টি ছেলে বাবার কাছে থাকতো—কেউবা স্কুল কলেজে পড়তো কলকাতায়—কেউবা চাকরী করতো কলকাতায়। তখন এখনকার মত মেস হোস্টেলে স্থানাভাব ছিল না। তাসত্ত্বেও কতটা সুবিধে পেলে যে লোকে ঐ ভাবে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে তা সহজেই সবাই বুঝতে পারবেন। ঐ প্রত্যেকটি ছেলের সুখ সুবিধার দিকে ছিল বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁর নিজের আহার ও শয্যার সঙ্গে তাদের পার্থক্য হওয়ার উপায় ছিলনা। এই বিষয় একদিনের ঘটনা উল্লেখ করি। বাবা খেতে বসে দেখেন দইএর পাথরের খোরাটি পরিপূর্ণ। তার আগেই একটি ছেলে ভাত খেয়ে গিয়েছে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন "ঠাকুর! পঙ্কুকে দই দাওনি কেন?" ঠাকুর কুণ্ঠিত ভাবে বলে "আপনি খাননি এখনও—দই ভাঙলে জল কেটে যাবে বলে ঐ বাবুকে দিইনি।" একথার উত্তরে বাবা বলেন "ঐ ছেলেরা কোনও জিনিষ না খেতে পেলে তা খেতে আমার ভালো লাগে না—আমি আজ দই খাবো না।" ঠাকুর তো মহা অপ্রস্তুত।

ঐ বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রর সঙ্গে বিছনাও ছিল। যখন যে লোক থাকতো সে ঘরে সে ব্যবহার করতো। পরে আবার যে আসতো সে পেতো। একবার একটি ছেলে যাবার সময় সমস্ত বিছানা নিয়ে চলে যায় কেবলমাত্র মশারীটি ফেলে যায়—ঐ খবর চাকর বাবাকে জানালে বাবা ভয়ানক

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বললেন "নিশ্চয় তাড়াতাড়িতে বিছানা করানোর ওর সময় ছিল না—বলতেও ভুলে গিয়েছে—কিন্তু মশারীটা ফেলে গেলো কেন? সেখানে যা ম্যালেরিয়া,—বিপদ বাধাবে দেখছি।" তখুনি আমায় ডেকে বলেন 'কাল সবচেয়ে দরকারী কাজ হ'ল তোমার ওই মশারী পাঠানো।" এবং পরদিন অফিস যাবার সময়—ঐ মশারী পাঠানোর জন্ম আমায় মনে করিয়ে দেন ও চাপরাশিকে রেখে যান।

ঐ সময় আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাবার কাছে নৈহাটীতে থাকতেন। তার নানা প্রকার নেশার অভ্যাস ছিল। সে কারণে প্রায় নানা অশান্তির সৃষ্টি হ'ত। তাঁকে সরিয়ে দেবার কথা বাবাকে বলায় বা বলেন—"ওর একজন গার্জ্জেন দরকার কিছুদিন আমার কাছে থাকলে ও ঠিক সেরেযাবে।" তারপর প্রায়ই অপর ছেলেদের নালিশে বিব্রত হয়ে একদিন বাবাকে বলি যে ও রকম লোক বাড়ীতে না রাখাই ভালো। তার উত্তরে বাবা বলেন "ওতো আমার পর নয়।" বলে যে পরিচয় দিলেন তাতে বুঝলুম ভদ্রলোক ঠাকুর্দ্দার জ্যাঠতুতো ভায়ের মাসীর দেওর। বাবার আত্মীয় জ্ঞান এতোই সহজ ছিল।

অর্থে নিস্পৃহতা

অর্থ জীবনে তিনি কম উপার্জ্জন করেন নি। কিন্তু সঞ্চয়ের স্পৃহা তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর আশ্রিত পোষ্যদের উল্লেখ করে তাঁর এক নিকটতম আত্মীয় তাঁকে বলেন এবার তো আপনার পেনসন হবে এখন আর অত খরচ করা ঠিক নয়। ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে তো?" তার উত্তরে বাবা বলেন—"আমার উপার্জ্জনে দেশের ও দশের দাবী আছে আমি যে শুধু আমার পরিবারবর্গের জন্যে উপার্জ্জন করি একথা তোমরা ভাবো কেন?" টাকা কড়ির সম্বন্ধে তাঁর ভারী সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। টাকাপয়সা সত্যই তিনি প্রায় স্পর্শ করতেন না। আমায় কিছু দিতে হলে ভাইদের হাত দিয়ে দিতেন ভাইদের দেবার বেলায় দিতেন আমার হাত দিয়ে। টাকা কড়ির সম্বন্ধে যখন যে থাকতো তাঁর কাছে তার ওপোরেই নির্ভর করতেন। এমন কি সামান্য দান ধ্যান বা বাস ভাড়ার জন্যেও তার কাছে হাত পাততেন এবং যথা সময়ে তাকে একটি মস্ত অঙ্কের চেক কেটে দিতেন—তাঁর এই বিশ্বাস ও নির্ভরতার অপব্যাবহারও অনেক নিকটতম আত্মীয়রা কেউ কেউ করেছেন।

দানে গোপনতা

বাইরে দানের বেলায় ও তাঁর প্রচুর গোপনতা ছিল। ডান হাত দান কোরবে বাঁ হাত বুঝতে পারবে না, তাঁর দান সত্যসত্যই সেই ধরণের ছিল। যে সব দুস্থ আত্মীয়দের বাবা ও কাকা মাসিক সাহায্য কোরতেন তাঁদের

জন্য মাসের গোড়ায় কাকার কাছে বাবার 'চেক্' যেতো। কাকার নিজের যা দোবার একত্র কোরে তাঁদের পাঠাতেন। তাঁর এই স্বভাবের জন্য বহু-লোকই তাঁর কাছে প্রচুর পেয়ে অস্বীকার করে এসেছে। যে সব নিকট আত্মীয়র মেয়ের বিয়ের প্রচুর ব্যয়ভার বাবা বহন কোরে এসেছেন সেই মেয়েদের মধ্যেই একজনকে বোলতে শুনেছি—মশাই আমায় কিন্তু বিয়ের সময় কিছু দেন্‌নি'। দেখেছি তাঁর নীরবে হাজার টাকার চেকের চেয়ে একটা সাড়ী বা ব্রূচ দিয়ে অনেক ধনী আত্মীয় খুব নাম নিয়ে গেছেন।

আমাদের আরেকটি নিকটতম আত্মীয়ের চিকিৎসা ও শ্রাদ্ধের সমুদয় ব্যয়ভার কাকা ও বাবা সমান ভাবে বহন কোরেছিলেন। এ কথা যে সময় আমি বাবার কাছে ছিলুম বোলেই জানি। কিন্তু পরে শুনি কাকা তবুবা কিছু দিয়েছেন বাবা কিছু দ্যাননি—এ নিয়ে অনেক সময় অনেক অনুযোগ আমি করা সত্ত্বেও বাবা দেখিয়ে নিজে হাতে কোরে কখনো কারুকে কিছু দেন্‌নি। কারুর অসুখের সময় হাতে করে ফল নিয়ে দেখতে যাবার পক্ষপাতী বাবা ছিলেন না। বোলতেন "ফল হয়ত ঐ রুগী খেতে পারে না তার চেয়ে একটিন গ্লুকোজ বা হরলিক্‌স্ দোয়া ঢের ভালো" সাধ্যমতে চেক দোয়াটাই বেশী পছন্দ কোরতেন।

নিজ-স্বার্থে উদাসীনতা

উপার্জ্জনক্ষম শিক্ষিত গৃহস্থদের দানের সময় বাবার অন্য নিয়ম ছিলো। সে যা চাইত দিতেন তবে মুখে বোলতেন 'ধার দিলুম'। বলা বাহুল্য ফেরৎ বড পেতেন না। পেলে তক্ষুনি কোন সাহায্য ভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন বাবাকে এর অর্থ জিগেশ করায় বাবা বলেন "ওতো আমি দান ভেবেই দিয়েছিলুম তাই আবার নিতে পারি না—, তবে ভদ্রসন্তান বিপদগ্রস্থ হয়ে এসেছে, দান বোলে দিলে তাকে অসম্মান করা হয়—নিজেরও অহেতুক দম্ভকে প্রশ্রয় দোয়া হয়। তাই ধার বোলে দিলে সব দিক থেকে শোভন হয়।" এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। সেবার একটি গ্রাজুয়েট ছেলে ৫০০৲ টাকা চায় ঘী-এর ব্যবসা কোরবে বোলে। যথানিয়ম অনুসারে বাবা আমার স্বামীকে বলেন "ওহে এই ছেলেটাকে ৫০০৲ টাকা দিয়ে আমার হিসেবে লিখে রাখো।" ছেলেটাকে বোল্লেন "ব্যবসায় লাভ হলে ঐ টাকা ফেরৎ দিতে হবে কিন্তু"। অনেকবার ঠকে ঠকে উনি এবার সতর্ক হয়েছিলেন, তাই ছেলেটাকে ৫০০৲ টাকা না দিয়ে ২০০৲ টাকা মাত্র দেন। তারপর প্রত্যেক পরিচিত বাড়ীতে বাবার চিঠি নিয়ে নিয়মিত খদ্দের ঘরও হল প্রচুর। পরে ছেলেটা আর সব বাড়ীতে ঘী দিলেও আমাদের বাড়ীতে কিছুতে আসতো না। তার হয়তো ভয় ছিল পাছে তার ধারের টাকা থেকে ঘীয়ের দাম বাদ দিই।

কিছুদিন বাদে শুনলুম সে ব্যবসা ছেড়ে অন্য কাজ কোরছে। পরে অন্য কাকে টাকা দেবার প্রসঙ্গে একদিন আমার স্বামী বাবাকে বলেন দেখলেন তো সে ছেলেটা ঘিয়ের ব্যবসা কোরে টাকা ফেরৎ দিতে পারলো না? তবু আমি পুরো ৫০০৲ না দিয়ে ২০০৲ দিয়েছিলুম। ঐকথা শুনে বাবা অসন্তুষ্ট হন বলেন তুমি অন্যায় করেছ ঐ জন্যেই ছেলেটা দাঁড়াতে পারলো না ২০০৲ টাকায় ব্যবসা হয়? তোমার ভুলেই তার ক্ষতি হল। মনে আছে ঐদিন উনি খুব অপ্রতিভ হয়েছিলেন।

আর একবারকার ঘটনা মনে পড়ে, তখন বাবা ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। রমেশ নিয়োগী নামে একটি ভদ্রলোককে বাবা সৎ নির্ম্মল চরিত্র শুনে খুব স্নেহ করতেন। ঐ সময়ে চালের ব্যবসা কর্ব্বে বলে স্বল্প পরিচিত একটি লোক বাবার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার বলে নেন। যথারীতি টাকাটি বাবা রমেশ বাবুর হাত দিয়ে দেন। ভাগ্যক্রমে লোকটি চালের ব্যবসায় মোটা লাভ করেন। অনেকেই লাভের অঙ্ক বাবাকে বলতো না। এমন কি আমাদের কোথাউ থেকে কিছু লাভ হলেই বাবা বলতেন সেটা কোন ফাণ্ডে দিয়ে দিতে। কারণ বাবার ধারণা ছিল সামান্য টাকায় কুলোয় না বলেই সবাই ইচ্ছে সত্ত্বেও সৎকাজ করতে পায় না। ঐ টাকা যখন বাড়তি পাওয়া গেল তখন ঐ সুযোগে পরহিত ব্রতে কিছু সাহায্য করার আনন্দ পাওয়া যাবে। যাই হোক এবার সে ভদ্রলোকের লাভের খবর রমেশ বাবুর কানে যায়। টাকার অঙ্কটিও একটু বড় রকম ছিল কাজেই রমেশবাবু বোধ হয় সতর্কও ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বাবার নাম করে টাকাটি ফেরৎ চান। সে লোকটির বোধ হয় পিতৃদেবের চরিত্রে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল তাই টাকা না দিয়ে রমেশ বাবুকে বলেন রায়বাহাদুর টাকা দিয়েছেন তিনি ফেরৎ চাইবেন তুমি কেহেঁ বাপু?

ঐ সময় আমি ভাটপাড়ায় বাবার কাছে ছিলুম। একদিন সন্ধ্যেয় বাবার ঘরে গোলমাল শুনে দেখি বাবা রমেশবাবুকে খুব বকছেন, রমেশবাবু ভয়ে প্রায় কম্পমান। দোতলায় বাবার বসার ঘরে একটি মাদুরের ওপর ডেকস্ রেখে বাবা নথী পত্তর দেখতেন। সামনে একটি বড় গালচে পাতা থাকতো ভদ্রলোকরা এসে বসতেন। নিচেকার ড্রয়িং রুমটি ইংরেজী কেতায় সাজান ছিল। শুনলুম বাবা বলছেন আমি কাকে টাকা ধার দিয়েছি সে হিসেব রাখার জন্যে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি তোমায় মাইনে দেয় না। তার চেয়ে নিজের কাজে দৃষ্টি রাখ। মেথররা নাম সই করতে পারলে ১৲ টাকা করে যে বেশী পাবে তার হিসেবটা তৈরী হয়েছে? আমি আজই তোমায় ডিসমিস করতুম কিন্তু নিজে ভালো বলে তোমায় এনেছি তাই পারি না। বলা বাহুল্য ঐ টাকার কথা ঐখানেই শেষ।

আর একবার রমেশবাবু বাবার অসুখ শুনে দেখতে আসেন। ঐ সময় তাঁকে দেখেই বাবা বল্লেন আমার অসুখে তোমায় দেখতে আসার দরকার নেই। সেজন্য ডাক্তাররা আছে। নিজের কাজে মন দাও। এধারে শুনছি নতুন যে পিয়ন ভর্ত্তি হয়েছে সে আজ অবধি একটা চৌকী পায়নি। যাও আমি শুনি যেন সে আজই চৌকী পায়। নিম্নলিখিত পত্রিকার সংবাদও তাঁর ঐ স্বভাবের পরিচয় দেবে।

এই সামান্য দু একটি ঘটনাতেই বোঝা যায় নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না। অথচ দীন দুঃখী সকলের সামান্য সুখ সুবিধার দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকতো সদা জাগ্রত হয়ে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা ২০শে আশ্বিন, মঙ্গলবার।
জামালপুর, ময়মনসিংহ ২রা অক্টোবর।

পদস্থ কর্ম্মচারীর সদাশয়তা

বাঙ্গালার রেজিষ্ট্রেশান বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারল মিঃ সুকুমার চ্যাটার্জ্জী এম. এ., এল. বি., ই মহাশয় সম্প্রতি ময়মনসিংহ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রেশান সার্ভিস এসোসিয়েশান তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য এক পার্টির আয়োজন করেন। কিন্তু ইনস্পেক্টর জেনারল মহাশয় যাহাতে সংগৃহীত অর্থ তাঁহার সম্বর্দ্ধনার পরিবর্ত্তে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যকল্পে ব্যায়িত হয় তদ্রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী এশোসিয়েশান ১০১ টাকা বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডারে পাঠাইয়াছেন।

মর্ম্মান্তিক পরিহাসে বেদনা

এই সূত্রে একটি গভীর দুঃখের কাহিনী মনে পড়ে। সন্তানের কাছ থেকে ঐ দুঃসহ আঘাতের পর প্রায় শেষ জীবনে ভাঙ্গা শরীর ও মন নিয়ে তিনি নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য ও পুনর্বসতির কাজের জন্য যান। হিন্দু মহাসভার সুযোগ্য সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে যোগ্যতম ব্যক্তি বলে নির্ব্বাচিত করেন। ঐ সময় হিন্দু মহাসভার জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর ঠাট্টার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বলেন করেছেন কি এত কাঁচা টাকা সুকুমার বাবুর হাতে দিয়েছেন, তিনি তো নিজেই সব খেয়ে শেষ কর্বেন।" এই কথায় পিতৃদেব এত মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন যে ঐ কথার উল্লেখ বহুবার বাবার মুখে শুনেছিলুম।

অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্য জ্ঞান

কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁর ছিল সাধারণ। ঐ কারণে কারুর কর্ত্তব্য কাজে

অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত জ্বলে উঠতেন। অনেক অল্পবুদ্ধি লোক এজন্য তাঁকে রাগী মনে করতো। এই গভীর কর্তব্যজ্ঞানকে রাগ বা অসংযম ভাবলে ভুল করা হবে।

এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বিনোদবাবু লিখেছেন, 'এমন যে পরোপকারী পরহিতৈষী লোক সুকুমারবাবু ছিলেন তবু কারুর কর্ত্তব্য কাজে বিন্দুমাত্র অবহেলা তিনি সহিতে পারিতেন না। তখন তিনি বজ্রের মত কঠোর হইতেন। মনে পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে সুকুমারবাবুকে একবার বলেন "তুমি খাঁটি ইংরেজের স্বভাব পেয়েছ কর্ত্তব্য কাজে বিন্দুমাত্র অবহেলা সহ্য করতে পার না।' একথার উত্তরে সুকুমার বাবু বলেন 'আমরা ঐ রকম শিক্ষাই পেয়েছি নিজে কোনদিন কাজে অবহেলা করিনি, অন্যের অবহেলাও সেজন্য আমার অসহ্য মনে হয়।'

বাবা যখন যে কাজ ছেড়ে এসেছেন তাতে তাঁর ব্যক্তিগত কারণ কখনো থাকেনি। অন্যায় ও দুর্নীতি দমনের চেষ্টায় তিনি প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছেন, যখন পারেন নি নিজে সরে এসেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শ্রীনিকেতনেও এই সূত্রে একটি কর্ম্মবিমুখ কর্ম্মচারীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ তিনি কর্তৃপক্ষকে জানান। এল্মহার্ষ্ট সাহেব শিক্ষাসূত্রে নিজের একটি গ্রামোফন দান করেন। ঐ গ্রামোফোনটি ঐ কর্ম্মচারী আত্মসাৎ করেছিলেন আরোও কয়েকটি অসাধু কাজ করেছিলেন। পিতৃদেব ঐ কথা শুধু গোপনে কর্ত্তৃপক্ষকে জানান নি তাঁর মুখের ওপরই বলেছিলেন, "ওপরওলার খোসামোদ করা আর তাঁর সঙ্গে ব্রীজ খেলার জন্য শ্রীনিকেতন থেকে তোমায় মাইনে দোয়া হয় না।" ফলে ঐ কর্ম্মচারিটি ওপরওলার কাছে নানা রকম লাগিয়ে পিতৃদেবকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন। এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সুধাক্রান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়ের কাছে পিতৃদেবের শ্রাদ্ধবাসরে শোনা গল্পটি উদ্ধৃত করলুম।

"যখন ঐ চক্রান্ত চলেছে এমন সময় একদিন সুকুমার বাবু আমায় ডেকে বলেন 'আপনার সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় কথা আছে' কিন্তু যে রকম খোলা জায়গায় ও দরাজ গলায় তিনি কথা আরম্ভ করলেন তাতে আমি একটু শঙ্কিত হয়ে বল্লুম, "আপনার কথা বলার ধরণ দেখে ব্যাপারটা গোপনীয় বলে তো মনে হচ্ছে না।" তাতে সুকুমার বাবু বল্লেন, 'না আমি শুধু জানতে চাই আমার বিরুদ্ধে যে চক্রটি তৈরী হয়েছে তার মধ্যে আপনি একজন চক্রী কিনা— এই গল্পটির উপসংহারে শ্রদ্ধেয় সুধাকান্ত বাবু বলেন "তাঁকে সরলতার পূর্ণ অবতার বলা চলে।"

প্রথম যখন বিশ্বকবির আমন্ত্রণে তিনি নিজের উচ্চপদ (ইনস্পেক্টার জেনারল অব রেজিস্ট্রেশান) অবসর গ্রহণের বহুপূর্ব্বে বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করে শ্রীনিকেতনে

যোগদান করেন তখন বহু বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন তাঁকে নিষেধ করেন। নিজের স্ত্রীপুত্র সবাই নানা প্রকার বাধা দেবার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। ডিপুটী জীবনের কষ্টকর অধ্যায় শেষ হয়ে যখন সবে আরাম ও সম্মানের পদে আরোহণ করেছিলেন। এ সময় চাকরী ছাড়ার জন্যে কম করে. ৪৫ হাজার টাকার ক্ষতি তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেন। তাঁর এই দেশপ্রেমের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে ষ্টুডেণ্টস হলের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি বিদায় সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রে আলাপ হলেও ঐ মুখোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে বাবার অত্যন্ত স্নেহ সম্পর্ক ছিল। বাবা বিলাসবাবু ও লতাদির সম্বন্ধে আদর্শ দম্পতি বলে উল্লেখ করতেন। তাদের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অবধি ছিল না। আজো মনে পড়ে বিলাস বাবুর ঐদিনের ভাষণ কি মর্ম্মস্পর্শীই হয়েছিল। ঐদিন ফেরার পথে পিতৃবন্ধু মিঃ জে. কে. বিশ্বাস আমায় বলেন—"সুকুমার সরল বিশ্বাসে আদর্শের আনন্দে অত বড় চাকরী ছেড়ে যাচ্ছে, আমার ভয় হয় পাছে আঘাত পেয়ে ফিরে আসে, . আর ঠিক এই ধরণের আশঙ্কাই করেছিলেন আমার স্নেহময় খুল্ল পিতামহ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এঁদের এই কথা পরে বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়েছিল। ঐ শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেওয়ার সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেবকে লেখা একখানি চিঠি নীচে উদ্ধৃত করলুম।

ওঁ

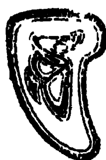
"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু গভর্মেণ্টের কর্ম্মশালা থেকে অবকাশে তোমার বন্ধনমুক্তি হয়েছে সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হলুম। আশীর্ব্বাদ করি, নূতন ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির পথে তোমার অধ্যবসায় কল্যাণময় হোক। ইতি ১১।৬।৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাবার এই স্বদেশপ্রেম ও দুঃস্থের সেবার আগ্রহের মর্য্যাদা দিয়েছিলেন। পিতৃদেবও তাঁর অসীম স্নেহলাভে তৃপ্ত হয়েছিলেন। বিশ্বকবি বাবার বাসের জন্য তাঁর শ্রীনিকেতনের বিখ্যাত গেষ্ট হাউসটি ঠিক করেছিলেন। ঐ বাড়ীটি পূর্ব্বে লর্ড সিংহের বাড়ী ছিল। কিন্তু বাবা বাহুল্যবোধে ঐ বাড়ী ও মটর নেন নি। সাধারণ নিম্নতম কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সমান কোয়ার্টার নিয়েছিলেন এবং এ্যালাউন্স বলে যে মাত্র ১০০ টাকা নিতেন তাও প্রতিমাসে বাঁকুরা রিলিফ ফণ্ডে দিতেন এবং নিজে দূর কষ্টসাধ্য গ্রাম গ্রামান্তরে সাইকেলে বা গরুর গাড়ীতে যেতেন।

বাবা চাকরী ছেড়ে শ্রীনিকেতন যোগ দেওয়ায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আনন্দ প্রকাশ করে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন তা এইখানে উদ্ধৃত করলুম।



3

GOURIPUR LODGE.
KALIMPONG

কল্যাণীয়েষু

শ্রীনিকেতনের
ঠিকানা থেকে তোমার
সম্ভাষণ পেয়ে অত্যন্ত
খুশি হলেম। অনেকদিন
থেকেই প্রত্যাশা করে
ছিলুম। কাজের পথ
অভ্যাসের ঘর্ষণে ক্ষীণ
হয়ে আসে — তোমার

হাতে তার সংস্কার
হবে এই আশায় আমার মন
উৎসাহিত। কিন্তু কাজ
করতে পারিনে, অসম্পূর্ণ
থেকে যায়, নূতন উদ্যম
ও নূতন শক্তি নিয়ে তোমরা
এসে দাঁড়ালে আমার ক্লান্ত
মন আবার ভরসা পায়।
আমার আশীর্বাদ গ্রহণ
করো। ইতি ২৮ বৈশাখ
১৩৪৫ তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতৃদেব দেশের কাজে নিমগ্ন থাকার দরুণ নিজের দিকে মোটে লক্ষ্য রাখতেন না। এজন্য রবীন্দ্রনাথ বাবার জন্য যে কত ভাবতেন তা এই নীচে লেখা কাহিনীটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কাহিনীটি পিতৃদেবের রচিত অপ্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে" থেকে কয়েক পাতা উদ্ধৃত করে দেখো হল। পিতৃদেব এই অধ্যায়টির নাম দিয়েছিলেন—

অপরিমেয় স্নেহ

একবার শ্রীনিকেতন থেকে কলকাতায় আসার দিন স্থির করেছি। এমন সময় শুনলাম তার ঠিক আগের দিন সদলবলে গুরুদেব কলকাতা আসবেন।

আমি যাত্রার দিন বদলে ষ্টেশানে এলাম। গুরুদেবের গাড়ীর কাছে দাঁড়াতেই বললেন কী সাহেব তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি চাকরীর আমলের প্যান্ট বা হাফপ্যান্ট পরে থাকতুম বলে তিনি রহস্য করে আমায় সাহেব বলতেন।

আমি উত্তর দিলাম কাল কলকাতা যাব ভেবেছিলুম কিন্তু আপনারা সবাই আজ যাচ্ছেন বলে আজই যাচ্ছি কর্ত্তব্যো মহাশ্রয়। গুরুদেব ফার্ষ্ট ক্লাসে বসলেন। আমাদের ইণ্টার ক্লাসের দলও বেশ ভারি হয়েছিল। বর্দ্ধমান আমাদের জলযোগের নির্দ্দিষ্ট স্থান। সেখানে গাড়ী দাঁড়াতেই রাণীচন্দ চায়ের অর্ডার দিলেন এবং আলুকে বললেন গুরুদেবের কামরা থেকে টিফিন ক্যারিয়রটি আনতে।

[আলু ওরফে সচ্চিদানন্দ রায় অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র অবিবাহিত, সদাপ্রফুল্ল ও ভবঘুরে ঐ সময় তিনি গুরুদেবকে দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।]

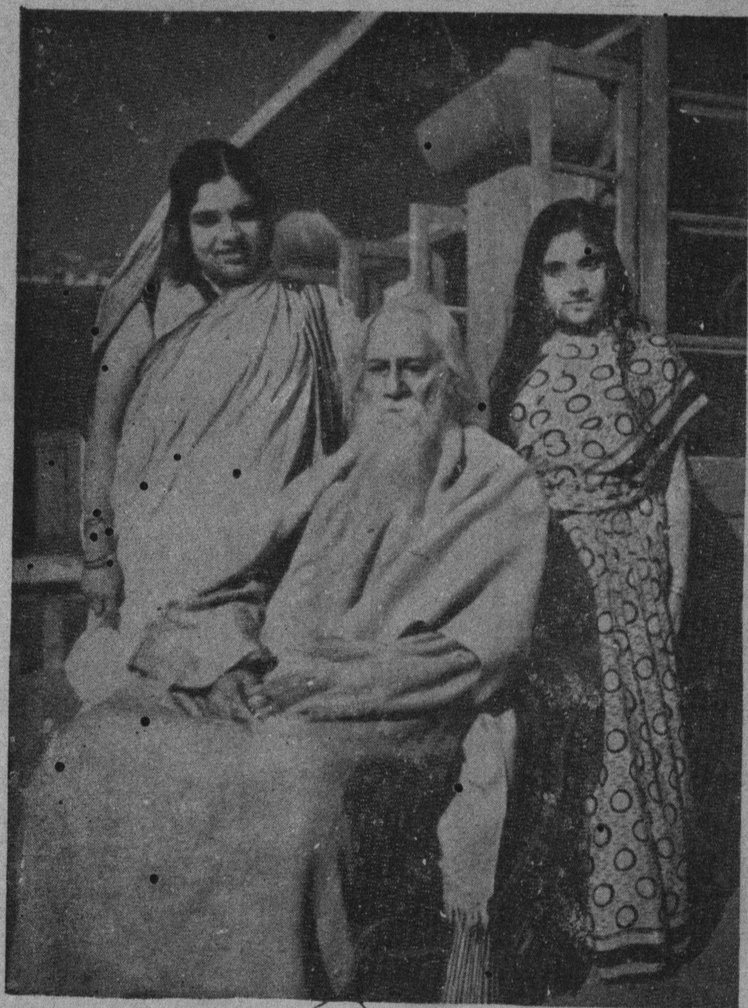
খানিক পরে আলু ফিরে এসে রাণীর কাণে কাণে কি যেন বললেন এবং রাণী খাবারওয়ালাকে ডেকে প্রচুর পরিমাণে সিঙ্গাড়া কচুরী কিনলেন। পরে বোধ হয় কয়েক ঠোঙ্গা সাড়ে বাত্রিশ ভাজা কিনে আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

গাড়ী যথাসময়ে হাবড়াতে পৌছুল। গুরুদেবকে চাকা দেওয়া চেয়ারে বসিয়ে গাড়ীতে তুলে দোয়ার পর আলু এসে প্রকাণ্ড টিফিন ক্যারিয়রটি আমার গাড়ীতে তুলে দিয়ে বললেন, "গুরুদেব বলে দিলেন যে সুকুমার যাচ্ছে বাড়ীতে খবর না দিয়েই এত রাতে ওর খাবার হয়তো থাকবে না, আমার এই খাবার ওকেই দিও।"

বেশী রাত হয়নি। সুতরাং বাড়ীতে যে খাবার ছিল না তা নয়। কিন্তু সেই প্রসাদ যে কী পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমিও ছেলেরা খেয়েছিলুম তা জীবন থাকতে ভুলবো না।

আমার জীবনে বিশ্বকবির শেষস্মৃতি ও
শ্রীযুক্ত আলুর কাছে বাবার বিষয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি

বাবা শ্রীনিকেতনে থাকাকালীন আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই ঐদিনের সুমধুর স্মৃতি আমার জীবনের মণিকোঠায় চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। দুঃখ ঐদিনই গুরুদেবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। ঐ সময় শ্রীযুক্ত আলুর প্রসঙ্গে গুরুদেব আমায় বলেন "ওর দাদার নাম পটল আর ও বলে কিনা ওর নাম সচ্চিদানন্দ। পটলের ভাই কখনো সচ্চিদানন্দ হয়? আমি বললুম না বাপু তোমার নাম হচ্ছে আলু এখন ওর আলু নামটাই সবাই জানে।" এই কথার উত্তরে আমি আমার কিশোরী কন্যা পার্ব্বতীকে দেখিয়ে বলি "আমার



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন—লেখিকা, কবি, লেখিকার কন্যা পার্ব্বতী ১৯৪০

এই মেয়েটিকেও আমার শ্বশুর আলু বলে ডাকতেন।" তার উত্তরে পরম স্নেহভরে পার্ব্বতীর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, "নানা, তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ, তিনি আলু বলেন নি, এ মেয়ে তো আলো।" তাঁর ঐদিনের মধুময় স্নেহস্মৃতি স্মরণ করে কত কথাই ছবির মত মনে ভেসে আসে। তাঁর কথা বলার একটা ভারি সুন্দর নিজস্ব ভঙ্গী ছিল যা মানুষকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে নিয়ে যেতো।

একবার একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথকে লেখে, "আমার দাদা বলেছেন আপনি নাকি বাংলা ছাড়া কিছু পড়েন নি।" এর উত্তরে গুরুদেব লেখেন, "তোমার দাদা ঠিকই বলেছেন, তবে তুমি বোধ হয় একটু ভুল শুনেছ, আমি বাংলা ছাড়া আর কিছুই পড়িনি।"

ঐ ছেলের দাদার সম্মানও রাখা হল অথচ এক কথায় এত ছোট্ট, এত স্পষ্ট উত্তর আর কারুর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হত না।

ঐদিনের তাঁর সঙ্গের ছবিখানি এখানে উদ্ধৃত করলুম। ঐদিন পিতৃদেবকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ওহে সুকুমার, তোমার কন্যে বলে কি? আমি নাকি তার চিঠির উত্তর দিতে দেরী করেছি, এরকম অসৌজন্য তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সেইদিন পরম স্নেহভরে রবীন্দ্রনাথ আমায় আমন্ত্রণ করেন। বলেন তোমরা চলে এস এখানে ছোট্ট একটি বাড়ী করে থাকবে, আমি কত গান শোনাবো কত গল্প বলবো।" ঐ মহাপুরুষের সেই শেষদিনের সান্নিধ্যের স্মৃতি স্মরণ করে আজও নয়ন অশ্রু সজল হয়ে ওঠে।

ঐদিন ফেরার পথে শ্রীযুক্ত আলুর কাছে বাবার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তির আর একটি গল্প শুনি। তখন শ্রীনিকেতনের গেষ্ট হাউসটি বাবার তত্ত্বাবধানেই ছিল। ঐ সময় বোধ হয় ডাঃ সুধীর সেন (অধুনা সেক্রেটারী দামোদর ভেলী কর্পোরেশান) ইকনমিষ্ট. ঐ গেষ্ট হাউসটির একটি ঘরে থাকতেন। কোন কাজে তিনি অন্য দেশে যাওয়ায় ঘরের চাবিটি বাবাকে দিয়ে আসেন। ঐ সময় কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিতা মহিলা শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যান ও থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম করে বাবার কাছে ঐ ঘরের চাবী চান তাতে বাবা বলেন, অপরের ঘরের চাবী আমি অন্যকে দিতে পারি না।" তাতে তাঁরা বলেন, "আপনার দায়িত্ব কি? গুরুদেব বলেছেন তাই আপনি দিচ্ছেন।" এর উত্তরে বাবা বলেন, "গুরুদেব অর নো গুরুদেব ও চাবী আমি দেব না।. আমার বাড়ীটি বরং আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ ছেড়ে দিচ্ছি।" ঐকথা শুনে স্নেহভরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার শ্রীনিকেতনে হিটলার এসেছে, ওকে মানতেই হবে।"

ঐ সময় শ্রীনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন আমি ছিলুম। সহজ ছোট্ট গ্রাম্য জীবন ভারি মুগ্ধ করেছিল আমায়। শ্রীনিকেতনে যাবার সময় বাবা বলে গিসলেন, এত ছোট্ট বাড়ীতে সেখানে থাকবো ,যে তোমাদের যাবার উপায় নেই।” শুনে আমি শুধু হেসেছিলুম। বাবাও মনে মনে জানতেন আর কারুকে আনা না আনা চলতে পারে, এ মেয়ে কিছু মানবে না। তাই যথাসময়ে সদলবলে আমরা হৈ হৈ করে গিয়ে উঠলুম বাবার কাছে। শেষে আমার জামাই মেয়ে পর্য্যন্ত। প্রথম শোবার ঘর আমায় দিয়ে বাবা ছিলেন বৈঠকখানায়, শেষে আমাদের জ্বালায় গ্যারেজটি পর্য্যন্ত শোবার ঘরে রূপান্তরিত হয়েছিল! চিরকালই বাবার কাছে সমারোহের মধ্যে ছিলুম, প্রকাণ্ড বাড়ী, গাড়ী, দাস্‌-দাসী ড্রাইভার চাপরাশী। এবারে অন্য ধারার মধ্যে গিয়ে পড়লুম। আমার মেয়ের ঝি কিরণ তো হঠাৎ বাবার এ রকম ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বেশ খানিক দুঃখুই প্রকাশ করে ফেললো। ঐ সময়ের আমার লেখা একটি কবিতা এখানে দিয়ে শ্রীনিকেতন প্রসঙ্গ শেষ করি।

পিতৃধন ভিক্ষা

হে পিতা জনক মম উদার চরিত
কি মহান হৃদিখানি তব
খুলিলে নূতন বিশ্ব নয়নে আমার
মনোহর কিবা অভিনব।
ক্ষুদ্র দুইখানি গৃহে সংসার তোমার
আবদ্ধ নহে তো পিতা কভু
ক্ষণিকের মোহ পাশে রওনিত বাঁধা
তুমি নিজে আপনার প্রভু।
আপনার স্বার্থ তরে নাহি অভিলাষ
নাহি কোন ভোগ সুখ আশ
উজ্জ্বল মুরতি তব ওগো চির ঋষি
মোর হৃদে চির সুপ্রকাশ।
আমাদের ছোটখাট দুখ অভিযোগে
বিচলিত হও নিত তুমি
কেঁদেছে আকুল হিয়া দুখীদের তরে
হেরি দুঃস্থ এ ভারত ভূমি।
কর্ম্মযোগ ব্রত করি করিতেছ কাজ
ঘুচাইতে অন্ধকার ভার
শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিতরিতে সবে
মুছাইতে দুখ হাহাকার।

ঐশ্বর্য্য হেলায় ফেলি ভোগ সুখ আশ
উচ্চপদ অতি তুচ্ছ করি
মুছাতে পরের দুখ হে পিতা আমার
হাসিমুখে দুখ নেছ বরি।
পরের দাসত্ব পরে অবসর কালে
দেখিতেছি প্রৌঢ় বৃদ্ধ কত
তাস দাবা পাশা লয়ে রয়েছে মাতিয়া
অতি তুচ্ছ মোহ পাশে রত।
কেহ বা সম্পত্তি লয়ে ব্যস্ত অনুক্ষণ
কি করিলে হবে লাভবান
দেশের উন্নতি তরে হইয়া অধীর
কাঁদেনি ত তাহাদের প্রাণ।
বহু কালি গ্লানি ভরা হৃদয় মোদের
তবু ধন্য তোমারে যে পেয়ে
তোমার আদর্শ মোর নয়ন সমীপে
প্রতি শিরে তব রক্ত বহে।
জানিনা দেবতা আমি তোমা ছাড়া আর
তুমি পিতা ইষ্টদেব মোর
তোমাব ব্রতেতে দীক্ষা লইবার মত
দীনমনে নাহি তবু জোর।
তুমি শুধু বলে দাও কোন্ মন্ত্র পেয়ে
জীবে এত বাসিয়াছ ভালো
পরশমাণিকে কোন্ স্পর্শ করে তুমি
জ্বালিয়াছ বিশ্বপ্রেম আলো।
বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা হে উদাসী শিব
করিতেছ জনহিত কাজ
মোরা শুধু গৃহকোণে মোর বলি ধূলি
জড় করে পাই মনে লাজ।
মার মুখে শুনিয়াছি শিশুকাল হতে
পালিয়াছ দিয়া অতি স্নেহ
পুত্রের অধিক ভালোবেসেছিলে নাকি
মমতায় ভরা হৃদি গেহ
তাই আজ ভিক্ষা মাগি জুড়ি দুটি কর
নাহি চাহি তুচ্ছ অর্থধন

সবচেয়ে বড় যাহা অন্তর সম্পদ
তাঁরি কণা মোর প্রয়োজন।

১৯৩৮ সাল

ঈশ্বরে নির্ভরতা

ঈশ্বরে নির্ভরতা ও বিশ্বাস তাঁর অপরিসীম ছিল। যখনই আমাদের কারুর কঠিন দুঃসাধ্য রোগ হয়েছে বাবাকে তার মাথায় হাত দিয়ে গভীরভাবে ধ্যানস্থ হতে দেখেছি। তাঁর অন্তরের প্রার্থনায় কত অসম্ভব যে সম্ভব হতে দেখেছি, তার অনেক দৃষ্টান্তই আজ মনে পড়ে। বাবার প্রতি চিঠিতে থাকতো "প্রত্যহ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কিছুই হয় না তিনিই বিশ্ব জগতের নিয়ন্তা। সকলের উপর ভগবানে বিশ্বাস রাখিও।" তাঁর লেখা কোন চিঠি কোন দিন আমি নষ্ট করিনি—স্থানাভাবে সে সব দেয়া সম্ভব নয় নইলে প্রতি চিঠিতেই কত না উপদেশ কত না আদর্শ প্রতি লাইনে ভরা। ব্যক্তিগত সাংসারিক সুবিধে অসুবিধের কথা তাতে নাই বললেই চলে। এই সূত্রে আমার কন্যা উর্ম্মিলাকে লেখা বাবার একটি চিঠির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে দিলুম। "মেনোদিদি তোমার পত্র পেয়ে খুব খুসী হয়েছি আর তোমার কাছে আমার কাগজ (বিশ্বভারতীতে শ্রীনিকেতন সচিব থাকা কালীন বাবা অল্পশিক্ষিতদের জন্য একটি 'দেশে ও বিদেশে' নামে কাগজ বের করতেন) নিয়মিত যাচ্ছে ও তুমি পড়ছ জেনে আনন্দিত হয়েছি এই কাগজটির গোড়ার থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি নিজেই লিখি। সুতরাং এইটি তোমার কাছে আমার চিঠি। তুমি মধ্যে মধ্যে চিঠি দিলে আমি খুব খুশী হব। বাপী এসেছিল তাকে বলেছি বুলুম্ আমার কাছে থাকবে ও শান্তি নিকেতনে স্কুলে ভর্ত্তি হবে আর নাচ গান শিখবে। তাহলে বেশ ভাল হবে।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানবে। মন ভালো রাখবে প্রত্যহ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে। ইতি—"দাদু"

যাদের সত্যকার পুণ্যফল নেই, শুধু নিজের বেলায় ভগবানকে ডাকে তাদের প্রার্থনা যে কত মূল্যহীন বাবার কঠিন অসুখে আমার নিস্ফল প্রার্থনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এই সূত্রে অক্ষয়ের শ্বশুর মহাশয়, শ্রদ্ধেয় বিনয় বাবুর একটি কথা বারে বারে মনে পড়ে। যখন বাবার অসুখ কঠিন পথ ধরলো তখন বিনয়বাবু বলেছিলেন এসময় শুধু প্রিয়জনের প্রার্থনাই জীবন রক্ষা করতে পারে। আমার প্রার্থনায় যদি ফাঁকি না থাকিত তাহলে তা কখনো এভাবে ব্যর্থ হোতো না।

আর একদিন কয়েকজন আত্মীয়কে বাবার নিজগৃহ ত্যাগের বিষয় প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি একটু বিরক্ত হয়ে পড়েছিলুম। সত্যিই বাবার ঐ কঠিন

কষ্টকর রোগের মধ্যে জনে জনে নিজেদের ঐ দুর্ভাগ্যের কাহিনীর বর্ণনা দিতে হওয়ায় বাবার যে কত কষ্ট ও কত সেবা যত্নের ত্রুটি হয়েছে তা বলার নয়।

ঐ দিন তাই লক্ষ্য করে বিনয় বাবু বলেন "আমার বাবা মারা যাওয়ার সময় আমার দিদি আমাদের বলেছিলেন এ সময় খুব মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। নইলে আর বিপদ বলেছে কেন? বিনয় বাবু খুবই সংযত মানুষ। উপযাচক হয়ে কখনো কোন কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়। কিন্তু ঠিক সময়ের গুরুত্ববোধে তাঁর উপদেশ যে কত কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগিয়ে দিয়েছে তা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে থাকবে। এই উচ্চশিক্ষিত আড়ম্বরহীন কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন ভদ্রলোকটির প্রতি বাবার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। পিতার শিক্ষার গুণেই যে বীণার ঐ প্রকার উচ্চস্তরের কর্ত্তব্যজ্ঞান হয়েছে একথাও বাবা অনেককে বলেছেন। আমার পরম স্নেহাস্পদা ভ্রাতৃবধূ বীণার সেবার কথা আমার পক্ষে লিখে বোঝান সম্ভব নয়। যাঁরা বাবার অসুখে সর্ব্বদা যাতায়াত করেছেন তাঁরা শতমুখে এই কিশোরী বালিকার সেবাপরায়ণা অন্তঃকরণের প্রশংসা করেছেন। সে সেবা যে না দেখেছে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তার ঐ অপূর্ব্ব ঐকান্তিক সেবায় বাবাতো তৃপ্তি পেয়েছেনই আমরাও তা জীবনে কোনদিন ভুলবো না। অজ্ঞানের মধ্যে বাবা তাকে আর একটা পুষ্প বলে ডেকেছেন। এবং শেষ মুহূর্ত্তে তারই কোলের সামনে সব শেষ হয়ে যায়। বীণার ক্লান্তিহীন ঐকান্তিক সেবার কথা বহুবার বলেও যেন বাবার তৃপ্তি হত না। বিনয়বাবুও ঐ দীর্ঘ ছয়মাস প্রত্যহ দুইবেলা আসতেন। আমার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ সীমার পিতা শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও পিতৃদেবের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ও পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাবার অসুখের সময় ঐ অসুস্থ অক্ষম মানুষের পক্ষে মোটারে মিহিজাম যাওয়া ও কলকাতার বাসায় পরিচারকের স্কন্ধে ভর দিয়ে তেতলায় উঠা যে তাঁর পক্ষে কি কষ্টকর সে যে না দেখেছে সে বুঝবে না। আমাদের এই পরম ও চরম দুর্ভাগ্যের দিনে বাবার এই দুই বৈবাহিক শ্রদ্ধেয় বিনয় চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পূজনীয় ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়রা তাঁদের সত্যকারের আভিজাত্য পূর্ণ ব্যবহারে তাঁদের যে উচ্চবংশ ও মহৎমনের পরিচয় দিয়েছেন তাও চির স্মরণীয় হয়ে রইলো।

বাবা এই দুজন বৈবাহিকের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রশংসা বহুলোকের কাছেই করেছেন কিন্তু যে বৈবাহিক (দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায) এই গৃহত্যাগের পর গত দুই বৎসরের মধ্যে একদিনও তাঁহাকে দেখিতে আসেন নি তাঁর সম্বন্ধে কোন অনুযোগ তাঁর কাছে কখনো শুনিনি। শুধু একদিন আমার এক পিতৃবন্ধু বাবাকে দেবেন বাবুর কথা জিগেশ করায় বাবা বলেন "তাঁর ব্যবহার সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় তিনি নিজে তো আমার এত অসুখ শুনে একবার আসেনই নি আমি বসন্তকে দিয়ে ডেকে পাঠানয় বলেছেন যে পিতা পুত্রের মনোমালিন্যর মধ্যে

আমি যেতে চাই না” এর উত্তরে বাবার বন্ধুটি বলেন “তাঁর যদি পক্ষপাতিত্ব না থাকে তবে না আসার কারণ কি? তাহলে দেবেনবাবু জামায়ের সঙ্গে যাতায়াতও নিশ্চয়ই বন্ধ করেছেন। এবং ঘটনাটি যদি পিতা পুত্রেই হয় তাহলে হরিশ মুখার্জীর রোডে যে দুবৎসর তুমি ছিলে তখন দেবেনবাবু তাঁর কন্যা ও নাতি নাতনী আসেনি কেন?” এই সব অবাঞ্ছনীয় প্রসঙ্গে ব্যথিত হয়ে বাবা বলেন “ওসব কথা থাক।”

বাবার কর্ত্তব্যজ্ঞান অসাধারণ ছিল। একবার শ্বশুরবাড়ীতে আমার টাইফয়েড হয় তখন বাবা যশোরে পোষ্টেড। আমার সেবার জন্য ঐ অসুখে বাবা দুজন নার্স রেখে দেন। পরে বৌদির এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের সময়ও তিনি ইউরোপীয়ান নার্স দীর্ঘ দিন ধরে বৌদির জন্য রেখেছিলেন। আমার অসুখ বাবার চাকরীর মধ্যে ও বৌদির অসুখ তাঁর পেনসনের পরে হয়। ঐ সময় পিতৃদেবের আর্থিক অনটন যথেষ্টই ছিল কিন্তু সেজন্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা স্নেহের অনটন তাঁর অন্তরে কোনদিন হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে পড়ে বৌদির ঐ অপারেশনের কয়েক দিন পরে বোধ হয় আই, এন, এ, দিবসে গোলাগুলি ছোঁড়ার দরুণ ট্রামবাস বন্ধ ছিল। রাস্তায় যাতায়াত বিপদজনক বোধে সেদিন বৌদিকে দেখতে বৌদির বাপ ভাই বা কেউ যাননি। দাদা খতুও যেতে চায় না। তাছাড়া তখন অপারেশান অনেকদিন হয়ে গেছে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই বলে ডাক্তাররা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও যেই বাবা শুনলেন বৌদিকে দেখতে দাদা বা খতুও যায় নি তখন ৬০ বৎসর বয়সে হেঁটে ভবানীপুর থেকে মেডিকেল কলেজে গিয়ে বৌদিকে দেখে এলেন।

ঐ বয়সে অত পরিশ্রম ক্ষতিকর বলে আমাদের গৃহচিকিৎসক ডাঃ ভৌমিক অনুযোগ করায় বাবা বলেন আমার আবার এ বয়সে জীবনের দাম কি? পুষ্প মেডিকেল কলেজে ওভাবে থাকলে কি আমি না গিয়ে থাকতে পারতুম? এই রকম কত ঘটনায় যে তাঁর কত অপরিমেয় স্নেহ ও অদ্ভুত কর্ত্তব্যজ্ঞান ও মমতার পরিচয় আমরা পেয়েছি তা মনে করলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।

পিতৃভক্তি ও স্বদেশপ্রেম

বাবার পিতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। সেবার নৈহাটিতে বাবার কলেরা হয়। তখন মেথরদের বস্তিতে কলেরা হচ্ছিল। ঐ সব বস্তিতে নিজে গিয়ে দেখা-শোনা ও তত্ত্বাবধান করার ফলে বাবা কলেরায় আক্রান্ত হন। আমার ঠাকুরদার চটিজুতা যা তাঁর সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ছিল, সেদুটি ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা সঙ্গে নিয়ে যান। একটি ছোট সোকেশে সে দুটি বরাবর বাবার টেবিলে থাকতো। এবং ফুল পেলেই নিজে হাতে তা দিয়ে ঐ দুটিকে সাজাতেন।

কলেরার সময় গিয়ে দেখি ঘরের কোণে বাবার বিছানার মাথার দিকে ঠাকুরদার ঐ চটি জোড়াটি পড়ে রয়েছে। ঐ সময় অনেক নিঃসহায় দরিদ্র ছেলে বাবার নৈহাটির বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা বা চাকরী করতো। তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলুম জুতোটি তারা বাবার বিছানার মধ্যে পায় এবং বিছনা পরিবর্ত্তনের সময় কোণে রেখে দেয়। টেবিলের ওপরের সো কেশ থেকে কি করে ওটি নামান হ'ল তা কেউ জানে না। পরে শুনেছিলুম মৃত্যু আসন্ন ভেবে বাবা ঠাকুরদার ঐ জুতা জোড়াটি আপন শিয়রে রেখেছিলেন।

এই কলেরার সূত্রে আমার পরম স্নেহময় পিতৃবন্ধু ডাঃ হেমেন্দ্র নাথ বকসী মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। ঐবার বাবার বাঁচার কোনরকম আশাই ছিল না। অসুখের প্রায় শেষ অবস্থায় আমরা খবর পাই এবং কলকাতা থেকে কোন ডাক্তার যেতে রাজী হন না। বাবাই অজ্ঞান অবস্থায় ডাঃ বকসী মহাশয়ের নাম করেন। ডাঃ বকসী কলেরার বিশেষজ্ঞ। অনেকদিন ধরে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে অধ্যক্ষ ছিলেন। বাবার অসুখের খবর পেয়ে বকসীকাকা নৈহাটী যান এবং তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ও অদ্ভূত চিকিৎসা নৈপুণ্যে বাবার জীবন রক্ষা হয়। ঐ আচার পরায়ণ নিষ্ঠাবান মানুষটি ঐ সময় বাবার জন্য অবিশ্রান্ত নৈহাটীযাতায়াতের ফলে কত কষ্ট যে সে সময় পেয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

আমার একটি গুরু অপরাধ ও অপূরণীয় ক্রটির কথাও এই সঙ্গে মনে পড়ে। এবাব বাবার মিহিজামে প্রথম অসুখের খবর যদি বকসী কাকাকে দিতুম তাহলে হয়তো এ বিপদ হোতো না। শুভার্থি হিতৈষী বন্ধুর ঐকান্তিক চেষ্টায় যে মূল্যবান প্রাণ রক্ষা হয়েছিল আমার দুর্ভাগ্যে তা হারালুম।

এবার অসুখে খবর পাওয়ার পর থেকেও প্রায় প্রতিদিন সেই বউবাজার থেকে বকসী কাকা বাবাকে দেখতে আসতেন। ঐ সময় তাঁকে যেরকম কাতর ও চিন্তিত হতে দেখেছি সহোদর ভায়ের জন্য ভাইকেও অত অধীর হতে বোধ হয় দেখা যায় না।

এই সূত্রে বকসী কাকার জ্যেষ্ঠ জামাতা স্নেহাস্পদ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দের কথাও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঐ তরুণ চিকিৎসক যে বাবার অসুখে কি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে তা বলে শেষ হবার নয়। ভূপেনের প্রসঙ্গে বাবা বলেছেন "ভূপেনের ঋণ তোরা কি করে শোধ কর্ব্বি ? সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর রোজ রাত ১২টার সময় বাড়ী ফেরার পথে ঐ ছেলেটি বাবাকে দেখতে আসতো। এমনও বহুদিন গেছে যে রাত ২টো ২॥ টায় আবার তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি ও অবিলম্বে তার সাহায্য পেয়েছি। এ রকম সাহায্য বিপদের দিনে যে কত দুর্লভ তা অনেকেই জানেন।

ঐ কলেরা সারার পর বকসী কাকা বাবাকে ঠাট্টা করে বলেন "এবারতো

সেরে উঠলি তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে দেখছি"। এই অসুখের মধ্যে বাবা বকসী কাকাকে সে কথা মনে করিয়ে দেন।

এই জৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে মেদিনীপুরের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার সংগ্রাম নামে যে প্রবন্ধ বার হয়েছে ঐ দলের মধ্যে বাবাও ছিলেন। ঘটনাটি আমার কাকার বন্ধু বিখ্যাত ডেন্টিষ্ট কেনারাম ভট্টাচার্য্য মশায়ের কাছে শোনা! এঁর দাদা শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বাবা, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্র নাথ বসু, ক্ষুদিরাম বাবু সব এক দলের লোক ছিলেন।

১৯০২ সালে ঐ সমিতিটি তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমিতির ভিতরই একটি কুস্তির আখড়ায় সকলকে নানাবিধ কসরৎ শেখান হত। তাঁদের বিপ্লবী কেন্দ্রের আর একটি বিভাগের ছদ্মনাম ছিল তাঁতশালা।" সেখানে তাঁত বোনার ভাণ হত। আমার স্বামীর কাছে বাবা গল্প করেছেন প্রদীপের শিখায় আঙ্গুল পুড়িয়ে তাঁদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিতে হত। এবং গভীর জঙ্গলে রিভলভার ছোঁড়ার শিক্ষাও চলতো। বাবার মনের অনেক আমাদের অগম্য জায়গায় আমার স্বামীর ছিল অবাধ গতি। ঐ মানুষটি শুধু বাবার একান্ত প্রিয়তম পুত্রই ছিলেন না, অন্তরতম বন্ধুও। ওঁর পক্ষপাত শূন্য মনের বিচারের ওপর বাবার ছিল অসম্ভব নির্ভর। শ্বশুর জামাতার মধ্যে এমন অনেক কথাই হত যেখানে আমারও প্রবেশ ছিল না।

বাবার শ্রীনিকেতনের ডায়রীর মধ্যে ঐ ঘটনার উল্লেখ পাই এক জায়গায় বাবা লিখেছেন—

"সেই সময় বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্লাবন এসেছিল। আমরা সেই যুগের তরুণবৃন্দ বন্দেমাতরম ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করেছিলুম আরো অনেক অকার্য্য করেছিলুম। কিন্তু তখনকার পুলিশ যথেষ্ট জাগ্রত ও অবহিত না থাকায় আমাদের বাধা দেয়নি।"

তার পরে শুধু পিতামহর আদেশেই তিনি ঐ পথ ত্যাগ করেছিলেন এবং প্রচুর স্বাধীনচেতা ও স্বদেশভক্ত হয়েও পিতৃ আদেশে বিনা দ্বিধায় এই সরকারি চাকরী গ্রহণ করেন। জীবনের প্রারম্ভে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও তাঁকে পিতার আদেশে সরকারি চাকুরী গ্রহণ কর্ত্তে হয় সত্য, কিন্তু ঐ চাকরীর প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। ঐ চাকরীর মধ্যে থেকেও যতটা পারেন দেশের কাজই করেছেন। এবং ঠাকুরদার মৃত্যুর পরই ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন পদত্যাগে বোঝা যায় ঐ সরকারি চাকরী করার আগাগোড়াই ছিল তাঁর পিতার তৃপ্তি সাধন। নইলে যখন ডিপুটি চাকরীর কষ্টকর অধ্যায় শেষ হয়ে সবে উচ্চ পদ ও মোটা মাইনের গদীতে আরোহণ করেছেন তখন কি কেউ চাকরী ছাড়তে পারে?

মনে পড়ে তাঁর রায় বাহাদুর পদবীর সম্বন্ধে একবার আমি তাঁকে

বলেছিলুম আপনার ও টাইটলটা আমার মোটে ভাল লাগছে না। বেশ মনে আছে দমদমের বাড়ীর দোতলার বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। বাবা একটু হেঁসে উত্তর দিয়েছিলেন শুধু তোমার আমার ভালো লাগার কথা ভাবলে চলবে কেন? বাবার যে বড় ইচ্ছে আমি রায়বাহাদুর হই।

এই প্রসঙ্গে গত আষাঢ়ের প্রবাসীতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত কেদার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "সত্যকার স্বদেশপ্রীতি থাকলে ইংরেজ আমলের শেষের দিকে সরকারী কর্ম্মচারীরা কখনো কখনো কিরূপ দেশের কাজ সুষ্ঠু ভাবে করে যেতে পারেন সুকুমার বাবু ছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

বাবার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাঁকুড়ায় আমার ঠাকুরদার প্রতিষ্ঠিত গঙ্গা নারায়ণ চতুষ্পাঠীর টোলের ছাত্রদের ও কুষ্ঠাশ্রমের রুগী খাওয়ানর জন্য আমার ছোট ভাই শ্রীমান সুধীর বাঁকুড়ায় যায়। ঐ সময় শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ ঘোষ মশায়ের কাছে সে বাবার পিতৃভক্তির একটি কাহিনী শোনে। শেষবার বাঁকুড়া গিয়ে বাবা একজনকে ৫০টি টাকা দেন যে ঐ টাকায় যতগুলি হয় পেয়ারা গাছ যেন তিনি পুঁতে দেন। তাঁকে বাবা বলেছিলেন যে আমার বাবা (পিতামহদেব) শৈশবে অতি দরিদ্র ছিলেন। একবেলা প্রতিবেশী গৃহে যদি বা দুটি অন্ন জুটতো অপর বেলা ক্ষিধে মেটাতে গাছের পেয়ারাই ছিল সম্বল। পিতার শৈশবের দুঃখের কাহিনী তাঁর কোমল প্রাণে এমন গভীর ভাবে দাগ দিয়েছিল যে এই ৬০ বছর বয়েসেও তারি প্রতিকারের কথা তিনি ভেবে গেছেন।

বাবা পিতাকে যে কি পরিমাণে ভালোবাসতেন তা লেখা অসম্ভব। দীক্ষা নেয়ার কথা উঠলে বাবা বলেছিলেন পিতা বর্ত্তমানে তাঁর চেয়ে বড় গুরু সন্তানের আর কেউ হতে পারেনা।

পরে হরিদ্বার গুরুকুল ঋষিকুলের প্রেসিডেন্ট পরমহংস সচ্চিদানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নেন। ঐ মহাপুরুষ এখন দেহ রেখেছেন। ৺সন্তোষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (একদালিয়া রোড) প্রসিদ্ধ এ্যাটর্নী ভূবনেশ্বর শ্রীমানি প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ধনী সম্ভ্রান্ত শিষ্য তাঁর ছিল। একবার বাবার বিষয় গুরুদেব তাঁর এক ব্যারিষ্টার শিষ্যর কাছে বলেন "ওতো আদত হীরে আছে"। এবং গৌড়ীয় মঠের পূজনীয় ভারতী মহারাজ বাবার সম্বন্ধে বলেছিলেন উনি আমায় প্রণাম করলেন কি? উনিই তো মহাপুরুষ ওঁরই পায়ের ধূলো সবায়ের নেওয়া উচিৎ!

বাবার জীবনে ঠাকুরদার ইচ্ছের চেয়ে বড় আর কিছু ছিল না। আজো তাঁর কাগজ পত্রের মধ্যে ঠাকুরদার লেখা কত ছোট ছোট কাগজও যে কি যত্নে রক্ষিত আছে দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। প্রথম চাকরী জীবনে ঠাকুরদার

আদেশে বাবাকে প্রতিটি মকর্দ্দমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ঠাকুরদাকে জানাতে হত। আজো সেসব কাগজ বাবার চিঠি পত্রের মধ্যে রয়েছে।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা

কমিশনার গ্রেহাম সাহেব বাবার বিষয় উল্লেখ করে বলেছিলেন "গোপাল গঞ্জে এই ওয়াণ্ডার ফুল লোকটিকে দেখেছিলুম ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। আমার পিতৃব্য পূজনীয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েব কাছে রায়বাহাদুর নিবারণ চন্দ্র ঘোষ (রিটায়ার্ড এজেণ্ট ই, আই, আর) মশাই গল্প করেছেন যে বাঁকুড়ায় গভর্ণর লর্ড লিটন যখন যান তিনি বাবার কাজ দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর মুখে সুকুমার চ্যাটার্জ্জী ছাড়া কথা ছিল না। ঐ কারণে কয়েকজন ইউরোপীয়ান আই, সি, এস, অফিসার বাবার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। ঐ সময় বাবা সাঁওতালি পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। লর্ড লিটন সাঁওতালদের জন্য একটি বক্তৃতা ইংরাজিতে লিখে দেন ও বাবা সাঁওতালিতে তার অনুবাদ করে তাদের বুঝিয়ে দেন।

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত আলুর কাছে শোনা আর একটি গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বাবা যখন সিউড়ী থেকে বদলী হয়ে যান তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাবার দেশের কাজের খবরে এত তৃপ্ত হয়েছিলেন যে সে সময় শান্তি নিকেতনে লর্ড লিটন যাওয়ায় তাঁকে বাবার কথা বলে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে লোক দেশের ভালো কাজ কর্ব্বে তাকেই বুঝি সরিয়ে দেওয়া তোমাদের নিয়ম? তাতে লর্ড লিটনও বাবার বাঁকড়োর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সব বিষয়েই তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এই প্রসঙ্গে পিতৃবন্ধু শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর অতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে দিলুম। বাবার অসুখের সময় ইনি বারে বারে বাবাকে দেখতে আসেন এবং বাবার মৃত্যুর পরও আমার পরম দুঃখের দিনে এসেছিলেন সান্ত্বনা দিতে। একথা তাঁরই মুখে শেষ দিনে শুনেছিলুম। "যদিও তোমার বাবা ও আমি বাঙ্গালায় ও বেহারে ছিলুম তবুও আমাদের আলাপ বরাবর বজায় ছিল। সুকুমারের লেখার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কোথাও কোন মিটিংএ কিছু বলতে হলেই আমরা সুকুমারকে বলতুম তুমি তো বাপু সব বিষয়ে এক্সপার্ট হয়ে বসে আছ কি বলতে হবে লিখে-টিকে দাও। ও বরাবর হাসিমুখে আমাদের সব আবদার মিটিয়েছে। এই তো রিটায়ার করার পরও আমার সঙ্গে দেখা। ছেলে-বৌএর দুর্ব্যাবহারে নিজের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ী ছেড়ে আসার কথাও সে নিজে মুখেই আমায় বলেছিল। সুশীলের মত শিক্ষিত ছেলের ব্যবহার শুনে আশ্চর্য্য হয়েছিলুম নেহাৎই সুকুমারের মুখে শোনা নইলে

বিশ্বাস করতে পারতুম না। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিনয় চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মশায়ের কাছে বাবা দুঃখ করেছেন যে বৌমার ব্যবহার এত রুক্ষ ও স্নেহশূন্য যে মাঝে মঝে আমার মত উদাসীন লোকের পক্ষেও কষ্টদায়ক মনে হয়।

সাঁতার ও স্কীপিং

বাবা সাঁতার দিতে পারতেন অতি চমৎকার। আজো মনে পড়ে গোপালপুর অন সীতে ব্যাক ওয়াটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিৎ সাঁতার কাটা। দেখলে ঠিক মনে হত ঘুমুচ্ছেন হাত পা এলিয়ে। সেই সুন্দর সুঠাম বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি দেহ দেখলে অনন্ত শয্যায় নারায়ণের কথা মনে পড়ে যেতো।

স্কিপিং করতে ৬০বৎসর বয়েস অবধি তাঁকে দেখেছি। আমার শিশুকন্যা তপু সেদিনও তাঁর কাছে স্কিপিং করতে শিখেছে। মনে পড়ে তাঁকে ঠকানর জন্য আমার মেজমেয়ে বুলু বলে হ্যাঁ দাদু আপনি কাপড় কুঁচুতে জানেন? তাঁর ধারণা সাদাসিধে মানুষ দাদু বাবুয়ানীর কায়দা জানবে কি করে? বাবা ছুরি দিয়ে কাপড় কুঁচিয়ে বুলুকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমার ঠাকুমার কন্যাহীন প্রথম জীবনে সংসারের অনেক কাজেই বাবা ঠাকুমাকে সাহায্য করতেন। ফলে সুপুরী মিহি করে কাটা থেকে আরম্ভ করে সুজীর রুটি বেলা, জরী রেশমের সুতো নিয়ে ভেলভেটে ফুল তোলা অবধি কোন কাজই তাঁর অজানা ছিল না।

অপরিসীম দয়াধর্ম্ম

ঠাকুর চাকর দাসদাসী ড্রাইভার চাপরাশী এদের প্রতি ছিল তাঁর অদ্ভুত স্নেহ। নিজ সন্তান আর বেতন ভুক ভৃত্যে তাঁর কাছে পার্থক্য ছিল না। ঐ সম্বন্ধে কেউ অনুযোগ করলে বলতেন এ তোমাদের ভারি অন্যায়। সামান্য কটি টাকা দিয়ে কি আমরা ওদের কিনে রেখেছি। শীতের দিনে ভোর-বেলা উঠে ঝি চাকরদের কাজ করায় তিনি বড় কষ্ট বোধ করতেন। একবার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে শীতের ভোরে এক ঠাকুরকে চান কর্ত্তে দেখে বলেন সর্ব্বনাশ চাকরী করতে এসেছ বলে তুমি নিমোনিয়া হয়ে মরবে নাকি? তার চেয়ে পালাও।

আর একবার আমি বাবার কাছে থাকার সময় একটি বুড়ী ঝিকে রান্নাঘরে ধোঁয়ার মধ্যে বসে উনুনে হাওয়া কর্ত্তে দেখে বলেন বেরিয়ে এস দমবন্ধ হয়ে মানুষটা মরবে নাকি? তারপর আমায় বলেন না হয় একটু দেরীই হবে আমাদের চা খেতে তা বলে তোমার একি ব্যবস্থা? অথচ নিজে শীতের ভোরে উঠে ষ্টোভ জেলে চা তৈরী করে চাকর ঠাকুর চাপরাশী সকলকে নিজে হাতে দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল যে চা খেয়ে শরীর গরম হলে শীতের ভোরে কাজ করার কষ্ট তাদের তত কঠিন মনে হবে না।

সেবার দাঙ্গার সময় তাঁর চাকর দরবারির কলেরা হয়। সেই রাত্রে ব্লাক আউটের মধ্যে মাঝরাতে নিজে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনেন। শেষে সবায়েরই ইচ্ছায় প্রায় বাবার অমতেই দরবারীকে গোরাচাঁদ হাসপাতালে পাঠান হয়। ঐ সময় বাবা নিজে প্রত্যহ সেই বিপদজনক মুসলমান এলাকার মধ্যে দিয়ে গোরাচাঁদ হাসপাতালে তাঁকে দেখে আসতেন। ঝি চাকরকে বকলে বাবা বড কষ্ট পেতেন। মৃত্যুর বোধ হয় তিনদিন আগেও আমায় এক দাসীকে বকতে শুনে বাবা বড় বিচলিত হয়েছিলেন।

শ্রদ্ধেয় বিনোদ বিহারী সরকার মহাশয়ের কাছে শুনেছি কোন দুর জায়গায় বিনোদ বাবু বাবার কাছে গেলেই দু একটি কথা বলার পরই বাবা ব্যাস্ত হয়ে উঠে যেতেন এবং নিজে দাঁড়িযে চাপরাশি ড্রাইভার ও চাকরদের খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে ফিরতেন।

আমার মায়ের অসুস্থতার জন্য আমার বাবা অধিকাংশ সময় একাই থাকতেন কিন্তু তাঁর ঘরে অতিথি অভ্যাগতের প্রচুর সমাগম থাকতো। হয়তো সে আতিথ্যে বাহুল্য থাকতো না কিন্তু অতিথির আরাম ও স্বাচ্ছন্দের অভাব থাকতো না।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ে বাবা তখন নওগাঁয় এ্যাশিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার। আমার দুটি শিশুকন্যাকে নিয়ে আমি বাবার কাছে একা ছিলুম। ঐ সময় একটি বুড়ী ঝি তার মাতৃহীনা নাতনীটিকে নিয়ে কাজ করতো। একদিন ঐ শিশুটিকে দালানে শুইয়ে রেখে সে কাজ কর্ত্তে গেছে এমন সময় শিশুটি কাঁদায় বাবা তাকে নিজে হাতে আমার মেয়েদের দোলনায় তুলে দেন। বোধ হয় আমার মুখে বিস্ময় বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখে থাকবেন তাই বলেন "দোলা খালি রয়েছে অথচ ছেলেটা মাটিতে পড়ে কাঁদছে কি আশ্চর্য্য ?" আমি ঐ শিশুটির গায়ে ঘায়ের কথা উল্লেখ করায় বাবা বলেন তার উপায় ওষুধের ব্যাবস্থা করা দোলায় না শোয়ান নয়।

স্বাবলম্বন।

স্বাবলম্বন জিনিষটি যে তাঁর কি পরিমাণে ছিল তা যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। তাঁর খাওয়া চায়ের বাসন এমন কি ভাত খাওয়ার পর সে থালাও অনেক সময়ই তিনি নিজে ধুয়ে রাখতেন। আমার বেশ মনে আছে সেবার নৈহাটিতে যাবার পর বাবা আমায় বলেন দেখ্ আমি ব্যাবস্থা করেছি যে যার নিজের বাসন ধোবে ও কাপড় কাচবে এতে ঝি চাকরদের কাজ অনেক হালকা হয় তা ছাড়া নিজেরও স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা হয়। নিজের অপরিষ্কার করা জিনিষ নিজেরাই পরিষ্কার করতে পারা উচিৎ। তা ছাড়া এঁটো বাসন বা ছাড়া কাপড় তক্ষুনি ধুলে এমন কিছুই পরিশ্রম নয় কিন্তু সেই

বাসনই শুধু ধুতে যে অপরের কষ্ট কত বেশী হয় একথা সকলের বোঝা উচিৎ। ঝি চাকর রেখেছি বলেই তাদের অযথা কষ্ট দেবার বা পরিশ্রম অপব্যাবহার করাবার দরকার কি? ভাটপাড়ায় থাকতে বাবা সকাল টার মধ্যে চা খেয়ে ইনস্পেকশানে বেরিয়ে যেতেন। একমাত্র বাবা ছাড়া খাওয়ার বাসন তো দূরের কথা চায়ের কাপ প্লেটও কেউ ধুয়ে রাখতো না। বাবার ব্যাবস্থা মত কাজ বাবা একাই করতেন। ঐ সময় ভাটপাড়ার বাড়ীটি প্রায় অতিথিশালার মত হয়ে দাড়িয়েছিল। প্রায় ১৮।১৯টি দুস্থ ছেলেই ছিল। চা তৈরী করে তাদের ডেকে ওঠাতে চা যেত ঠাণ্ডা হয়ে মনে আছে এ বিষয় চাকর অনুযোগ জানানয় বাবা একটী কাঁসর কিনে এনে দিছলেন। চায়ের জলে পাতা দিয়ে ঠাকুর জোরে কাঁসর বাজাবে বলে। তাহলে ছেলেরা চা খেতে তেতলা থেকে নামবে বলে।

বাবার আহারের ঠাঁই করা স্নানের আয়োজন করা বা তাঁর জামা কাপড় গুছিয়ে রাখা এসব কাজ কখনো তাঁর কন্যা বা পুত্রবধুদের কর্ত্তে হয়নি। তাঁর আহারের জন্য না খেয়ে অপেক্ষা করাতো দূরের কথা আহারের সময় ও পুত্রবধুদের কারুকে সেখানে না থাকলে তাঁকে অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি ৬০ বৎসর বয়স অবধি স্নান করে স্নানের ঘর ধুয়ে দিতেন। অপরের বাড়ীতে পাইখানা গেলে নিজের ব্যাবহারের পর সে পাইখানা ধুয়ে দিতেন। এতে বোঝা যায় যাতে তাঁর জন্য অন্য কারুকে বিন্দুমাত্র কষ্ট না পেতে হয় সে সম্বন্ধে তিনি কতদূর সচেতন ছিলেন। এমন কি কমোড ব্যাবহারের সময় তাতে কাগজ পেতে ব্যাবহার করতেন যাতে মেথরের পরিষ্কার করতে কষ্ট না হয়। কিন্তু এই দেব দুর্লভ মনের মূল্য এ জগতে বোঝে কয়জন? এই কারণেই বালিগঞ্জ প্লেসের একতলার ছোট ঘরে পড়ে থাকা, নিজের কাজ নিজে করা, ও ঝি চাকর পুত্র বা পুত্রবধুর কাছে নিজের কতৃত্ব জাহির না করার ফলে তিনি যে গৃহকর্ত্তা একথা সবাই ভুলে গিছলো। এবং নিজে বর্ত্তমানে নিজের বাড়ীকে সুশীলের বাড়ী বলে উল্লেখ করায় পাড়ার বহু ভদ্রলোক ও কে যে গৃহকর্ত্তা তা জানতেন না। এই সূত্রে বালিগঞ্জ প্লেসের আর একটি বিসদৃশ ঘটনা মনে পড়ে। বালিগঞ্জ প্লেসে থাকার সময় বাবার রেশান কার্ডে কার্ড হোল্ডার সুকুমার চট্টোপাধ্যায় হেড অবদি ফ্যামিলী সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখাছিল। এবং আমার মায়ের কার্ডে স্বামী জীবিত থাকতেও স্বামী সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং হেড অব দি ফ্যামিলি সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখাছিল।

চিরকালই বাবার নিজস্ব পৃথক লোক ছিল—সে বাড়ী শুদ্ধ লোকের কাজ করে বেড়াত বাবার কাজ করতেন বাবা নিজে। দাস দাসীর প্রাচুর্য্য না থাকলে বাবার চলতো না। ভাটপাড়ায় দেখেছি দীনেশ বলে বাবার একটি

চাকর বসে বসে ঠোঙা তৈরী করে বিক্রি করতো। তারই আগ্রহে সব রকমের কাগজ বাবা নিতেন বলা বাহুল্য কাগজের দাম বাবা দিতেন, ঠোঙা বিক্রির অর্থ দীনেশের ছিল। অন্য কোন কাজের অবসর তো দীনেশের হতই না মাঝে মাঝে বাবার দরকারি কাগজ টেনে নিয়েও সে তার ঠোঙার সংখ্যা বাড়াত। তা জেনেও বাবা তাকে কিছু বলতেন না। একবার আমার মেজ মেয়ে বুলুকে বলেছিলেন "দুপুর বেলা ঐ বাজে বই না পড়ে ঠোঙা করলেও তো দীনেশ বেচারার উপকার হয়। কত দুঃখে মানুষ বাপ মা ছেড়ে নিরাশ্রয় হয়ে বিদেশে চাকরীর আশায় আসে।"

পরেশ বলে একটি চাকর তার বিধবা মায়ের ইচ্ছার দোহাই দিয়ে কত রকম সুবিধে ও টাকা যে নিত তা আমাদের মধ্যে সর্ব্বজন বিদিত ছিল। শ্রীনিকেতনে ইন্দ্রনাথ বলে একটি চাকর বসে বসে মাদুর বুনতো। (ঐ ইন্দ্রনাথের বোনা মাদুরের প্রশংসা মহাত্মাজী নিজে করেছিলেন) অনেক সময় বিশেষ প্রয়োজনেও দেখেছি বয়নরত ইন্দ্রনাথকে না ডেকে বাবা নিজেই তা করে নিয়েছেন।

একবার রামসেবক নামে একটি বালক ভৃত্য আমার কাছে ডাঃ শ্যামাদাস রোতে কাজে লাগে। বাবা তো তাকে দেখে মহাখুসী—বললেন, 'ছেলেমানুষ ও তো বেশী কাজ করতে পারবে না, তার চেয়ে ও পড়ুক।' তখুনি তার জন্য বই খাতা শ্লেট এল। তারপর দেখি সে সব সময় পড়ে আর বাকি সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমোয়। বাধ্য হয়ে যতদূর সম্ভব কাজ নিজেই করে নিচ্ছিলুম কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। তাকে অনবরত পড়া বলে দিতে হবে। শেষে বিপদ বাধলো হিন্দি বই নিয়ে। আমি হিন্দি জানিনা একথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। মাঈজী হরবখত বই পড়ে অথচ তাকে পড়ায় না এ অভিমানে সে নিজে চাকরী ছেড়ে আমায় বাঁচালো।

পরদিন দেখি বাবা আবার তাকে নিয়ে হাজির করেছেন। বাবার কাছে সে নালিশ করেছে যে পড়ায় 'ইয়াদ নেহি রহতা' এই দোষে আমি নাকি তাকে পড়াই না। এরপর বাবা ব্যবস্থা করলেন মোড়ের হিন্দুস্থানী খবরের কাগজওলা বাবার কাছ থেকে ২৲ মাইনে নিয়ে রোজ রামসেবককে পড়াবে। আমি শুধু মাইনে আর খাওয়া দিয়েই ছুটি পাব। আমিও রাগ করে বল্লুম, 'বেশতো, রামসেবকের পড়ার ব্যবস্থা না হয় হোলো কিন্তু আমার কাজ করবে কে?' তাতে বাবা ব্যবস্থা করলেন যে তাঁর চাকর রোজ হরিশ মুখার্জীর রোড থেকে এসে আমার কাজ করে দেবে অর্থাৎ বাবার কাজ বাবা নিজে কর্বেন। নিজের যথেষ্ট অসুবিধে করেও তিনি অপরের সুবিধে ও ইচ্ছের জন্যে এতদূর ব্যস্ত হতেন। আর একবার বাবার কাছে একটি বুড়ো বিপত্নীক চাকর তার তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কাজ করতো, সম্ভবতঃ নওগাঁয়। একেই অথর্ব্ব বুড়ো

মানুষ কাজের চেয়ে বকবক করতো অনেক বেশী। তার ওপর চারটি প্রাণীকে তিনবেলা খেতে দোয়া। এই বিষয় আমি অনুযোগ করায় বলেন, 'ওদের ওপর আবার খরচ কি? ওরাতো পাতের খেয়েই মানুষ হয়ে যাবে।' তখন বাবার কাছে শুধু আমি আমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকন্যা দুটিকে নিয়ে ছিলুম। আমার ও বাবার দুজন মানুষের পাতের খেয়ে যে কী করে চারজন মানুষের চলবে সে হিসেব বাবাই জানেন।

নিষ্কামকর্ম্ম

বাবার ডায়েরীতে ঋষি কবি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বাণী উদ্ধৃত দেখি, প্রফুল্ল সংসারে আসিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল, তাহার কোন কামনা ছিল না, সে শুধু কাজ খুঁজিত।' কামনা অর্থে নিজের সুখ খোঁজা কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। বাবা এই রকম কাজে ব্রতী ছিলেন। এজন্যে আমরা তাঁর যে কাজে মিথ্যে পরিশ্রম মনে করতুম বাবা তাতে যথার্থ আনন্দ পেতেন। নিজ স্বার্থবদ্ধ নয়নে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল না। কাজেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক ছিল।

এইরূপ কাজের সম্বন্ধে একটি গল্প শ্রদ্ধেয় বিনোদবাবুর নিকট শুনি—'গরুর গাড়ী করে অনেক দূর গ্রামে গেছি সুকুমার বাবুর সঙ্গে—সেখানের স্কুলের কম্পাউণ্ডে ফুলের গাছ নেই দেখে তিনি তো হৈ চৈ আরম্ভ করে দিলেন। "কবে থেকে বলে গেছি এখানে গোটাকতক ফুলের গাছ লাগাতে, এরা কিছুতেই লাগাবে না।" তক্ষুনি লোক পাঠান হোল কাঞ্চন ফুলের চারা আনিয়ে সেখানে বসানো হোল। চড়চড়ে রোদ উঠলো ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, কতক্ষণে ফিরবো এতখানি পথ? সুকুমার বাবুর সঙ্গে এসে আচ্ছা বিপদে পড়া গেল যা হোক্। যা মনে করবেন তক্ষুণি তা চাই নইলে শান্তি নেই। অনেকদিন বাদে আবার গেছি সেই গ্রামে, ফুলে ফুলে সেই কাঞ্চন গাছটি অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। আমার মনে পড়ে গেল সেই রোদে অতদূর পথ যাবার পর সেবার সেই সুকুমার বাবুর উদ্যোগেই এই বহুকাল ধরে সৌন্দর্য্য ভরা গাছটির জন্মকাহিনী।'

কোথাউ গ্রামে গ্রামে টক কুলের গাছে চোখ কলম বসিয়ে শিশুদের সুলভ আহার্য্য ও আনন্দের খোরাক জুগিয়েছেন। কোথাউ অস্পৃশ্য মেথরদের সুলভে সুন্দর নূতন কোয়ার্টার্স করিয়ে দিয়েছেন। কোথাউ শরের কাঠির মোড়া, কোথাউ তালপাতার পাখা করে করেছেন কুটির শিল্পের প্রচারে কত দুঃস্থের অন্নসংস্থান। আঁকড় গাছ যা ছিল শুধু গরীবের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করবার কাজেই তা থেকেই তাঁরই পরিকল্পনায় হ'ল সুন্দর লাঠি যা ধনীর ঘরে আদর করে তুলে নিল এবং পরিবর্ত্তে দুঃস্থ দুঃখী লোক পারিশ্রমিকে করলো

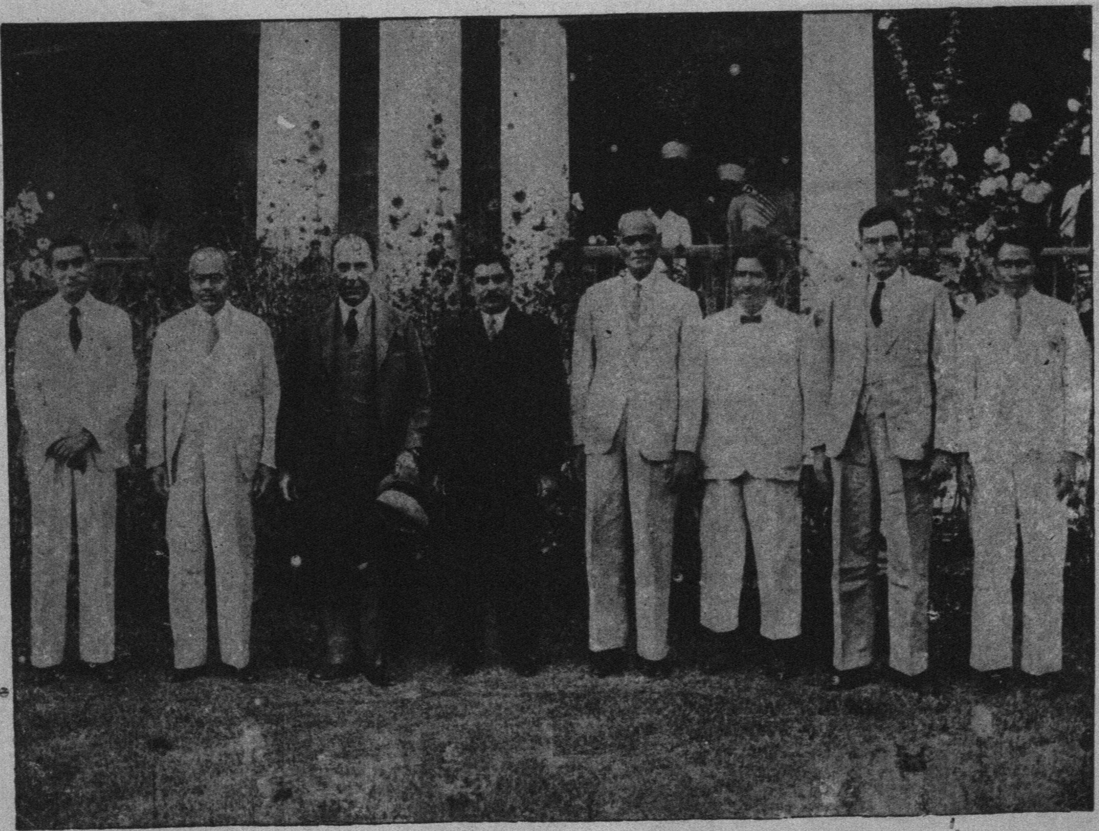
তার ভরণপোষণ। এমনি ক'রে তাঁর কত সৃষ্টি যে কত জায়গায় অমর হয়ে আছে তা কেউ জানেও না। ঐ পরিশ্রমে এবং ঐ জ্ঞানের ও উদ্ভাবনী শক্তির বিনিময়ে তিনি পেতে পার্ত্তেন আরো অনেক উচ্চপদ বা উপাধি। করতে পার্ত্তেন নিজের বা নিজের সন্তানদের জন্যে অনেক কিছুই। তিনি তা চান নি। চেয়েছিলেন সকলের জন্য দেশের জন্য দুঃস্থের জন্য। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তিনি ভেবে গেছেন তাদেরই জন্য। অজ্ঞানের মধ্যেও তাঁর ধ্যান চিন্তা ছিল দেশের হিত। একবার আমার বড় জামাইদের জমিদারীর কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ওদের উচিত পতিত জমিতে সব বাতাপী গাছ লাগান।' যেই মনে হওয়া সঙ্গে সঙ্গে চার গ্যালন পেট্রোল পুড়িয়ে গেলেন সেই চন্দননগরে। অনেকদিন পরে যখন আবার আমার জামায়ের সঙ্গে দেখা বললেন, "কিহে, তোমাদের জমিতে বাতাপী লাগান হয়েছে তো?" তাতে সে বলে, 'কই প্রজারা বললে গা করে না।' তাতে বাবা বলেন, তোমরা বলনা প্রজাদের যে পতিত জমিতে গাছ লাগাবে তার খাজনা কমিয়ে দোব। বলাবাহুল্য সে ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব হয় নি।

সংসারে সাশ্রয় বিষয়ও বাবার অনেক এমনি নিয়ম ছিল। যেমন ফিনাইল কেউ বোতলে কিনবে না, বড় টিন কিনে বোতলে বোতলে আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী বিলি কর। আবার তারা যখন কিনবে ঐভাবে ভাগ করবে। বলা বাহুল্য প্রথমোক্ত বাবার বিলি ঠিকই হত, শেষোক্ত ব্যাপার আর হয়ে উঠতো না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একবার আমার কোন ভাইকে বাবা একটি খুব বড় টুথ পাউডারের কৌটা কিনে দেন। নির্দ্দেশ ছিল ঐ মাজন সে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবে। তখন পিতৃদেব বিদেশে কাজ করতেন, মাস দুই বাদে ফিরে দেখেন তখনও সে সেই মাজন ব্যবহার কর্চ্ছে। একে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এই ছেলে ব্যবসা করতে চায়, এর একেবারেই বুদ্ধি নেই।' আমরা কিন্তু তার বুদ্ধির নিন্দা করতে পারি নি কারণ মাজন নষ্ট হবার জিনিষ নয়, লাভটি অপরকে না দিয়ে সে নিজেই করলো। পিতৃদেব লাভ অর্থে সকলের লাভ বুঝতেন।

সমদৃষ্টি বা উদারতা

তিনি নিজে যা খেতে পারিতেন না তা চাকর বাকরদের দেওয়া সইতে পারিতেন না। একবার নৈহাটী থাকাকালীন চাকর ড্রাইভারদের রুটিতে মাখানর জন্য ঘি না দেওয়ার অপরাধে আমি তাঁহার কাছে ভর্ৎসিত হইয়াছিলাম। প্রচুর ডাল তরকারি মাছ গুড় থাকা সত্ত্বেও আমায় বলিয়াছিলেন, ঘি না দিলে ও রকম শুকনো রুটি ওরা খাবে কি করে? অমন রুটি তুমি আমায় দিতে পার?" চার টাকা সেরের ঘি চাকর বাকরদের



বাম হইতে দক্ষিণে, শ্রীযতীন্দ্র কুমার বিশ্বাস, ..., সার জন এণ্ডারসন, খানবাহাদুর ফজলুর করিম,
ডাঃ দত্ত, শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ, শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় ...., যশোহর ১৯৩৫

রুটিতে দেবার রেওয়াজ আমার শ্বশুর বাড়ীতে ছিল না। কাজেই চুপ করে রইলুম। যে মানুষ বাড়ীর কর্ত্তার আর ভৃত্যের প্রভেদ বোঝে না তাকে বলবোই বা কি? আমের সময় নিজেরা ভালো ল্যাংড়া বোম্বাই আম খাব অথচ লোকজনদের আম না হলেও চলবে এ তাঁর ধাতে পোষাত না। নিজেরা ভাল ভাল সন্দেশ খাব অথচ চাকরদের গুড় জুটলেই ঢের, এ মনস্তত্ত্ব তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। তার চেয়ে দিশি আম আর নারকোল নাড়ু সবাই মিলে খাও। মুড়কি বাতাসা কদমা খাও। তবু মনিব ভৃত্যে পার্থক্য তাঁর পোষাত না সে কারণ সহজলভ্য ফলমূল মিষ্টির তিনি বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। বড় মাছ আসলে তার মুড়ো ডাল তরকারীতে দিলে সন্তুষ্ট হতেন কারণ তাহলে চাকর বামুন সবাই পাবে। কৃপণতা দোষ একবিন্দুও তাঁর মধ্যে ছিল না। খ. আনতেন প্রচুর আনতেন, খাও দাও বিলোও। সঞ্চয়ের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। বেশী হয়ে থাকে পথে ভিখারীর অভাব নেই, তাদের দাও। মনে আছে নৈহাটীর বাড়ীতে মালপোয়া ক'রে একদিন কি অপ্রস্তুই আমি হয়েছিলুম। দিনে তিন চার সের দুধ নোয়া হয় অথচ বাবা খান না এই ভেবে সেদিন কিছু ক্ষীর ক'রে মালপোয়া করি। তখন নৈহাটীর বাড়ীতে দুস্থ ১৫।২০টি ছেলে বাবার কাছে থাকত। বাবার সঙ্গে যে ৬।৭টি ছেলে বসেছিল তাদের ও বাবাকে মালপোয়া দিই। কিন্তু সবাইয়ের জন্য যথেষ্ট জিনিষ ছিল না। বাবা তখন কিছু বলেন নি, পরে আমায় বললেন, 'যে জিনিষ সকলের মত সম্ভব নয় তা আমায় দিও না, আমার খেতে কষ্ট হয়।' আমার বিশ্বাস এই মনের জন্যই বাবা সংসারে এত কষ্ট পেয়ে গেলেন। তাঁর রক্তের প্রতি বিন্দুতে সমপ্রেম ও ভালবাসা ভরা ছিল, ওরকম মন নিয়ে এ স্বার্থভরা জগতে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। জগতের অনেকে তো বটেই, তাঁর নিজ সন্তানও তাঁর অমন মনের মর্য্যাদা বোঝেনি।

মাতৃভক্তি ও গুরুজনের সম্মান

ঠাকুমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। শত কাজের মধ্যেও ঠাকুমা খেতে বসলে নিজে হাতে তাঁর পাতে মিষ্টি তুলে দিতেন। নিজে দাঁড়িয়ে দুধ খাওয়াতেন পাছে ঠাকুমা না খান। বাবার অসুখের মধ্যে ঠাকুমা বাবাকে দেখতে এলেই বলতেন মার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিয়ে দাও। ঠাকুমার জন্য ভাবনার তাঁর অন্ত ছিল না। বাবার যন্ত্রণার দৃশ্যে পাছে ঠাকুমার কষ্ট হয় এজন্য ঠাকুরমার সামনে অসহ্য কষ্টও তিনি প্রাণপণবলে দমন করে রাখতেন এবং তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠানর জন্য ব্যস্ত হতেন। বাবা যতদিন ছিলেন, ঠাকুরদার দেওয়া হরিশ মুখার্জীর রোডের বাড়ীর ভাড়া বরাবর ঠাকুমাকে দিতেন। দান ধ্যান ও সরলতার ফলে বাবার বহু অর্থ সাধারণের হিসেবে

নষ্ট হয়েছিল। বাবার ইচ্ছে ছিল ঐ পৈতৃক বাড়ীর আয় বরাবর ঠাকুমা পান, তাই এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন, বুঝছি বসন্ত থাকতে মায়ের কোন কষ্টই হবে না তবুও আমি না থাকলে মার আয় কমে যাবে একথা ভাবা আমার পক্ষে বড় কষ্টকর।

গুরুজন ও দুঃস্থ আত্মীয়দের সম্মান সম্বন্ধে বাবা খুব সচেতন ছিলেন। একবার বাবার এক মাসিমার ছেলেকে আমি নাম ধরে ডাকায় অসন্তুষ্ট হয়ে বাবা আমায় বলেন, 'তুমি ওকে কাকা বলনা কেন?' ছেলেটি আমার সমবয়সী সে স্নেহবশতঃ আমায় পুষ্পমা বলতো, আমিও নূতন মাতৃত্বের গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়েই তাকে নাম ধরে ডাকি, এছাড়া আর কোন অসম্মান করার উদ্দেশ্য তার মধ্যে ছিল না। তবুও বাবার সেদিনের তিরস্কার আমায় সাবধান করে দিয়েছিল। তাঁর মাসিমাকে তিনি মায়ের মত সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। তাঁর ছেলে মেয়ে এমন কি দৌহিত্র দৌহিত্রীর সব রকম দায়িত্ব তিনি নিজের বলে মানতেন। ঐ প্রসঙ্গে মনে পড়ে এই শেষ অসুখের মধ্যে একদিন বাবার হঠাৎ নাড়ী খারাপ হয়ে খুব ঘাম হতে থাকে, হাত পা ঠাণ্ডা, আমরা খুব বিব্রত, ঐ সময় আমার হাত থেকে পাখা নিয়ে ছোট ঠাকুমা বাবার মাথায় হাওয়া করেন। অত কষ্টের মধ্যেও বাবা বলেন, 'মাসিমা হাওয়া কচ্ছেন—ছিঃ ছিঃ।'

মার কাছে শুনেছি বাবা তাঁর চার সন্তানের মধ্যে আমায় নাকি বেশী ভালবাসতেন। কিন্তু বাবার ব্যবহারে আমার সঙ্গে ছোট ঠাকুরমার কোন প্রভেদ ছিল না। নিজের অত অসুখের মধ্যেও ছোট ঠাকুমার আহার ও বিশ্রামের দিকে বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতো। মনে পড়ে ছোটবেলায় বাঁকুড়া থাকার সময় দেখেছি শীতের ভোরে আমাদের পায়ে যেমন বাবা নিজে হাতে চাপা দিতেন ঠিক তেমনি যত্নে ছোট ঠাকুমার গায়ে র্যাপার ঢাকা দিয়ে দিয়েছেন। বালিশ থেকে মাথা পড়ে গেলে সযত্নে তুলে দিয়েছেন মাথা বালিশে। একত্র মায়ের সম্মান ও সন্তানের স্নেহ ঐ ভাগ্যহীনার পক্ষে আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। বাবাকে হারানোর দিনে ছোট ঠাকুমা কেঁদে বলেছিলেন, 'আজ আমি পিতৃহারা মাতৃহারা স্বামী ও সন্তান হারার শোক বুঝলুম, এ সর্ব্বহারার দুঃখ আর কে বুঝবে?"

আমরা পুজোয় নিজের ছেলেমেয়েদের বেলা কিনি সিল্ক বেনারসী কিন্তু গরীবদের বেলায় র্যাশন দুর্ম্মূল্যতার কথা বলি। কিন্তু বাবার ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। বিয়ের আগে আমায় ও আমাদের পুজোয় জামা কাপড় তিনি দিতেন না বলতেন, 'আমাদের দুঃস্থ দেশবাসী কজন এদিনে আনন্দে ক'রে নতুন কাপড় পরতে পায়?' অথচ দীন দুঃখীর বেলায় ছিলেন মুক্ত হস্ত।

আত্মীয়স্বজন বাবার কাছে পুজোর কাপড় তো পেতেনই উপরন্তু কিভাবে যে তাঁর উপর জোর জুলুম করতেন তা ধারণা করা যায় না একবার আমাদের এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি তাঁর পাঁচ ছেলের কথা বলে বাবাকে বলেন, 'আপনি থাকতে ছেলেরা পূজোর দিনে নতুন জুতো পরতে পাবে না?' তখুনি পাঁচ ছেলের জামা জুতোর দাম নিয়ে তিনি চলে গেলেন কিন্তু বাবার ছেলেরা যে পূজোর দিনে নতুন কাপড় পরে না একথা তিনি জানতেও পারলেন না।

অহঙ্কার জিনিষটি যাতে আমাদের মনে স্থান না পায় এজন্যে বাবা খুব সচেতন ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, তখন আমি বালিকা। একদিন আমার চুলে ফুল দেখে বাবা আদর করে বলেন, "কিরে, তুই যে সাঁওতালনী সেজেছিস দেখছি।" তার উত্তরে আমার মা বলেন, "কেন আমার মেয়ে কি সাঁওতালের মত কালো?" এর উত্তরে বাবা বলেন, "আমাদের বাঙ্গালীর মেয়ের শ্যামবর্ণ রংই স্বাভাবিক ওর ওটা চামড়ার ডিফেক্ট ছাড়া কিছু নয়। এখনও বেশ মনে আছে কেউ আমার রং-এর বিষয় প্রশংসাজনক কিছু বললে ঐ চামড়ার ডিফেক্ট মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়ে থাকতুম। বড় হয়েও অনেক সময় কারুর মুখে রূপের প্রশংসা বা বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে আমার ভারি আশ্চর্য বোধ হত। বিশেষ করে কারুর মুখে তার নিজের বা নিজের সন্তানের রূপের প্রশংসা শুনলে আমার আশ্চর্য্যের সীমা থাকতো না। মানুষের বাইরের দেহ যে কোন মূল্যই নেই এই সহজ কথাটি লোকে বোঝে না ভেবে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

এই সম্বন্ধে আমার বড় মেয়ে উর্ম্মিলার (মোনো) লেখা একটি কবিতা এখানে দিলুম। মেয়েটি ধনী ঘরের বধূ। প্রচুর স্বাচ্ছল্য ও বিলাস আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও এ মনোবৃত্তি শুধু বাবার হাতে গড়া ভিত্তি স্থাপনেই সম্ভব হয়েছে।

"এই দেহটা উঠবে যখন কাঠের শয্যাপরে
তখন থাকবে না ভেদ ধনী গরীব কালোতে সুন্দরে
বিশ্রী অতি কালোবরণ রূপহীন সে যদি
পরের দুঃখে ঝরায় তাহার হৃদয় ফল্গু নদী
সেই ত পাবে স্বর্গে গিয়ে দেবের অধিকার
অতুল রূপের অধিকারী মানবে তখন হার।"

এই ভাবের অনেক ছোট খাট দুর্ব্বলতা থেকে আমরা বাবার জন্যে রক্ষে পেয়েছি। আমার এই মেয়েটি শিশুকালে বিয়ে হয়। গেরস্থ ঘরের মেয়ে ধনী গৃহে বধূ হয়ে সহজেই দিশেহারা হয়। তার ওপর মাথার উপর শাশুড়ী

নেই। কয়েকজন ঈর্ষাপরবশ আত্মীয়া আমার মেয়েকে বলেন, "তোমার শাশুড়ীর অনেক জিনিষ এঁরা ওঁরা নিয়েছেন।" বাবার কাণে সেকথা উঠলে বাবা মোনাকে ডেকে বলেন, "ও জিনিষ তোমার কে বলে? ওসব কথা মন থেকে সরিয়ে দাও। হীরেতে আর কাঁচেতে পার্থক্য কী? এই ভেবলেই মনের অশান্তি দূর হয়ে যাবে।" মেয়েও মাতামহের সেই কথা অন্তরে দৃঢ় করে নিয়ে অনর্থক দুঃখ ও অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। তাঁর প্রতি কথায় ছিল শিক্ষা, ছিল আদর্শ।

একবার মিহিজামে আমার দৌহিত্র কমলেশ বিকেলে অন্য জামা পরবে বলে বায়না করায় বাবা আমার ছোট মেয়ে তপুকে,বলেন "এই দেখ বেশী পাবার দুঃখ।" মালী হারার ছেলের এ কষ্ট নেই। তার একটি জামা, শীত করলে পরবে। তাঁর তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা ছিল প্রচুর। এরই জন্য বাহ্য জগতে তার উপযুক্ত উন্নতি হয়নি। ওপর ওয়ালার খোসামোদ ভিন্ন যোগ্যতম ব্যক্তিও যে উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা পায় না বাবার জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বোধ হয় ১৯৩৬ সালে প্রায় ১০০ জনকে ডিঙিয়ে * * রায়কে ম্যাজিষ্ট্রেট করা হয়, অথচ তাঁর চেয়ে উপযুক্ত অনেক লোক, রায়বাহাদুর বিনোদবিহারী সরকার, রায়বাহাদুর গিরীশ সেন ইত্যাদি অনেকে নীচে থাকেন। বাবা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তারই ফলে প্রচুর কর্ম্মখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও তার উন্নতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। সরকারের এমনি দুর্ভাগ্য শেষে ঘুষ নেওয়ার বদনামে উক্ত রায় মহাশয়ের পেনসেন বন্ধ হয়।

বোধ হয় ১৯২২ সালে বাঁকুড়ার সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বাবার সাহসিকতা ও নির্ভীকতার ফলেই বিনা অস্ত্রে শান্তি আনা সম্ভব হয়েছিল একথাও অনেকেই জানেন। সেই গ্রাম্য নিরক্ষর বন্য স্বভাব সাঁওতালদের শান্ত করতে না পারে ইউরোপীয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব যখন বন্দুক নিয়ে গোলাগুলির ব্যবস্থায় প্রস্তুত হলেন তখন রক্তপাতের আশঙ্কায় জীবন পণ রেখে বাবা গেসলেন তাদের মধ্যে শান্ত করতে এবং ফিরেও ছিলেন কৃতকার্য্য হয়ে।

তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। কারুর কথা মত কাজ তিনি করতেন না। নিজে বিবেচনা করে যা ভাল বুঝতেন, তা থেকে কেউ তাকে টলাতে পারতো না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একবার আমার এক আত্মীয়ার ব্যবহারে আমি বড়ই দুঃখ পাই। পিতৃদেব আমার সে দুঃখের কারণ জেনেও তার প্রতি ব্যবহারে বিন্দুমাত্র পার্থক্য করেন নি। এই সম্বন্ধে আমি একবার অনুযোগ করায় আমায় বলেছিলেন "তোমাদের কোন দুঃখের কারণ ঘটলে

আমি নিশ্চয়ই তা শুনব এবং বিবেচনা করব কিন্তু তার ওপর কি কর্ত্তব্য তা আমিই ঠিক করবো।" ছোট খাট ব্যক্তিগত কারণে নিজের কর্তব্য ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নিজের ত্রুটি বড় করে দেখা আর অপরের ত্রুটি সম্বন্ধে উদারতা তার যে কত বেশী ছিল তা তাঁর কঠিন দুঃসাধ্য রোগ যন্ত্রণার সময় যে কাছে থেকেছে সেই দেখে আশ্চর্য্য হয়েছে। ঐ শেষ ছ'মাসের কাহিনী আমার কত না ত্রুটি, কত না নিষ্ফল চেষ্টায় ভরা। দীর্ঘদিন কঠিন রোগে ভুগে মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বিশেষ তাঁর মত কাজের লোক। কিন্তু একদিনের জন্য তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি বা মৃদু অনুযোগ কারোও সম্বন্ধে তাঁর কাছে শুনিনি। বরং আমারা সবাই তাঁর জন্য ব্যস্ত হচ্ছি এজন্য তাঁর অনুতাপের সীমা ছিল না। তাঁর স্নেহ তাঁর ভালবাসা যে কতটা সত্য ও অকৃত্রিম ছিল তা হয়ত আর একটা ঘটনায় কিছু বোঝা যাবে। তার জন্য কারুর অসুবিধে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, সেজন্য তাঁর খাবার জন্য কেউতো অপেক্ষা কর্ব্বেই না, খাবারের সময় কারুর থাকার প্রয়োজনও কখনো প্রকাশ করেন নি সচরাচর শ্বশুরের খাবার সময় বধূরা না থাকলে শ্বশুররা দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হন। এ কারণে বহু শিশু বধূর রাত ১২টায় পাখা হাতে শ্বশুরের খাওয়ার সামনে বসে ঢোলার গল্প শোনা যায়।

একবার শ্রীনিকেতনে বাবা থাকার সময় একদিন আমি গজা তৈরী করেছিলুম। বাড়ীর খাবার বাবা বড় ভালবাসতেন। বিকেলে প্লেটে গজা দেখে বাবা জিগেস করলেন, 'কে করেছে?' আমি করেছি শুনেই বলেন, "বহুদিন তোমায় বলেছি দুপুরে একটু বিশ্রাম করতে, ও গজা আমি খাব না।" আমি আগুন তাতে গ্রীষ্মকালে খাবার করার অপরাধে বাবা বিকেলে কিছু খেতে পেলেন না, এই দুঃখ গ্লানি সারাদিন আমার মনে ভরে রইলো।

তবুও আমার পিসতুতো ভাই ধরণী আর একবার বাবাকে বললো, "আজকের দিনটা খান মামা, এতে দিদির মনে কষ্ট হবে।" এর উত্তরে বাবা বলেন, "ও সব কষ্ট আমি বুঝি না, তুমি ওকে চেন না, একদিন যদি আমি ঐ খাবার খাই তাহলে রোজ আগুন তাতে বসে ও খাবার কর্ব্বে।

ঐ সময়ের আর একটি কথা আমার মনে পড়ে। শারীরিক সামান্য অসুস্থতার জন্য আমি শুয়েছিলুম। বাবা এসে ভোলা চাকরের উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন "ঠাকুরকে চায়ের জল করতে বল্।" আমার মনে পড়লো ভোলা বাড়ীতে নেই। উঠে পাশের বারান্দায় গিয়ে ঠাকুরকে ডাকতেই বাবা ব্যস্ত হয়ে বলেন, "অসুস্থ শরীরে সবেতে তুমি এত ব্যস্ত হও কেন? আমি না হয় পাঁচ মিনিট বাদেই চা খাব।" এমন সময় দূরে সাইকেলে

ধরণীকে দেখা গেল। বাবা আমার অসুখের কথা ভুলে বললেন, "উঃ ছেলেটা কি ঘেমেই আসছে, ওঠ, ওঠ্ দেখ ওর খাবার দাবার ঠিক আছে কিনা।" নিজের কষ্ট তিনি সইতে পারতেন, অপরের কষ্ট তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল। এই সূত্রে নিজের একটি গভীর অপরাধের কথা মনে পড়ে। জানি হয়ত বাবা আমায় ক্ষমা করেছেন কিন্তু আমি নিজের মনে ক্ষমা পাই না।

বাবার শেষ অসুখে আমার মেজ কাকার ছেলে শ্রীমান অমিয় সন্তানের অধিক সেবা করেছে। তার ছোট ভাই গোপালও অনেক সময় দিনের বেলা এসে থাকতো। ঘটনাটি বোধ হয় বাবার মৃত্যুর দিন ১৫।২০ আগের আগের ঘটনা।' ঐ সময় আমি বিলিয়ারি কলিক ও গাসট্রিক আলসারের যন্ত্রণায় প্রায় শয্যাগত হই। বাবা বারে বারে খবর নিচ্ছেন কষ্ট কমেছে কিনা। বাবাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলি কষ্ট অনেক কম। এমন সময় গোপাল বাবার কাছে আসে। বাবা বলে পাঠান 'গোপালকে শীঘ্র চা করে দিতে বল।' দুপুরে ঝি চাকররা বিশ্রামের জন্য যাওয়ায় ও উনুনে আগুন না থাকায় শরীর খারাপ নিয়ে চা করতে আমার একটু কষ্ট হয়। চা করে বাবার ঘরে এসে দেখি গোপাল চলে গেছে, তাতে বিরক্ত হয়ে আমি বলি, "কেউ এক মিনিটের জন্য এলেও তাকে তক্ষুনি খেতে দিতে হবে! বাইরের লোক তো নয় ঘরের ছেলে অথচ সে এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারলো না।" আমার ঐ কথায় বাবা যে কত দুঃখ পেয়েছিলেন তা বুঝি বাবার মৃত্যুর পর যখন শুনি বাবা নাকি অমিয়কে বলেছিলেন, 'ঐ দুপুর রোদে গোপালকে কষ্ট করে আসতে বারণ করিস।'

আর একদিন নীহার বলে একটি ছেলে বাবাকে দেখতে আসে। বাবার মানসিক উত্তেজনার আশঙ্কায় অনেক লোককেই বাবার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে দেওয়া হোত না। ডাক্তারদের আদেশ বর্ণে বর্ণে মেনে চলার উদ্দেশ্যে বাবাকে অনর্থক কত দুঃখ যে দিয়েছি তা মনে করলে আজও চোখের জল বাধা মানে না। ঐদিন বাবার কষ্ট বেশী ছিল, বুকের যন্ত্রনা অসহ্য, নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল আমি খুব উদ্বিগ্ন ও বিব্রত। এমন সময় শুনি যে একটি ছেলে বাবাকে দেখতে এসেছে। সৌম্য প্রিয়দর্শন ছেলেটি এসে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বাবার খবর নিয়ে বলে একবার দেখব আমি। তার উত্তরে আমি বলি, 'উপায় নেই ডাক্তারের নিষেধ।' ছেলেটি একথা শুনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। আমিতো অপ্রস্তুত। শুনলুম ছেলেটি বাঁকুড়ায় বাবার কাছে কাজ করেছিল পুকুর পঙ্কোদ্ধারের বিষয়। বদলি হয়ে বহরমপুর যাচ্ছে। একেই বাঁকুড়ার বিষয় বাবার চিন্তার শেষ ছিল না তাতে পুকুর পঙ্কোদ্ধারের বিষয়, কাজেই কোনমতেই বাবার কাছে ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একবার ও বিষয় কথা উঠলে রক্ষে নেই। বাবাও নীহারের নাম শুনে দেখার

জন্য অধীর। শেষে বাবাকে বল্লুম, 'বেশ আমি দেখতে দেব কিন্তু কথা বলতে দেব না।' সে সময়ে বাবার চোখে কি মিনতির দৃষ্টিই দেখেছিলুম। ক্ষণ মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে বল্লেন, "বেশ তাই হবে।" ছেলেটি এসে বাবার হাতে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। ঐদিন ঐ ছেলেটির চোখে যে গভীর বেদনা, ভক্তি ও আকুলতার একত্র প্রকাশ দেখেছি তা কখনো ভুলবো না। এই রকম কত বৃদ্ধ কত প্রৌঢ়, কত যুবক এসে যে বাবার জন্য কেঁদে ফিরে গেছে তা বলে শেষ করার নয়। আমি শুধু ভাবতুম কর্ম্মস্থলে যাঁর স্নেহ পেয়ে এত লোক প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবেসেছে তাঁর সন্তানের কাছে স্নেহহীনতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কি হতে পারে! অদৃষ্টের পরিহাস।

হরিপদ সরকার বলে একটি ছেলে কিছুদিন বাবার সঙ্গে একত্র চাকরি করেছিল। বাবার অসুখ শুনে দেখতে এসে লোকের প্রয়োজন জেনে বাবার সেবার জন্য তার একমাত্র ভৃত্যকে সে রেখে যায়। ঐ ভৃত্যটির কোন দোষ দেখে আমি বিরক্ত হ'লে বাবা বলতেন, 'ওর হাতের ভেতর দিয়ে আমি হরিপদর সেবাই পাই।' এবং শেষে নাম না মনে থাকলে ঐ লোকটিকে হরিপদম্যান বলে উল্লেখ করতেন।

সচরাচর গৃহকর্ত্তারা ভৃত্যের নামের সংক্ষেপ করার জন্য রামচরণকে রামা মাধবকে মেধো নামে অভিহিত করেন। বাবার ঠিক ছিল ঠিক তার বিপরীত। বালক ভৃত্য ননীকে ননীগোপাল, ঠাকুর চন্দ্রনাথকে চন্দ্রদেও নামে ডাকতেন। এর মধ্যে সাধারণ গৃহকর্ত্তার চাকরদের প্রতি যে অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা, তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে তাতো ছিলই না উপরন্তু তাদের প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ ও বাৎসল্য ফুটে উঠতো।

বাবার অসুখের সময় শ্রীমান হরিপদ সরকারের যে মহৎ অন্তঃকরণ ও গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় আমি পেয়েছি তা বর্ণনার অতীত। বৃদ্ধ বাপের কঠিন অসুখে সুদূর কর্ম্মস্থলে বাধ্য হয়ে আটকে থাকতে হলে সন্তান যেভাবে অধীর হয়ে থাকে হরিপদর প্রতি চিঠিতে এবং প্রতি কথায় সেই আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ পেত। কখনো নানাপ্রকার পুষ্টিকর পথ্য দিয়ে লোক পাঠাতো কখনো সামান্য ছুটি পেলেই নববিবাহিতা কিশোরী বধূকে নিয়ে ছুটে আসত।

বেশ মনে পড়ে একদিন আমার স্নেহাস্পদা ভ্রাতৃবধূ জ্যোৎস্নাকে (হরিপদর স্ত্রী) হরিপদ বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বলে, তখন পিতৃদেবের চোখে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে দেখেছি। ঐ অশ্রুর মর্ম্মকাহিনী গভীর বেদনা ও আনন্দে জড়ানো! আনন্দ স্নেহাস্পদের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সেবার আগ্রহ দেখে দুঃখ হয় কোন নিকটতম আত্মীয়ার এত বড় কর্ত্তব্যে ত্রুটি স্মরণ ক'রে।

ঐ সময় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একমাত্র পুত্র, মানে পিতৃদেবের একমাত্র পৌত্র বাবলুকে বাবা একবার দেখার জন্য বারে বারে আমার পিতৃব্যকে দিয়া

বলিয়া পাঠান। আমার এমনি দুর্ভাগ্য পিতার সে সাধটুকুও মেটেনি। ওসব কথা মনে করলে নিজেকে শান্ত রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

ঐ হরিপদই আর একদিন কথা প্রসঙ্গে আমায় বলেছিল, "দিদি, ওঁর কাছে আমরা কাজের শিক্ষা পেয়েছি। উনি বলতেন, 'তোমরা মাইনে নিয়ে যে কাজ কর্চ্ছ তাতেই তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হল না। এদেশের ছেলে বলে দেশের প্রতিও তোমাদের কর্ত্তব্য আছে।' এখনও ওঁর অনুরাগী এমন অনেক ছেলে আছে যে তার যথাসর্ব্বস্বর বিনিময়ে ওঁর জীবন রক্ষার চেষ্টা কর্ব্বে। যদি কোনদিন ওঁর জন্যে প্রয়োজন হয় দিদি, সেদিন পদপ্রান্তে এই ভাইকে স্মরণ কর্ব্বেন।"

বাবার হাতে গড়া আমার এই সব ভাইদের কথা ভাবলে মনে হয় একা আমিই বাবাকে হারিয়ে দিশাহারা হইনি। আমার সঙ্গে সঙ্গে কত দূর দূরান্তরে কত দেশে, কত গ্রামে, কত দুঃস্থ, কত ছাত্র, কত বাবার প্রিয়তম সন্তানাধিক ছেলেরাও যে পিতৃহারা হয়েছে তা আমি জানিই না। তাদের বেদনা আমার চেয়ে অনেক বেশী—

"আমার হিয়ার কমল যে শুধু একেলা আমার নয়
সবাকার চোখে অশ্রুর ধারা দিল সেই পরিচয়।"

কোন বন্ধুত্ব বা আত্মীয়সূত্রে টাকা না দিয়ে কারুর কাছ থেকে কিছু কাজ করানর বাবা অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এজন্য অনেকে তাঁকে অহঙ্কারীও হয়তো মনে করেছে কিন্তু তাঁর মত ছিল যার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যাঁরা টাকা নিতে আপত্তি করবেন আশঙ্কা থাকলে পিতৃদেব সেদিকে ঘেঁসতেন না। ঐ সূত্রে দু একটি ঘটনা মনে পড়ে। একবার আমার কিছু দাঁতের অসুখ হয়। খ্যাতনামা ডেন্টিষ্ট কেনারাম ভট্টাচার্য্য আমার কাকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পিতৃদেবকে অগ্রজের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। বাবা কেনারাম বাবুকে বিদেশ হইতে পত্র দেন, "পুষ্পর দাঁতে কি হয়েছে, যা করবার কোরো।" এরপর সব শেষে গোল বাধলো টাকা নিয়ে। কেনারাম বাবু কিছুতে টাকা নিতে চান না। বাবা তখন বলেন, "তুমি চিকিৎসা করলে আমি নির্ভর করতে পারি কিন্তু টাকা না নিলে আমায় বাধ্য হয়ে অন্য ডাক্তার দিয়ে কাজ করাতে হবে।" তখন তিনি টাকা নিতে বাধ্য হন।

একবার আমাদের দুটি নিকটতম আত্মীয়র প্রয়োজন বোধে ডাঃ অধিকারী এক্সরে নেন। পিতৃদেবের পরিচয়ে ডাঃ অধিকারী তাঁদের নিকট ফী নেন না কিন্তু বাবা জানতে পেরে নিজে তাঁর ফী তাঁকে দেন। যার যা উচিত প্রাপ্য তা তাঁকে দিতেই হবে। এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র অধিকারীর নিকট বাবার আর একটি গল্প শুনি।

পিতৃদেব শ্রীনিকেতনে থাকার সময় ঐখানে টি, বি, সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যে বাবা ডাঃ অধিকারীকে আমন্ত্রণ করেন। তারপর ডাঃ অধিকারীর পারিশ্রমিক ও পাথেয়র জন্য শ্রীনিকেতন থেকে যা প্রাপ্য তা ডাঃ অধিকারীকে দিতে গেলে তিনি নিতে চান না তাতে বাবা বলেন, "বেশতো নিতে ইচ্ছে না হয় ও টাকা আবার শ্রীনিকেতন সাহায্য ভাণ্ডারে দান করুন, কিন্তু যা উচিৎ প্রাপ্য তা নেবেন না কেন?"

নিজের বা নিজের ছেলেদের জন্য তিনি কখনো কারুকে কিছু বলেন নি। কিন্তু অপরের জন্য তাঁর চেয়ে অনেক নিম্নস্থ লোকের দ্বারস্থ হতেও আপত্তি ছিল না। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শ্রদ্ধেয় বিনোদবিহারী সরকারের নিকট শুনেছি। অধিকাংশ পদমর্য্যাদা পূর্ণ লোকের মনে সহজেই আত্মাভিমান আসে পাছে কেউ তাঁর কথা না রাখে বা তাঁর অসম্মান হয। সে রকম মিথ্যা আত্মাভিমান তাঁকে স্পর্শ করে নি।

বাবা নৈহাটী থাকতে আমার মেজকাকার মেযে ভবানীর বড় মেয়েটী উলায় টাইফয়েড হয়ে মারা যায়। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে বাবা তাঁর অসুখেব খবর পান নি। ঐ মৃত্যুতে বাবা মর্ম্মান্তিক আঘাত পান ও ভবানীকে লেখেন, "বিজয় নাই সত্য কিন্তু আমি তো এখনও বাঁচিয়া আছি একথা তোমরা একবারও ভাবিলে না কেন?" নিজে অত কাজের মধ্যেও উলায় গিয়া ভবানীকে সান্ত্বনা দিয়া আসেন। বাবার শেষ অসুখের মধ্যে আমার পরম স্নেহাস্পদ ভাই শ্রীমান অমিয় (মেজকাকার মেজ ছেলে) ধর্ম্মঘট করার ফলে তার চাকরী যায়। ঐ চাকরী যাওয়ার খবর বাবাকে দেওয়া হয়নি কিন্তু অমিয় হাঙ্গার ষ্ট্রাইক কর্চ্ছে শোনার পর থেকে পিতৃদেবের চিন্তার আর অন্ত থাকে না। সীতানাথকে দেখে অমিয় ভেবে বলেন, "কে কে যে ছেলেটি জেলে গেছে?" এবং অমিয়র উপবাসের খবরের পর থেকে আর চেয়ে কিছু খাননি।

আমার বিষয় কিছু লিখতে গেলে আমার পক্ষে সংযম রাখা বড় কঠিন হবে তাই অতি সংক্ষেপে দু একটা ঘটনা লিখে এ বিষয় শেষ করি। আমার মা অসুস্থা বলে ছোটবেলা থেকেই বাবার বুকেই আমি মানুষ হয়েছিলুম। আমার সে সৌভাগ্যর সীমা নেই। শুনেছি রাতে কাঁথার পরিবর্ত্তে বাবার সার্ট পেতে আমায় শুইয়েছেন। আফিস যাবার আগের মুহূর্ত্ত অবধি আমি ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি। আজো মনে পড়ে তাঁর সুমধুর গভীর কণ্ঠের শ্লোক আবৃত্তি শুনতে শুনতে তাঁরি কোলে ঘুমিয়েছি। রাতে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নিজে কোলে করে বসিয়ে খাইয়েছেন। মার কাছে শুনেছি যখন আমি অতি শিশু তখনও বাবা অফিস থেকে ফিরলে কেউ আমায় আটকাতে পারতো না। তার গলার স্বর কানে গেলেই হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর পায়ের কাছে

পৌঁছুতুম। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠলগ্না। তারপর মাথার টুপি, গলার টাই ইত্যাদি খেলার জন্য হাতে দিয়ে বাবা পোষাক ছাড়ার সময় পেতেন। দুবেলার ভ্রমণে আমি ছিলুম বাবার নিত্যসঙ্গী। আমার মনের সুকুমার বৃত্তি রক্ষার দিকে বাবার সজাগ দৃষ্টি চিরজাগ্রত ছিল। মনে পড়ে জলপাইগুড়িতে আমার বয়স বছর ৫ হবে। একদিন বাবা আফিস থেকে ফিরলে তখনকার ২৫ টাকার (১ টাকার ২৫টি নোট লাল মলাট সহ) বই একটি আমি তাঁর কাছ থেকে নিই। খেলতে খেলতে বাইরে চলে গেছি পরে একটি লোকের কাছ থেকে একগোছা পাহাড়ী গোলাপের পরিবর্ত্তে ঐ নোটের বই তাকে দিই। মনে আছে সন্ধ্যেবেলা প্রকাশ পেল ঘটনা। বাবার হঠাৎ মনে পড়ায় বললেন, "পুষপুষ আমার সেই লাল টাকার বইটা কই?" আমি বল্লুম, "তা দিয়ে আমি গোলাপ-ফুল কিনেছি যে।" মা বকাবকি সুরু করলেন, বাবা উঠে এসে বললেন "তাই নাকি বাঃ, চমৎকার ফুল তো?" এবং মাকে বললেন, এখন থেকে ও শিশুকে টাকাব মূল্য বুঝিও না।" ছোট্ট সহর, বাবা তখন সেখানে হাকিম হয়ত একটু খোঁজাখুঁজি করলেই ও টাকার সন্ধান পাওয়া শক্ত হোত না, কিন্তু বাবা তা হতে দেন নি। ছোট্ট বেলা থেকেই ফুলের ওপর আমার ভীষণ আকর্ষণ ছিল। বাবা মাঝে মাঝে আদর করে বলতেন, মালীর ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দোব।" আমার বিয়েব সময় আমার শ্বশুব মহাশয়ের মিহিজামের বিখ্যাত গোলাপ বাগান সেজন্য বাবার সব চেয়ে ভালো লেগেছিল।

শুনেছি শিশুকালে আমার একবাব দুপায়ে খুব দুর্গন্ধময় কাউর ঘা হয়। দুর্গন্ধে কেউ (এমন কি আমার মাও) আমায় ছুঁতেন না। বাবা রোজ নিজে হাতে সব পরিষ্কার করে দিতেন। একটু বড হলে তো কথাই নেই, বাবার অফিস থেকে ফেরার সময় হলে অধীর আগ্রহে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতুম। দূর থেকে দেখলেই ছুটতুম এবং তারপর বাবার কাঁধে চেপে ফেরা। সামান্য একটু অসুখ হলেই মাকে জানানর আগে অফিসে শ্লিপ যেত "বাবা আমার অসুখ করেছে।" সেই যে বাবাব কোলে শুতুম আর নামবার নাম নেই। আমার বেশ মনে আছে ৭।৮ বৎসব বয়সেও আমায় ঐভাবে কোলে নিয়ে রাতেব পর রাত বাবা বসে কাটিয়েছেন।

মার অসুস্থতার জন্য অনেক সময় মা কলকাতায় থাকতেন। আমরা, অর্থে আমি আর দাদা অধিকাংশ সময়ই থাকতুম বাবার কাছে। এখনও মনে পড়ে তখন আমার মস্ত চুল স্নানেব পর টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে পুরুষের মত করে বাবা মুছিয়ে দিয়েছেন। চড়ুইভাতি আর হরির লুঠ বাবা বড় ভালবাসতেন। ছোট বড় সকলকে নিয়ে আনন্দ করার শক্তি ছিল তাঁর অপরিসীম। বিশেষ করে বাড়ীতে অতিথি সমাগমে বাবার আনন্দের সীমা থাকতো না। এ গুণটি ছিল তাঁর পৈত্রিক। ঠাকুর্দ্দার কালে দেখেছি হঠাৎ একগাড়ী লোক বিদেশ

থেকে এল, দশ বারোজন। একমাস ধরে রইলো মেয়ের বিয়ের জন্যে, বিয়ে হল, খাওয়ান দাওয়ান খরচ হাঙ্গাম সব কিছু আনন্দের সঙ্গে বহন কর্ত্তেন ঠাকুর্দ্দা। কখনো এ সবে তাঁকে বিরক্ত হতে দেখিনি। কেউ কঠিন রুগী নিয়ে এসে উঠেছে দীর্ঘদিন ধরে বাড়ীতে নানা ঝঞ্ঝাট চলেছে কিন্তু সবাই সে কষ্ট মেনে নিয়েছে নিজেদের বিপদ বলে। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বাবাব সঙ্গে সঙ্গে সব গেল নিঃশেষ হয়ে। মনে পড়ে বিদেশ থেকে আমরা কলকাতায় ঠাকুর্দ্দার কাছে এলে তেতলার ঘর ছেড়ে বাবা একতলায় শুতেন জ্ঞাতিভাই শশধরদার সঙ্গে। আমি ছিলুম অপরিহার্য্য সঙ্গী। মনে আছে মাঝ রাতেও দেখেছি দুভায়ে গল্প চলছে কত রকম দেশের কথা, কত রকম আলোচনা তার যেন শেষ নেই। ঐ শশধর জ্যাঠামশায়ের অসুখে ও মৃত্যুতে যে ভাবে বাবাকে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করতে দেখেছি মানুষ সহোদর ভাইয়ের জন্যও তা করে ব'লে আমার ধারণা নেই। পড়ার মধ্যে ঐ দাদার পুত্রের অসুখেব খরচের জন্য টিউশানিও কবেছেন। শেষে ওঁর কঠিন দুরারোগ্য ব্যধিতে শিশুব মত বুকে ক'রে তাঁকে আগলে রেখেছিলেন।

আমার মার অসুস্থতার জন্য নানা দুঃখ দুর্ব্বিপাকে আমাদের সাংসারিক জীবন বিন্দুমাত্র শান্তিময় ছিল না। আমি ভাবতেও পারি না অত দুঃখ ঝঞ্ঝাট ও কষ্টেব মধ্যে কিভাবে বাইরের চাকরী, দেশের কাজ ও প্রতিটি আত্মীয় বন্ধু সন্তানদেব প্রতি এত নিখুঁতভাবে কর্ত্তব্য পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তবুও আমাদের যে চরম দুর্ভাগ্যের কাহিনী তা সকলের কাছে খুলে বলা সম্ভব নয়। মানুষ দেশ ও দশকে এবং সন্তান পরিজনকে কতটা ভালো-বাসলে যে অত বড় দুঃখ অম্লান বদনে সয়ে জীবন কাটাতে পারে তা ধারণার অতীত।

বাপ মা স্ত্রী সন্তান বন্ধু দেশবাসী দুঃস্থ দরিদ্র প্রতিটি লোকের প্রতি তাঁর প্রচুর কর্ত্তব্য। তাদের সমস্ত সুখ সুবিধার জন্য তিনি দায়ী এবং তাঁর জন্য কারুব কিছু করার নেই এই ধারণা তাঁর আজীবন ছিল। সকলের সব দায় তিনি সেধে মাথা পেতে নিয়েছেন। তাঁর এক দূর সম্পর্কের বিধবা অপুত্রক ভাগ্নি তাঁর কথার উল্লেখে বলেছিলেন, "যতদিন বড মামা বেঁচে আছেন ততদিন আমি রাজার মেয়ে, আমার ভাবনা কারুকে ভাবতে হবে না।" তাঁর থাইসিস হওয়ার পরও পিতৃদেব নৈহাটিতে তাকে নিজের কাছে এনে রাখেন।

নিজের কঠিন অসুখের মধ্যেও অপরের জন্য চিন্তার তাঁর শেষ ছিল না। ঐ অসুখের মধ্যে শোনেন আমার মেসোমশাইয়ের হার্ণিয়া হয়েছে। যখন বাবার প্রায় শেষ অবস্থা তখন মাসীমাকে দেখে অনেকক্ষণ পরে চিনতে পেরে বলেন, 'নীরদ বেল্ট' তার মানে ট্রাস পরার কথা বলতে চেয়েছিলেন।

আমার সন্তানদের জন্যে তিনি যা করেছেন কোন লোককে নাতি নাতনীর

জন্যে অত করতে আমি দেখিনি। মনে আছে বাবা যখন নওগাঁর এ্যাসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার তখন ইনস্পেক্টারদের বাৎসরিক রিপোর্ট লেখার সময়। বাড়ীতে প্রায় ১৫০।২০০ লোক। কাপাউণ্ড ভর্ত্তি তাঁবু পড়েছে। (শুনেছি ঐ রিপোর্ট লিখতে অন্য রেজিষ্ট্রারদের প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগতো, তা বাবা একদিনে লিখেছিলেন) ঐদিন রাত্রে আমি ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমার মেয়ে বুলু আমার পাশে নেই। বুঝলুম বাবা নিয়ে গেছেন। তখন পাশের ঘরে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড সেক্রেটারী টেবিলের একপ্রান্তে বাতি দানে বাতি জ্বলছে, বাবা একমনে লিখে যাচ্ছেন। টেবিলের ওপর কাঁথায় শুয়ে বুলু মহা আনন্দে হাত পা নেড়ে খেলা কর্চ্ছে, বাবার বাঁ হাত বুলুর গায়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিচ্ছে। বুঝলুম অত কাজের মধ্যেও বুলুর কান্নার আওয়াজে বাবা তাকে নিয়ে এসেছেন অথচ আমার ঘুম ভাঙ্গে নি। আমি বুলুকে নিতে গেলে বল্লেন, "যা যা তুই ঘুমুগে যা, আমায় তো কাজটা সারতেই হবে, ও খেলা করছে করুক।" যখনই বাপের বাড়ী থাকতুম আমার ও আমার সন্তানদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট বাবা হাসিমুখে চিরদিন নিয়েছেন এবং আমার সামান্য সুখ সুবিধার জন্য তিনি যে কি পরিমাণে কষ্ট নীরবে সয়েছেন তা একমাত্র আমিই জানি।

তাঁর মন কুসুমের ন্যায় কোমল ছিল। আমার বড় মেয়ে ছোটবেলায় সুস্থ ছিল না, তাকে নিয়ে যখন আমি শ্বশুর বাড়ী আসি বাবা তার পরিত্যক্ত মাথার বালিশটি চেয়ে নেন, বলেন, "ওতে মোনো মোনো গন্ধ আছে।"

ঐ সূত্রে আর একটি কথা মনে পড়ে যেদিন আমার দাদার মেয়ে পুতুলের জন্ম হয়। সেদিন বাবার কি আনন্দ! নিজে ঐ খবর আমায় দিতে গিয়ে আমার মেয়েদের বলেন, "এবার আর কোথাউ থেকে ফিরে মোনোও বলব না, বুলুও বলব না, বলব টুনু। এমনি দুরদৃষ্ট বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ী ছাড়তে ঐ দুটি শিশু পৌত্র পৌত্রীর জন্যই তিনি বেশী আঘাত পান। আমার ছোট ভাই সুধীরের বিয়ের সময় আমার বড় মেয়ে মোনোর কাছে সাশ্রুনয়নে বলেছিলেন, "এই আনন্দের দিনে পুতুল বাবলুকেও ওরা আসতে দিলে না এইই শুধু দুঃখু।" ঐ প্রসঙ্গে আমার মাসীমার কাছে বলেছিলেন, "ঐ নাতিনাতনী দুটোকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি, তাদের একবার দেখতেও দেয় না।"

এরপর আমার মাসতুত ভাই কৃষ্ণর বিয়ের রাতে বাবা পুতুলকে দেখতে পেয়ে তাকে হাত ধরে টানেন এবং সে হাত ঝাকিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। এই ঘটনায় বাবা এত আঘাত পেয়েছিলেন যে তখুনি আমার ছোট ভাই ও আমার স্বামীকে বলেন যে আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, বাড়ী ফিরে চল। এবং এরপর থেকে পুতুলের নাম বড় আর করেন নি। ঐ ঘটনার সময় পুতুল ১১ বছরের মেয়ে। সে মন থেকে সব স্নেহস্মৃতি কি করে অমন নির্মম-ভাবে মুছে ফেলল বুঝতে পারি না। এরপর শুধু বারেবারে বাবলুকেই

চেয়েছেন কিন্তু এমন অদৃষ্ট যে তাঁর সে ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ হয়নি। বালিগঞ্জ প্লেস থেকে বাবাকে সরিয়ে দেয়ার পর বাবা যখন দীর্ঘ দেড়বৎসর হরিমুখার্জীর রোডে থাকেন তার ভেতর একদিনও বৌদি বা পুতুলবাবলু বাবার কাছে আসে নি এমন কি বিজয়ার প্রণাম কর্ত্তে বা বাবার কঠিন নিমোনিয়ার সময়েও নয়।

ছোটছেলেদের সঙ্গে চিরকালই বাবার খুব বন্ধুত্ব হোত। আমরা ছোটবেলায় তাঁর সঙ্গে কতহৈ হৈ করে নির্ম্মল আনন্দউপভোগ করেছি তা আজো মনে পড়ে। রবিবার হলেই বাবার ছুটি ভেবে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না। কলকাতা থাকলে কখনো মার্কেট, কখনো জুবাগান, কখনো বোটানিক্যাল গার্ডেন দল বেঁধে বেড়াতুম। গল্পের বই, খেলনা পুতুল, লজেন্স বিস্কুট কেনা হত প্রচুর। পুঁটলি বেঁধে খাবার নিয়ে তিনবেলা ধরে খাওয়া বাবা বড় অপছন্দ কর্ত্তেন। তাই অপর কারুর সঙ্গে বেড়াতে গেলে যেত টিফিন ক্যারিয়ার করে খাবার। বাবার ছিল ব্যবস্থা অন্যরকম। ভাল হোটেলে যা ইচ্ছে নাও খাও, খরচের কথা ভাবতেন না কখনো। আমাদের ধারণা ছিল বরাবর আমরা কিছু খেলেই বাবা যেন কৃতার্থ হবেন। বাবার সঙ্গে ষ্টীমারে গেলে সে আনন্দই ছিল আলাদা। ষ্টীমারের ডেকে বসে হৈ হৈ করে গান, গল্প, আবৃত্তি। মাঝে মাঝে খাওয়া যখনকার যা, টাটকা গরম জিনিষ। সকালে ডিম পোচ, টোষ্ট, দুপুরে রাইশ-কারি চাটনি। পথকষ্ট কখনো অনুভব করিনি তাঁর সঙ্গে।

মনে পড়ে দীর্ঘ ২২ বৎসর আগের ঘটনা। তখন বাবা নোয়াখালিতে পোষ্টেড। আমি শ্বশুর বাড়ীতে কলকাতায়। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল মার খুব অসুখ নোয়াখালি যেতে হবে। দিদিমাও মেসমশায়ের সঙ্গে রওনা হলুম আমি। বয়েস তখন আমার ১৪।১৫ হবে। দীর্ঘ পথ প্রথমে শেয়ালদায় ট্রেন ধরে যেতে হবে গোয়ালন্দ। গোয়ালন্দ থেকে ষ্টীমারে চাঁদপুর। দিদিমাতো রীতিমত কান্নাকাটি করতে করতে চলেছেন। আমিও বেশ কিছু বিচলিত। তাছাড়া ওভাবে মেয়ে কামরায় বন্দী হয়ে কষ্ট করে ট্রেন ষ্টীমারে যাতায়াতে অভ্যস্তও ছিলুম না কখনো। বিকেল প্রায় শেষ হয়েছে সন্ধ্যা হব হব এমন সময় ষ্টীমার পৌছল চাঁদপুরে। যাঁরা ষ্টীমারে যাতায়াত করেছেন তাঁরা জানেন ঐ ষ্টীমার ঘাটে লাগার আগেই একটি ছোট নৌকায় চেপে কুলির দল ষ্টীমারে এসে ওঠে এবং নির্ব্বিবাদে যা সামনে পায় মালপত্র টেনে নিয়ে নেবে যায়। তখন নিজের জিনিষ সামলানো এক দায়। আর তাদের সেই বিচিত্র কোলাহল ও 'মুনিভাই মুনিভাই ভাইয়াহো' রবে গগন বিদীর্ণ হবার জোগাড়।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীর মন নিয়ে ষ্টীমারের বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। এখনও দু দুবার ট্রেণ বদল বাকি। একবার চাঁদপুরে একবার লাকসামে। এমন

সময় সব কলরোল ছাপিয়ে বাবার গলা কানে এল পুষ পুষ পুষ পুষ সামনে চেয়ে দেখি জেটিতে দাঁড়িয়ে বাবা টুপী নাড়ছেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ পরণে নেভিব্লু সার্জের স্যুট্ অতলোকের মাঝে তাঁকে চিনতে তিলমাত্র বিলম্ব হল না— মেসোমশাইকে বল্লুম ঐতো বাবা এসেছেন এখনও সে আগ্রহ ভরা স্বর আমার কাণে বাজছে।

কত অফিসারদের দেখেছি নিজেরা ছুটি হলেই বাইরে যাবেন ভালো হোটেলে থাকবেন। ট্রেণে যাতায়াতের সময় নিজেরা যাবেন ফার্ষ্ট ক্লাসে স্ত্রী পুত্রর বেলা ইণ্টার ক্লাস। বাবার ঠিক ছিল তার বিপরীত। আমাদের অসুখে ভালো নার্স আমাদের চেঞ্জে যাবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাবস্থা আমাদের চিকিৎসায় আসতো শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অথচ নিজের বেলা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

নিজেদের আত্মীয় বন্ধুর মধ্যেও দেখেছি বাপ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন মস্ত বাড়ী গাড়ী নিজে সসম্মানে আরামে আছেন কিন্তু পরে সন্তানদের ভবিষ্যৎ তাঁরা ভাবেন নি। সে সব বাপেরা ছেলেদের কাছে পায় প্রচুর সম্মান কিন্তু এইসব দেব দুর্লভ বাপের মনের মূল্য দেয় কজন সন্তানে? বাবার মুখেই শুনেছি যেখানে অফিস যাবার গাড়ীর মাসের ভাড়া ৫৲ টাকা সেখানে খাবার পর দুমাইল সাইকেলে অফিস করে দিয়েছেন ঐ টাকায় হাজার টাকা ইনসিওরের প্রিমিয়াম। তাই আজ এত দান ধ্যানের পরও দিয়ে গেছেন প্রতি ছেলেকে ৫০।৬০ হাজার টাকা—কিন্তু তিনি কি কষ্টই না পেয়ে গেলেন—তাঁরই প্রাসাদোপম বাড়ী তাঁরই মটোর বদলে মটোরে সন্তান ভোগ কচ্ছে। বাপ তখন পথে পথে ট্রামে রিকসায় ঘুরে পর গৃহে প্রাণত্যাগ করলেন—এইতো জগৎ!

কত দীর্ঘ পথ টুরে গেছি তাঁর সঙ্গে কখনো মোটর কখনো গরুর গাড়ী কখনো পাল্কি কখনো হাতি কখনো নৌকো কি বৈচিত্র্যময় আনন্দমুখর সে সব দিনের স্মৃতি। কত নতুন নতুন খেলার যে সৃষ্টি হোত এখন ভাবলে হাসি পায় টেণে উঠলেই বসে যেতুম কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখতে হবে ষ্টেশানের নাম, একটি বাদ পড়লেই যেন মহাবিপদ। কখনো কখনো এক একটা আদ্যাক্ষর ধরে নানাবিধ শব্দ রচনা। শিক্ষার মধ্যে ছিল আনন্দের প্রাচুর্য্য। যখন কলকাতায় থাকতুম আমরা খুড়তুত ভাইবোনে মিলে প্রায় ১৫।১৬ জন সবাই মিলে কখনো স্তবপাঠ, কখনো আবৃত্তি প্রতিযোগিতা কখনো বা নানা মজার কাণ্ড হোত। হয়ত একটা প্রকাণ্ড দল হোত। যার প্রথমে এক শিশু ভাইয়ের পায়ে এক জোড়া প্রকাণ্ড বুট জুতো কারুর বা মাথায় মস্ত বোম্বাই চাদরের পাগড়ি, কারুর বা পরণে একটা পাঞ্জাবী যা ফ্রকের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। আবার কোনদিন বা ঠাকুমা দুপুরে ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে খিড়কি দিয়ে তাঁর কাকার বাড়ী (নলিনীমোহন শাস্ত্রীর পিতা) বেড়াতে গেছেন এমন সময় বাবা অন্য চাবি দিয়ে ভাঁড়ার খুলে দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঠাকুমার বিকেলের জন্যে

করা যত খাবার সব নিঃশেষ। আবার যেমনি তালা বন্ধ তেমনি। বিকেলে হাঁক ডাকে সবাই ব্যাপার জানলে। তখন চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঠাকুর এসে হাজির বললো, "বড়দাদাবাবু আমায় বাড়ী থাকতে বলেছিলেন বিকেলে নাকি আবার জলখাবার হবে ছেলেদের।" বলা বাহুল্য বাবাকে তখন বাড়ীতে পাওয়া গেল না। ঠাকুমা 'জানি সুকুর কাণ্ড' বলে ঠাকুরকে ঘি ময়দা বার করতে বললেন।

শত দুঃখের মধ্যে আনন্দ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। আমরা যখন তাঁর সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরেছি তখন যানবাহনের অসুবিধে ছিল যথেষ্টই। তবু সে সব দিনের আনন্দোজ্জ্বল স্মৃতি আজো মনের মধ্যে অম্লান হয়ে আছে। পাবনা থেকে আসছি কলকাতা, পাবনা থেকে সাঁড়া দীর্ঘপথ ঘোড়ার গাড়ীতে আসতে হবে; পথে ডাক বসান আছে অর্থাৎ খানিক দূরে দূরে ঘোড়া বদলান হবে। ঐ দীর্ঘপথ সেই গাড়ীর মধ্যে আসতে কখনো ক্লান্তি আসেনি কষ্ট হয়নি কি আনন্দে যে কেটেছে বলার নয়। গাড়ীতে উঠলেই আরম্ভ হোত বাবার আবৃত্তি, মন্ত্র মুগ্ধের মত আমরা চেয়ে থাকতুম তাঁর মুখের দিকে। কখনো আমাদের শুদ্ধু নিয়ে চলত কত স্তব, কত কবিতা, কত গান; ঐ দীর্ঘপথ কোথা দিয়ে যে কেটে যেত আমরা টেরও পেতাম না। সব চেয়ে বেশী ভাল লাগার কারণ ছিল অতটা সময় বাবার সঙ্গলাভ। যা বড় বেশী আমাদের ভাগ্যে জুটত না। যখন যে দেশে বাবা থাকতেন সব রকমে তিনি থাকতেন মিশিয়ে। স্কুল জেল হাঁসপাতাল কোথাও তাঁর কাজের যেন শেষ ছিল না। ওরকম প্রাণ প্রাচুর্য্য সত্যি সত্যিই দেখা যায় না। ঐ পথের মধ্যে খাওয়ারও ছিল রকমারি। কড়াই শুঁটি কাঁচা ছোলা ছাড়াতে ছাড়াতে কখনো কমলালেবু ভুট্টাপোড়া, নানাবিধ উপকরণ।

আমরা শিশুকালে তো বটেই তারপর আমারি মেয়েরা তারপর তাদের ছেলেমেয়েরা যে বাবাকে পেলে কী খুসী হোত ও কী ভালবাসত তা বলার নয়। ছোট ছেলেদের সঙ্গে শিশুর মত প্রাণ খুলে তিনি মিশে যেতেন। আমার ছোট মেয়েটি বরাবরই উঠতে বেলা করে। কিন্তু বাবার কাছে থাকতে রোজ বাবার মুখে শুকতারার আর একটা নাম পথহারা তারা এইসব গল্প শোনার লোভে শেষ রাত্রে উঠে সে বাবার সঙ্গে ছাদে বেড়াত। কোন দিন শুনতো সূর্য্যোদয়ের লাল টুকটুক রং-এর জন্মকাহিনী।

এই শেষ স্মরণীয় ডিসেম্বরে বাবার প্রথম 'অ্যাটাকের' পর আমার দৌহিত্র কমলেশের জন্মতিথি উৎসব বাবারই আগ্রহে মিহিজামে হয়। বাবা ঐদিন বলেন, "আজ আমার দুটি নিমন্ত্রিত আছে।" মালী হারার শিশু পুত্র ও কন্যা দুটি ছিল বাবার নিমন্ত্রিত। এমনি করে তিনি দিয়ে গেছেন সকলকে তাঁর হৃদয়ের স্নেহ অমৃতের ধারায় ভরিয়ে। না চেয়ে পাওয়া বিধাতার

আশীর্ব্বাদ জল হাওয়ার মত ছিল তাঁর অপরিমেয় স্নেহের প্রাচুর্য্য যা সহজপ্রাপ্য বোলে বুঝতে পারি না যে কতটা পাচ্ছি কিন্তু না পেলে এক মুহূর্ত্তে হাঁফিয়ে উঠি।

না চাইতে পাওয়া জল আলো হাওয়া সহজপ্রাপ্য মত,
আমার জীবনে রয়েছে জড়ায়ে তাঁহারি আশীষ শত।
অক্ষম মোরা পারিনি মুছাতে রোগের যাতনা তাঁর;
মিছে আমাদের স্নেহ ভালবাসা মিছে সে অহঙ্কার।
দয়াময় তাই কোলে তুলে নেছে মুছায়ে সকল দুখ
'নাই আর তাঁর কোন যন্ত্রণা এই ভেবে বাঁধ বুক,'
এ সব কথায় তৃপ্তি না পাই মনে হয় পরিহাস'
কোন যে ভাষায় বর্ণিব সেই বেদনার ইতিহাস।
মনে তো পড়ে না কোন্ শিশুকালে তাঁহার মুখের ডাকে
মাতৃ হৃদয় উঠিল উথলি সন্তান বলি যাকে।
দেবতা বলিয়া পুজেছি যাঁহারে শ্রেষ্ঠ পুজ্য জানি
পৃথিবীতে মোর আর যা সকলি তুচ্ছ বলিয়া মানি।
অতি উক্তি এ নয়,
তোমার সাথেতে জীবনের সুখ চলে গেল নিশ্চয়।
চলে গেল মোর গৃহআনন্দ প্রাণ প্রাচুর্য্য যত
চলে গেল মোর নয়নের মণি চিরজীবনের মত
উৎসব দীপ নিভে গেল মোর কর্ম্মপ্রেরণা সবি।
কি করে বুঝাব অস্ত গিয়াছে পূর্ণ দীপ্ত রবি,
অসহায় হয়ে হেরিনু দাঁড়ায়ে চোখের সমুখে মোর
নিয়ে গেল মোর মরমের নিধি ছিঁড়িয়া মমতা ডোর।

এমন একজন মানুষকে আমরা হারিয়েছি যে যার অভাব প্রতিদিনে প্রতি মুহূর্ত্তে গভীরভাবে চিরদিন অনুভব করতে হবে। কালের প্রলেপে শুখাবার ক্ষত এ নয়।

আমরা তাঁর সন্তান আমরা মনে কর্চ্ছি আমাদের কি অভাব তা কেউ বুঝবে না। বাবা সকলেরই হয় কিন্তু অমন বাবা কারুর হয় না।

জামাতা ও পুত্র বধূদ্বয় সত্যই পিতৃহারা হইয়াছে, তাঁকে তারা পিতার সমানই জানিত। পিতার অধিক স্নেহ তারা তাঁর নিকট পেয়েছে।

আমাদের সন্তানরা বলছে মাতামহ অনেকেরই হয় কিন্তু এ অভাব, এ শূন্যতা কতখানি তা কেউ বুঝিবে না। এত স্নেহ, এত শিক্ষা ও আনন্দময় পরিবেশ আর কোন নাতিনাতনী বুঝি দাদুর নিকট পায়নি। বন্ধুরা বলছেন এমন বন্ধু আর হবে না। আত্মীয়স্বজন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন বিপদের



১৯৩৮
ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারাল অব রেজিষ্ট্রেসান পদত্যাগকালিন

দিনে অমন বুক দিয়ে আর কেউ করবে না, দেশ ও দুঃস্থের তো কথাই নাই।

আমার পারিবারিক জীবনে তাঁর অভাব অপূরণীয়। কোন আনন্দ উৎসবে তাঁকে ঘিরেই সব আনন্দ আমাদের মূর্ত্ত হয়ে উঠতো। তাঁকে বাদ দিলে সবই ছিল আস্বাদহীন নিরর্থক। আজো ঝুলনের দিনে চুপি চুপি রাখী এনে আমার শিশু দৌহিত্রী গোপা বাবার ছবির কাছে গিয়ে বলেছে, "জানো বিশুকেষ্ট এইটে সবচেয়ে সুন্দর, এই রাখীটি তুমি নাও।"

আজো ভাইফোঁটার দিনে কেঁদে আমার প্রথমা কন্যা উর্ম্মিলা লেখে তাঁরই বন্দনাগীতি তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পরম সৌভাগ্যকে স্মরণ করে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে আজি চারিদিকে উঠে বাজি
শুভশঙ্খ রোল
সেই উৎসবের হাঁসি হৃদয়ে আসিল ভাসি
দিয়ে গেল দোল।
যেই দিন জন্ম লভি হেরেখেছিনু শশী রবি
মাতৃক্রোড়ে মম
তারি সাথে তব মুখ স্নেহ ভরা ওই বুক
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম।
তারপরে সুখে দুখে কাটায়েছি তব বুকে
গভীর আশ্বাসে
সেই কথা স্মরি মনে ভাই আজি ক্ষণে ক্ষণে
অশ্রু নেমে আসে।
যবে শিশু মুখে মোর কাটেনি জড়তা ঘোর
দিছি ভাই টীকা
এই শুভ দ্বিতীয়াতে তব দীপ্ত ললাটেতে
অমরতা লিখা।
যবে ছিলে দূরদেশে ছিলেনা মোদের পাশে
ভাই দ্বিতীয়াতে
তোমারে উদ্দেশ্য করি ফোঁটা দিছি মন্ত্র পড়ি
গৃহ প্রাচীরেতে।
আজিকে কোথায় তুমি কোথা সেই স্বর্ণভূমি
কোথা তব ঘর?

মোদের প্রাণের কথা জানি তার সফলতা
তুমি যে অমর।
তাই আজ শুভদিনে আমরা তিনটি বোনে
প্রণাম জানাই
লভেছিনু ভাগ্যফলে যেখানেই যাও চলে
তোমার আশীষ সদা পাই।

মেনোদিদি

বড্ড বেশী পেয়েছিলুম বলেই হারাণর গভীরতা এত বেশী করে বোধ হয়। নিজের জীবনের সকল দুঃখ তুচ্ছ করে আনন্দ ও উৎসাহের তাঁর অবধি ছিল না। আমাদের মুখ চেয়েই তিনি বেঁচে ছিলেন। অমন স্নেহ অমন ক্ষমা যাঁর মধ্যে তিনি কি নিজের ইচ্ছেয় আমাদের ছেড়ে যাবেন, তা ভাবাও যায় না। আমাদের কোন আনন্দে তাঁর আনন্দ হোত শতগুণ বেশী, এত ভালবাসতে পারে কি কেউ, না জগতে এমন কিছু আছে যা এ ভালোবাসার চেয়ে বড়। শেষমুহূর্ত্তের কথা মনে হলে মনে হয় বুকের কলকব্জা যেন বন্ধ হয়ে গেল। মনে হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটাও কেন ধ্বংস হয়ে গেল না। তিনি যদি না মরে পারতেন কিছুতেই মরতেন না, শুধু দেশের কাজ করার জন্যেই যে কোন রকমে বেঁচে থাকতেন। তাঁরি সন্তান তাঁকে বাঁচতে দিল না, অমন যে স্নেহশীল বাপ তাঁকে সইতে পারল না, জানিনা সে মন কেমন। বাড়ীতে কারুর সর্দ্দি হলে সঙ্গে সঙ্গে বড় ডাক্তার এনেছেন। পয়সা অনেকেই রোজগার করে, কিন্তু বাবার মত হৃদয় হয় কজনের? কী সুখে কী যত্নে যে তিনি আমাদের রেখেছিলেন বাকি জীবনটা কাটবে শুধু তাই একটু একটু করে বুঝতে। তাঁর একটা ধারণা ছিল যত বেশী খরচ হবে রোগ সারার সম্ভাবনাও তত বেশী। দাদার সামান্য টনসিল অপারেশনের সময় কি অস্থির না হয়েছিলেন। বৌদির অপারেশনে অধীর হয়েছিলেন শিশুর মত। আমাদের ইনজেকসান দিলে ঘর থেকে চলে যেতেন। সইতে পারতেন না আমাদের গায়ে সামান্য ছুঁচ ফুটানো। মিহিজামে না গেলে বাবার এ অসুখ বাড়তে পেত না বলায় বলেছিলেন, "তুই যে বাঁচতিস না পুষ্প।"

জীবনের সব আনন্দ সকলকে বিতরণের মধ্যে তাঁর ছিল গভীর আনন্দ। ভোরবেলা তাঁর মধুর গম্ভীর কণ্ঠের বিশুদ্ধ উচ্চারিত স্তব স্তুতি গৃহের প্রতিটি প্রাণীর ও প্রতিবেশীর সদ্য জাগ্রত মনকে দেবতার আশীর্ব্বাদের নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র রসে ভরিয়ে দিত। সত্য ও সুন্দরের মঙ্গল বিধান শান্তচিত্তে বহন করার মত শক্তি পেতো দুর্ব্বল মন। এমনি করে অসত্য অশিবকে তিনি সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে গেছেন সকলের কাছ থেকে। আগে

মনে হত বাবা মানুষ চিনতেন না তাই বাবাকে এত লোক দুঃখু দেয়। এখন বুঝি বাবা যা বুঝতেন তাই ঠিক। তাঁর চেয়ে বেশী আর কেউ বুঝত না। সবই বুঝতেন শুধু আমাদের মুখ চেয়েই ছিল তাঁর বাইরের আনন্দ। বাইরে অমন হৈ চৈ করলেও ভেতরটা ছিল তাঁর চাপা, কিছু বলতেন না, তাছাড়া কারো মনে কষ্ট দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সকলকে আড়াল করে রেখে নিজে যে মনে মনে কত কষ্ট পেয়েছেন তা আমি তো জানি। বাবা যদি চুপ করে এ আঘাত না সইতেন তাহলে বুঝি এ সর্ব্বনাশ হত না। তাঁর ভালবাসায় তো মেকি ছিল না। এত ভালবেসেছিলেন যে যাকে ভালবাসতেন তাদের আঘাতও বুঝি ভালবেসেই গ্রহণ কর্ত্তে যেতেন। কিন্তু এ ধৈর্য্যই হল কাল। তিনি যদি জোর করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, নিজের দাবীতে বাড়ীতে শাসন করতেন তাহলে এত অন্যায় কখনো হতে পারত না। তিনি আদর্শবাদী সত্যনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু জবরদস্তি তাঁর ধাতে ছিল না। এতটুকু নিষ্ঠুরতা তাঁকে দিয়ে হবার নয়। সেইজন্যেই সব ডুবলো।

পরেও যদি আমার কাছে থাকতে রাজী হতেন, এত কষ্ট, এত অসুবিধে তাঁর হোত না। ঐ পুত্র পুত্রবধূর কথা ভেবেই রাজী হন নি তাতে। বলেছিলেন ভুল ওরা বুঝবেই, অনুতপ্ত হবেই, তখন তাদের সারাজীবনের জন্য কেন থাকবে এ লজ্জাকর ঘটনা, হায়রে পিতৃস্নেহ!

জীবনে প্রলয়

পিতৃদেব কর্ত্তব্যে ত্রুটি এত লজ্জাজনক মনে করতেন যে সন্তানের ঐ গভীর অপরাধের কথা কারুকে বলতে তাঁর কুণ্ঠার সীমা ছিল না। যে কারণ নিজ গৃহ ছাড়ার পর প্রায় দেড় বৎসরকাল অবধি তাঁর গৃহত্যাগের কারণ আমাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল ঐ দুঃখস্মৃতিময় রাত্রেই বাবার বুকে ও মাথায় খুব কষ্ট হয়। সকালে ডাঃ ভৌমিক দেখেন যে হঠাৎ ব্লাডপ্রেসার ভীষণ বেড়ে গেছে। কোন আকস্মিক কারণ হয়েছে কিনা ভৌমিক জানতে চাওয়ায় তাঁকে বাবা ঐ ঘটনা বলেন। পরে শ্রদ্ধেয় গুরুদাস সরকারের জামাতা বিয়োগে সান্ত্বনা দেবার সময় বলেন, "আমারও সম্প্রতি সন্তান শোক হয়েছে" এবং এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর জেনেছি যশোহরের স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ার ক্ষিতি নাথ ঘোষ, বহরমপুরের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও রায়বাহাদুর অতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এঁরা বাবার নিজের মুখ থেকেই ঐ ঘটনা শুনেছিলেন।

আমরা কেউই তখন জানতুম না। ঐ মর্ম্মান্তিক দুঃখ মনের মধ্যে চেপে রাখাতেই এই হঠাৎ ব্লাডপ্রেসার ও কঠিন হৃদরোগের সূচনা হয় বলে

ডাক্তাররা বলেন। কেন ঐ কথা আমাদের বলেন নি এ অনুযোগ করায় বাবা বলেছিলেন একথা কারুকে বলার মত কথা নয়।

ঐ নিদারুণ ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের ডায়রীতে বাবা শুধু লিখেছেন :—

"Catastrophe."

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা কবিতাটি উদ্ধৃত করলুম।

শুভশঙ্খ রবে
চির আশা চির স্বপ্ন শিশুরূপে জন্ম লয় যবে
মা বাপের কি আনন্দ, কত না পুলক।

চোখে জাগে নব দীপ্তি নূতন আলোক
সে আলোয় তারা দেখে কি বিচিত্র
ভবিষ্যৎ চিত্র।
দেখে এই শিশু এতটুকু, মুখে নেই ভাষা
অফুরন্ত আশা।
তারি পরে এই শিশু বড় হবে কবে
মহিমাগরবে।
বয়েসেই বড় নয় বড় মনে প্রাণে
খেলা ধূলা লেখাপড়া কত কি যে জানে।

উজ্জ্বল করিবে কুল খ্যাতি যশ মানে
মা বাপ দেখিছে চিন্তা ধ্যানে,
কিশোর তরুণ হবে, ঘরে আনি বধু
সংসার গড়িয়া দিবে মধু।

যা কিছু চেয়েছে দোঁহে দোঁহাকার লাগি
শিশুরে তা দিতে চায় হয়ে সর্ব্বত্যাগী।
একটি কামনা এই লক্ষ লক্ষ ঘরে
ছেলে হোক সর্ব্বজয়ী সকল অন্তরে
এ কামনা কিসে পূর্ণ হয়
মা বাপের কত আশা ভয়।
ভুলে যায় নিজেদের ভুলে যায় দুঃখ সুখ
ভুলে যায় চেয়ে পুত্র মুখ।

ছেলে যাতে ভালো থাকে ছেলে হয় ভালো
ছেলে দুই নয়নের আলো।

কিন্তু হায় কজনের অন্তরের সাধ পূর্ণ হয় ?
শতেক প্রমাদ
শত বিঘ্ন শত বাধা ক্রূর অস্ত্র দিয়া
চূর্ণ করে মা বাপের হিয়া
এ দুর্ভাগ্য কতখানি সে মা বাপ জানে
ছেলে যার লজ্জা আর গ্লানি বয়ে আনে
সংসার অরণ্য হয় মিথ্যা জন্মগ্রহ
মা বাপের জীবন দুঃসহ।

নিজের প্রতি অন্যায় ও অবিচার যত কষ্টকরই হোক না কেন তিনি তাতে দৃকপাত করেন নি। কিন্তু অপরের প্রতি অন্যায় কখনো সহ্য করেন নি। এই কারণে নিজে বালিগঞ্জ প্লেস ছেড়ে আসার পরও আমার ছোট ভাই সুধীরকে সেখানেই রেখে আসেন। এতে বাবার এক বন্ধু আপত্তি জানাতে বাবা তাঁকে বলেন 'আমার আর জীবনের ক'দিন বাকি ? ওরা আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে তা প্রকাশ করলে শ্বশুর আর অগ্রজের ও ভ্রাতৃবধূর ওপর শ্রদ্ধা রাখা সম্ভব হবে না। আমার সৌভাগ্য যে সেদিন অক্ষয় ওখানে উপস্থিত ছিলনা, নইলে একটি অপ্রিয় কাণ্ড নিশ্চয়ই হোত।'

পূর্ব্বেই বলেছি বাবার মনস্তত্ত্ব সাধারণের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এই-জন্যই নিজের জোর কারুর ওপর কখনো খাটান নি। মানুষ মাত্রেরই যে মানুষের প্রতি প্রচুর কর্ত্তব্য একথা তিনি মনে প্রাণে জানতেন। এবং যেখানে অন্তরের যোগ নেই সেখানে আইনেই দাবী নিয়ে বা সামাজিক দাবী নিয়ে শাসন করে দাবী জানানকে তিনি ঘৃণা করতেন। এই কারণেই সন্তানের অতবড় অবিচার নীরবে মেনে নিয়ে তিনি নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে আসেন। আঘাতে দুঃখে ঘৃণায় মনস্তাপে ঐ দীর্ঘ দু বৎসরের মধ্যে ও পাড়ায় পর্য্যন্ত আর যান নি। নিজ বাপ মার প্রতি বাবার মনোভাব ছিল গৃহ বিগ্রহর মত, সেজন্যই সন্তানের ঐ নির্ম্মম ব্যবহার তাঁকে অত আঘাত দিয়েছিল। নিজের বাড়ী ছাড়া হয়ে তাঁর সবচেয়ে দুর্ভাবনা হয়েছিল অপ্রকৃতিস্থা স্ত্রীকে নিয়ে। নিজে যদি বা এজমালি বাড়ীর একটি ঘরে উঠলেন কিন্তু তারপরই দাদা যখন মাকেও বাড়ী থেকে এনে সেখানে দিয়ে গেল তখন বাবা সত্যিই বিপদগ্রস্ত হলেন। পেনসন কমিউট করে সামান্য আয়ে দানধ্যান বজায় রেখে নিজের চলাই দায়, তার ওপর স্ত্রীকে রাখেন কোথায় ? তবুও কারুর প্রতি তাঁর কর্ত্তব্যে কখনো ত্রুটি হয় নি। ঐ অবস্থায়ও স্ত্রীকে মেণ্টাল হসপিটালে মাসে ৩০০৲ টাকা করে দিয়ে রেখেছিলেন। স্ত্রীর প্রতি কোনদিন তাঁর কর্ত্তব্যে ত্রুটি ছিল না। যতদিন নিজের ক্ষমতায় কুলিয়েছে সমস্ত ঝঞ্ঝাট

বহন করে নিজে রেখেছিলেন এবং পুত্রবধূ গৃহিণী হয়ে যখনই বিরক্তি জানিয়েছে তখনই এর আগেও বহুদিন ধরে, মাকে হসপিটালে রেখেছিলেন কিন্তু তাতে খরচ হত অনেক। তাতেও পুত্রের কাছে অপরাধী হয়েছেন। আমার মেজকাকীমা এবিষয় বলেন "কতদিন সুশীলকে বলতে শুনেছি আপনিতো সব মার ওপরেই খরচ করলেন আমাদের জন্য রাখলেন কি? শুনেতো আমি অবাক, আমরা বনেদী জমিদার বাড়ীর মেয়ে শুনেছি কত বাপ পিতামহর সম্পত্তি লোকে নেশায় মেয়েমানুষে উড়িয়ে দিচ্ছে, এতো নিজের রোজগার করা পয়সা নিজের স্ত্রীর ওপর খরচ করছেন এতে ছেলে কৈফিয়ৎ চায় কোনমুখে? অত স্নেহময় ছিলেন বলেই না ছেলের অত সাহস? শেষাশেষি দেখতুম বটঠাকুরের এমন একটা ভাব যেন জীবনটা বোঝা হয়ে পড়েছে নিজের বাঁচাটাই যেন অপরাধ কি করা যাবে বাঁচতে হচ্ছে তাই বাঁচা এমনি একটা ভাব।"

তাঁর স্ত্রী তাঁর পুত্র তাঁর কন্যা তাঁর দেশ তাঁর দেশবাসী সকলের দায়ই তিনি নিজের বলে জানতেন কারুর জন্য কারুকে দায়ী করতেন না।

অসুখের মধ্যেও ঐ দুঃখময় ঘটনার স্মৃতি অহরহ তাঁর মনের মধ্যে ছিল। অসুখের মধ্যে একদিন বলেন যখন সুশীল বিপিন পাল রোডে ছিল তখন সে বাড়ী থেকে অক্ষয় হরিশ মুখার্জীর রোডে চলে যাওয়ায় আমি অক্ষয়কে বকেছিলুম। তাতে অক্ষয় বলেছিল ওঁদের ব্যবহার অত্যন্ত 'স্নেহহীন' আর খাওয়া'তো আমায় বাইরেই সারতে হয় কারণ অত ডার্টি খাবার কেউ খেতে পারে না। সেদিন সে কথার উত্তরে আমি তাকে ধমক দিয়ে বলি হোটেলে খেতে পার অথচ বাড়ীতে এমন কি ডার্টি খাবার দেয় যা খেতে পার না? সেদিন সে আমার এ কথার উত্তর দিতে পারে নি, কিন্তু পরে বালিগঞ্জ প্লেসে বৌমার ব্যবহারে অক্ষযের ঐ কথায় সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। ঐ গৃহত্যাগের পর হরিশ মুখার্জীর রোডে বাবার কঠিন নিমোনিয়া হয়, ঐ সময় সামনে প্রমথ ব্যানার্জীর বাড়ী প্রায়ই বৌদি বেড়াতে আসতেন সঙ্গে পুতুল-বাবলু থাকতো অথচ তার সামনের বাড়ীতেই যে স্নেহকাতর বৃদ্ধ ঐ কচিমুখ দুটি দেখার আশায় আশাপথ চেয়ে শুয়ে থাকতেন তাঁর কথা কারুর স্মরণে আসেনি।

ঐ সময় বাবা হিন্দু মহাসভার কাজ করতেন ও ঐ অসুখের জন্য দীর্ঘদিন তাঁকে ছুটী নিতে হয়েছিল। বাবার জ্যেষ্ঠ বৈবাহিক হিন্দুমহাসভার তখন সেক্রেটারী ছিলেন কাজেই বাবা ভেবেছিলেন তাঁর অসুখের খবর পেয়ে নিশ্চয়ই তিনি বাবাকে দেখতে আসবেন এবং কন্যা জামাতাঁর ত্রুটী সংশোধন করে পৌত্র পৌত্রী ও পুত্রবধূকে বাবার কাছে এনে দেবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে তিনি বা তাঁর ছয় ছেলের কেউই একবারও বাবাকে দেখতে আসেন নি।

এরপর নিজের দুঃখ ভুলতে বাবা নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই আরো বেশী করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময়ে একবেলা হরিশ মুখার্জীর রোডে ও একবেলা আমার কাছে খেতেন দুজায়গাতেই খাইখরচ বলে টাকা দিতেন যথেষ্টই কিন্তু জলখাবারের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। এই শেষ বয়সে ওই বিড়ম্বিত জীবন-যাপনই তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

বালিগঞ্জ প্রেস থেকে চলে আসার পর তাঁকে আমার কাছে থাকার জন্য বাবার বন্ধুরা, এবং আমার মেজভাই অনেক অনুরোধ করে বিলেত থেকে চিঠি লেখে। কিন্তু পাছে আমার কাছে থাকলে পুত্র-পুত্রবধূর লজ্জাজনক কাহিনী আরো সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ কারণে বাবা কিছুতেই থাকতে রাজী হন নি। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে তারা অনুতপ্ত হবেই। এ কারণ মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বেও আমার মধ্যম ভ্রাতৃবধূ বীণাকে দিয়ে লেখান সুশীলরা অনুতপ্ত হলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না।

দেশের কাজে পল্লী অঞ্চলে থাকার আর একটা গূঢ় অর্থ ছিল যে তাতে সন্তানদের গভীর অপরাধের জন্য নিজগৃহত্যাগের ঘটনাও বাইরে বেশী প্রচার হবে না। ঐ সময়ের আমার একটি কবিতা নিচে দিলুম।

গৃহত্যাগে

গভীর বেদনা গোপন আমার দারুণ মর্ম্মক্ষত
কে বুঝিবে হায় সহেছ নীরবে আঘাত যাতনা কত ?
চোখের সমুখে ভাসে সদা হায় শীর্ণ সে মুখখানি
বুকভরা তার চির হাহাকার মুখে নাহি ফোটে বাণী।

লুকাবার হায় ব্যর্থ প্রয়াস তোমার ওদুটি আঁখি
অন্তরে মোর সবি এঁকে দেছে কিছুই রাখেনি বাকি।

সারাটি জীবন বহু দুখ সয়ে শ্রান্ত আজিও দেহ
জুড়াবার ঠাঁই কোথাও কি নাই সব থেকে নাই কেহ ?
সকলেরে সুখে রাখিবার লাগি জীবন দিয়াছ ঢেলে
অবিশ্রান্ত কাজ করে গেছ আপনার সুখ ফেলে
প্রতিদানে পেলে অশেষ যাতনা দণ্ড কঠোরতম
তব ব্যথাতুর আঁখি চিতার আগুন জেলে দেছে বুকে মম।

যেদিকেতে চাই আঁকা সবদিকে বিষণ্ণ মুখখানি
উদার আকাশে লেখা যেন হায় তোমারি দুখের বাণী।

সব আঘাতেতে দেবতারে স্মরি চলেছ জীবন ভরে
তাই তব দুখ দেবতার প্রতি বিদ্রোহী করে মোরে।

আজ মনে লয় ভগবান নাই পুণ্যের ফল নাই
একনিষ্ঠতা ধৈর্য্য সহ আর কতদূর চাই
সাধনায় যদি সিদ্ধি থাকিত পাষাণও যেত গলে
নিঠুর দেবতা এত কি কঠিন কিছুতেই নাহি টলে
আজিও না জানি গত জন্মের কত কি পাপের ফলে
আমার চোখের সমুখে তোমার নিঠুর পীড়ন চলে ?

হাহাকার করে মাতৃহৃদয় বুক ভাসে আঁখি নীরে
সহিবার চেয়ে বেশী হলে চলি অপর দিকেতে ফিরে।

কি আঘাত পেয়ে ঘৃণা ধিক্কারে নিজগৃহ ত্যাজি এলে
প্রতিদানে তার কণাটুকু ক্ষতি করে না আঘাত দিলে
দারুণ ব্যথায় ডায়রী পাতায় লিখেছ 'প্রলয়' খালি
কার অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করিলে জীবন ঢালি।

লিখেছ সেদিনই বুঝেছিলে নাকি পরমায়ু হল শেষ
লিখেছ পথেতে ঘুরেছ সহিয়া ভিক্ষুক সম ক্লেশ।

অটুট স্বাস্থ্য নিঃশেষ তব জরায় ঘিরেছে দেহ
সারাটা জীবন দুখ পেয়ে গেলে আহা বলেনিত কেহ।

অসহ বেদনা সহি দিবানিশি কিছু নাহি করিবার
এ মোর পরাণে ভরা আজ শুধু সুগভীর হাহাকার।

সন্তানে যদি এত ব্যথা দেবে নিঠুর নিদয় হরি
এ হৃদয়ে কেন এত স্নেহ দিলে অমিয় ধারায় ভরি

তোমার মতন পাথর করিয়া গড়েনি কেন এ মন
জীবন ভরিয়া কাঁদাবার মোরে ছিল কোন প্রয়োজন ?

এরপর বাবার মিহিজামে এই অসুখ হয়।

সেদিন বাবা বিকেল অবধি বেশ ভালোই ছিলেন। বিজয় গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিছলেন। এমন সময় বৃষ্টি আসায় আমি বাবার চাকরকে দিয়ে ছাতা পাঠাই। তাতে ফিরে এসে বলেন 'তোমার সব বিষয় অতিরিক্ত ভাবনা কি এমন বৃষ্টি হচ্ছে যে এখুনি ছাতা পাঠাতে হবে ?' তারপর আবার তক্ষুনি বেরিয়ে যান। আমার ধারণা ছিল বাবা বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। খানিক বাদে হঠাৎ 'বুলুম্ বুলুম্' বলে অতি ক্ষীণ আওয়াজ আমার কানে আসে। বাবার সম্বন্ধে আমি চিরকালই খুব সচেতন নইলে এমন ডাক চট্ করে শোনা সম্ভব নয়।

তাছাড়া বাবার মত হাঁকডাকের গলাও নয়। তখন বাইরে গিয়ে দেখি বাবা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বুলুকে দেখে বললেন 'এক গ্লাস জল দাও শরীর বড় অসুস্থ বোধ কর্চ্ছি।' পরে শুনি দ্বিতীয়বার বেড়াতে যান আমাদের পাশের বাড়ীর মন্মথ সেন মশায়ের সঙ্গে ও পথে ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের বাড়ীর সামনেই তাঁর প্রথম অ্যাটাক হয় ও সেখান থেকে অতি কষ্টে টলতে টলতে বাড়ী ফেরেন। জল খাওয়ার পর পাইখানায় যান। তখন অসম্ভব যন্ত্রণা, বুকে ডান হাতে খাল ধরছে তবুও ঘরে পাইখানা করাতে রাজী করাতে পারিনা। আমি জুতো খুলে দিতে গেলে পা টেনে নেন্ বলেন নগেনকে (চাকর) ডাকো। কপাল দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম পড়ছে। বড় টার্কিস তোয়ালে ভিজে সপসপে হয়ে গেল। ডাঃ বিজয়বাবু মিহিজামে ছিলেন না খবর পেয়ে পরেশবাবু ও শ্যামাকান্তবাবু আসেন, ও বলেন হার্ট ফেলিওর চলছে। কলকাতায় ঐ রাত্রেই টেলী করা হয় আমার স্বামী ও আমার ছোট ভাই তারপর দিন ভোরে ডাক্তার নিয়ে পৌছন। কিন্তু আমার অদৃষ্ট দোষে ভুল ডায়গোনেসিস হয় ও আমরা রোগের অত গুরু দায়িত্ব না বুঝে খানিক নিশ্চিন্ত হই। তখনও বাবা শয্যাগত হন নি।

বাবার অসুখের দ্বিতীয় অ্যাটাক হয় ১৩ই জানুয়ারী ঐদিন সকালে বাবা সুস্থ ছিলেন। দুপুর বারটায় ডাক আসে। পরেশবাবুর আদেশ মত বাবার প্রায় সব চিঠিই পড়ে বাবাকে দেয়া হত, যাতে উত্তেজনার কোন কারণ না ঘটে। আমার কপাল ক্রমে ঐ দিন ছোট কাকার একটি চিঠি নিরাপদ মনে করে আমি না পড়েই বাবার হাতে দিই। পরেশবাবুর নির্দ্দেশ মত বাবাকে রোজ চিকেণ ষ্টু দেয়া হত। হিন্দুস্থানী বামুন ওসব ছোঁবে না রান্না ঘরেও চলবে না তাই উঠোনে তোলা উনুনে আমি বা বুলু বাবার ষ্টু রাঁধতুম। রান্নার পর গিয়ে দেখি বাবা বসে প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখছেন। অমন যে সুন্দর হাতের লেখা তা কেঁপে কেঁপে এমন হয়ে গেছে যা পড়া দুঃসাধ্য। একটা খাম বুলুকে দিয়ে বাবা বলেন এটাতে তোমার ছোট দাদুর ঠিকানা লেখো। এবং আমায় বলেন আমি বড় অসুস্থ বোধ কর্চ্ছি একটু বাদে খাব। একটু পরেই দ্বিতীয় এ্যাটাক্ হয়। তখন ডাক্তারকে ঐ চিঠির কথা বলে বলেন ঐ চিঠিতে আবার বিশেষ উত্তেজনার কারণ হয়েই এই দুর্ঘটনা হল। এবং ছোট কাকাকেও ঐ চিঠির উত্তরে লেখেন এই সব আলোচনা ও লেখা লেখির ফলে আমি অসুস্থ বোধ কর্চ্ছি। পরে জেনেছিলুম এর আগেই বাবা নাকি ছোট কাকাকে লেখেন "আমার শরীরের অবস্থা ভালো নয় তোমার বৌদির ভবিষ্যতের জন্ত ভাবনা হয়" তার উত্তরে কাকা লিখেছিলেন "সুশীল বলেছে তার মাকে দেখবে" ঐ কথায় উত্তেজিত হয়ে দাদার পূর্ব্বেকার নানা প্রকার অনুচিত ব্যবহারের উল্লেখ করে বাবা লেখেন কেন তিনি দাদার প্রতি বিশ্বাস

হারিয়েছেন। দ্বিতীয়বার অসুখের খবর পেয়ে বাঁকুড়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ অনাথবন্ধু সেন মোটারযোগে বরাবর মিহিজামে যান এবং তাঁরই মুখে অসুখের গুরুত্বর বিষয় বিশদ বর্ণনা আমি পাই। এই সহৃদয় মহৎ অন্তঃকরণ ভদ্রলোকের আন্তরিকতা আমার জীবনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কলকাতায় আসার পরও ইনি বারে বারে বাবাকে দেখতে আসেন এবং বাবাকে হারানর পরও আমার পরম ও চরম দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এর পর আমি কলকাতায় টেলিগ্রাফ করি এবং এই খবর পেয়ে সকলের আগে যান আমার অগ্রজ প্রতিম ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায় ইনি বাবার জাঠতুতো বোনের ছেলে কিন্তু বাবা একে ভালো বাসতেন আমাদের সঙ্গে সমান ক'রেই। বাবার সে স্নেহ যে অপাত্রে পড়েনি ঐ বিপদের দুদিনের ব্যবহারে তা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করলুম। কলকাতায় আসার পর বাঁকুড়া থেকে কুন্তলা, বৌদিও ছেলেদের নিয়ে বাবাকে দেখতে এসেছিলেন। বাবার দুঃখময় শেষ জীবনে এদের স্নেহ মমতার ছায়ায় বড় তৃপ্তি পেয়ে গেছেন। এর জন্য এদের ঋণ আমার জীবনে শোধ হবার নয়। এর পরই পৌঁছন ছোট কাকা ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীকে নিয়ে তারপর যান আমার স্বামী ও আমার ছোট ভাই।

কিন্তু ঘটনা চক্রে অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় ও গাড়ী রিজার্ভ না পাওয়ার জন্য আরো ২০।২৫ দিন বাবাকে মিহিজামেই রাখা হয়। পিতৃদেবের অসুখের খবরে বিচলিত হয়ে আমার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ সীমা ও পিতৃদেবের বৈবাহিকদ্বয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় ও পূজনীয় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বরাবর মোটারযোগে মিহিজাম যান।

ঐ দুর্দিনে ইঁহাদের যে সহানুভূতি ও সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েছি তা চির-স্মরণীয়। ঐ সময় ওখানকার খ্যাতনামা চিকিৎসক পূজনীয় পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায় ও স্নেহময় বিজয়কান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়েরা যে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। ঐ বিদেশে এঁদের সাহায্য না পেলে কি অবস্থা যে হ'ত তা ভাবতেও পারি না। স্নেহাস্পদ শ্যামাকান্ত রায় চৌধুরী ও অজয়কান্ত রায় চৌধুরীর কথাও এই সূত্রে মনে পড়ে। দীর্ঘদিন পরিচয়ের সূত্রে ঐ পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ নিবিড়তম, তাই তাঁদের কাছ থেকে প্রচুর পাওয়াই আমার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছোটকাকা ও শ্রীমান কামাক্ষীপ্রসাদের শ্বশুর মহাশয় শ্রদ্ধেয় শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় গাড়ী রিজার্ভ হয়। শ্যামানন্দ বাবুর সঙ্গে বাবার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। বর্দ্ধমানে গেলেই বাবা ওঁদের বাড়ীতে উঠতেন। শ্যামানন্দ বাবু ও তাঁর স্ত্রীর আন্তরিক যত্ন ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আতিথেয়তার কথা

অনেকবার বাবার মুখে শুনেছি। বাবার মৃত্যুর খবরে ব্যথিত হয়ে শ্যামানন্দ বাবু কাকাকে লেখেন যে "বর্দ্ধমানে কয়েকবার তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার কাছে থাকিয়া আমায় সুখী করিয়াছিলেন সেই সময় তাঁহার নির্ম্মল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও হৃদয়ের অনেক গুণরাশির পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দিগের ভিতর তিনি রত্ন বিশেষ ছিলেন।" এই ভাবে আত্মীয় অনাত্মীয় যিনিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তিনিই তাঁর অপূর্ব্ব চরিত্রের মাধুর্য্যে তৃপ্ত হয়েছেন।

বাবার পরম স্নেহাস্পদ বন্ধুপুত্র ডাঃ কুলচন্দ্র ভৌমিকের সাহায্যেই বাবাকে কলকাতা আনা সম্ভব হয়েছিল। বাবা এই তরুণ ডাক্তারটির সুন্দর স্বভাব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিউজ্জ্বল ব্যবহারে তাকে বড় ভালো বাসতেন। তাকে বাবা স্নেহবশতঃ দ্বিতীয় বিধানরায় বলে উল্লেখ করতেন। অসুখের মধ্যে বলেছিলেন ওর হাতে মৃত্যুও আমার সুখের। শেষ মুহূর্ত্তে তাবই সামনে বাবার শেষ নিশ্বাস পড়ে। ঐ তরুণ চিকিৎসকও প্রাণপাত কবে সে নির্ভর রাখার চেষ্টা করেছিল। আমি জানি বাবাকে হারিয়ে সেও কম আঘাত পায নি। তারই অক্লান্ত পরিশ্রমেই ও চেষ্টায় যেদিন মিহিজাম থেকে বাবাকে নিয়ে আসি। সে দুর্দ্দিনের কথা জীবনে ভুলবো না।

হরিশ মুখার্জ্জীর রোডে একান্ত স্থানাভাব। বাবা থাকলেই তো আর হবে না, সেবার লোকদের কুলুনো চাই কাজেই এই ল্যান্সডাউন রোডের (যে বাসায় বিয়ে দিয়ে আমার ছোট ভাই ও ভ্রাতৃবধূকে বাবা রেখেছিলেন) বাসায় বাবাকে নিয়ে আমরা উঠলুম। ঐ বাড়ীরই এক অংশে আমায় বড় বৈবাহিক ও আমাব কন্যা জামাতা ছিলেন। ডাঃ ভৌমিক ও আমার স্বামী যেদিন মিহিজাম থেকে বাবাকে ও আমাদের আনেন তখন জানুয়ারীর ২৩ তারিখ হলেও মিহিজামে অসম্ভব শীত। এ ধারে বাবার অবস্থা দেখে তো ভৌমিকের হাত পা ঠাণ্ডা হবার যোগাড়। তবুও ভৌমিক আমার স্বামী ও আমি পরামর্শ করে স্থির করলুম যে কলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে। ঐ পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে কিছুই সহজ প্রাপ্য নয় শেষে বহু কষ্টে একটি ইনভ্যালিড চেয়ারে করে বাবাকে ষ্টেশানে আনা হল। খাট থেকে তুলে সেই চেয়ারে বসানর পরিশ্রমে বাবার যা কষ্ট হল তাতে কলকাতায় পৌছুনর আশা দুরাশায় দাঁড়ালো। ষ্টেশানের পথে কুলিরা মাত্র দুচার পা স্বায় আর বাবার কষ্ট বাড়ায় চেয়ার নামান হয়। ষ্টেশানে গিয়ে শুনলুম রাত ১০টার গাড়ী আসবে রাত ২৷৷ টেয়। এধারে ষ্টেশানেই দুবার জোর এ্যাটাক হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে ভৌমিক কোরামিন ইনজেকশান দিলো। বেশ মনে আছে বাবার অবস্থা দেখে ঐ সময় আমার স্বামী এত বিচলিত হয়েছিলেন যে ট্রেণ এসে গেল অথচ মালপত্র কিছুই তোলা হল না। এমন বিপদ, সঙ্গে সঙ্গে জোর বৃষ্টি আর কি ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া। মাঘমাসের পশ্চিমের দারুণ শীতে অমন বৃষ্টি আর

কখনো দেখিনি। ঐ অবস্থার ঘুটঘুটে অন্ধকারে রাত ২।। টেয় ঐ ছোট্ট ষ্টেশানে যে সে কী অবস্থা ভাবতে আজও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

'আম্বুলেন্সের একটি ভুলের জন্য ঐ দিন বাবার বড় কষ্ট হয়েছিল। প্লাটফরম থেকে কামরা অনেক উঁচুতে। অনেক কষ্টে চেয়ার কামরা অবধি উচু করা গেলো। কিন্তু চেয়ার কামরায় ঢোকে না। গাড়ীতে আগেই সাহায্যের লোক ওঠা উচিৎ ছিল কিন্তু তা না থাকায় বাবা যে কি কষ্টে নিজেই চেয়ার থেকে উঠে বার্থে বসেন তা বর্ণনাতীত। যাই হোক অনেক কষ্টর পরতো গাড়ী চললো। সারারাত ভৌমিক আর বুলু বাবার পা ঘসে গরম করার ব্যর্থ চেষ্টায় রাত কাটালো। এ ধারে ট্রেণ পৌছুতেও ভীষণ দেরী। যে গাড়ীর সকাল আটটায় পৌছুনর কথা তার পৌছুতে হল বেলা ১২টা। ষ্টেশানে আমার পূজনীয় কাকা বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ভাইরা শ্রীমান কামাক্ষী প্রসাদ শ্রীমান অমিয় কুমার ও শ্রীমান সুধীরকুমার উপস্থিত থাকায় অনেকটা ভরসা পাওয়া গেলো। আর ছিলেন আমার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান পতাকী চরণের দাদা শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য্য, এই প্রিয়দর্শন কর্ম্মতৎপর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছেলেটিকে বাবা বড় ভালোবাসতেন। এ ধারে বিভ্রাট, অপেক্ষা করে করে এ্যাম্বুলেন্স ফিরে গেছে। শেষে এ্যাম্বুলেন্স মিললেও ষ্ট্রেচার পাওয়া যায় না। অবশেষে শ্রীমান পরিতোষের বহু চেষ্টায় ষ্ট্রেচার জোগাড় হব। ষ্ট্রেচার আবার ট্রেণের কামরায় ঢোকে না। শেষে বহু কষ্টে জানলা দিয়ে বাবাকে ষ্ট্রেচারে করে.বের করা হয়। এদিকে অসম্ভব রোদ পরিতোষ বাবার মাথায় ছাতা ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলে। ঐ দিনে ও তার আগেও বহুদিন বাবার প্রতি ব্যবহারে শ্রীমান পরিতোষ তার যে উচ্চস্তরের কর্ত্তব্য জ্ঞান, গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছে তা আমার পক্ষে কখনো ভোলা সম্ভব নয়। পাছে এ্যাম্বুলেন্স না পাওয়া যায় এই আশঙ্কায় শ্রীমান পরিতোষ তাদের বড় বুইক গাড়ীটিও সঙ্গে নিয়ে গিছলো। যাহোক এ্যাম্বুলেন্সে ছোট কাকা, অমিয়,আমি, তপু ও ডাঃ ভৌমিক বাবাকে নিয়ে রওনা হলুম। ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে পৌছে আমার মেয়ে ঊর্মিলাকে দেখে বাবা শুধু বললেন "মেনোদিদি বড় অসুখ"। তেতলার শ্রেষ্ঠ ঘরটি বাবার জন্য গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। পরদিন থেকেই অবস্থা আরো আশঙ্কা জনক হয়।

পূজনীয় পিতৃব্য বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পিতৃবন্ধু বিনোদ বিহারী সরকার মহাশয়ের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাদি চলতে লাগলো। প্রতিপদে এঁদের পরামর্শ ব্যতীত ঐ মূল্যবান প্রাণের দায়িত্ব ও এই কঠিন রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা স্থির করা আমাদের পক্ষে আরো কঠিন হত।

এরপর ডাঃ নলিনী সেন, ডাঃ ফণী ব্রহ্মচারী, ডাঃ এডমণ্ড রোনাল্ড, ডাঃ যোগীন মিত্র প্রভৃতি অনেক বিচক্ষণ ডাক্তারই বাবাকে দেখেন। কেউই নিরাময়ের

ভরসা দেন না। তাঁর এই দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মধ্যে অদ্ভুত চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ডাঃ শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর ওষুধে বাবার বহু কষ্টের উপশম হয়েছে এবং কত যন্ত্রণার যে শান্তি পেয়েছেন তা অবর্ণনীয়। আমার ভাগ্যদোষে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বে এবং বাবার একান্ত আপত্তি সত্বেও বারবার তিনবার তাঁর হাত থেকে চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই ঠিক ভালোর মুখে।

এর পরের কাহিনী বাবার দুঃসহ রোগ যন্ত্রণায় ও অসীম ধৈর্য্যে ভরা এবং তারি সঙ্গে জড়ান আমার কত না নিস্ফল চেষ্টা কত না ত্রুটি। প্রতি মুহূর্ত্তে সশঙ্কিত হয়ে এই দীর্ঘ ছয়মাসের কোন কথাই লেখার অবকাশ পাইনি। সবশেষ হয়ে যাবার পর যা যা মনে পড়েছিল লিখে রেখেছিলুম। তাও অধিকাংশ সময়ই বাবা বলতেন দেশের কথা, পল্লোদ্ধারের কথা, সমবায়ের কথা, মিনিষ্ট্রীর কথা, যার বেশীর ভাগই ছিল আমার দুর্ব্বোধ্য। তাছাড়া দিনের বেলাই থাকতো তাঁহার জ্ঞান ওসময় আমি বড় বেশী বাবার কাছে থাকতুম না। রাত্রে অধিকাংশ সময় ডেলিরিয়াম যাচ্ছিল কখনো বা যন্ত্রনার জন্য ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত। কতদিন বাবার খাটের পাশে চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছি কপালটা বাবার খাটের পাশে ঠেকিয়ে, উঠে দেখেছি দুহাত দিয়ে আমায় মাথাটা ধরে আছেন পাছে পড়ে যাই এই ভয়ে। সকালে মোনো-বুলুরা ঘরে এলে প্রথম কথাই বলেছেন সারারাত পুষ্পটা বসে কাটিয়েছে। আমার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না।

শূন্য হৃদয় মোর — শূন্য কক্ষখানি
মনে জানি গেছ বহু দূরে
ভুলেও শুনিনা আর — তোমার গলার স্বর
সেই চির পরিচিত সুরে।
লক্ষ লোকের মাঝে — যে স্বর মেশেনি কভু
সেই স্বর ছিল বন্ধ হয়ে
উজ্জ্বল নয়ন দুটি — প্রতিভা মাধুর্য্য ময়
সেই আঁখি নিমীলিত রয়ে,
শুধু ছিল জ্ঞান টুকু — শেষের মুহূর্ত্তাবধি
আদরে ভরেছ মোরে কত
প্রতিদানে হইয়াছে — কত ত্রুটি অপরাধ
রয়ে গেল জীবনের মত
সকলি সহিতে পারি — সহিতেও হবে জানি,
তবু মন কিছুতে না মানে

পথ পরে চাই যবে মনে হয় দেখিবই
আসিতেছ চেয়ে মুখ পানে
সেই চির পরিচিত মধুর মধুর মুখ
তুলনা দিবার কিছু নাই
তাঁহারে হারায়ে ফেলে কেমনে বাঁচিয়া আছি
বিস্ময় আমার শুধু তাই
মা মা রব ছিল শুধু তবুও থাকিনি কাছে
কত কাজে গেছি তবু সরে
আজ তাই মনে পড়ে বুক মোর ফেটে যায়
অসহায় হয়ে অশ্রু ঝরে।

এই দীর্ঘ কষ্টকর অসুখে তিনি কেন কষ্ট পেয়েছেন তার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। বাবার এক মনিষী বন্ধু তাঁর এই বিষয়ক বইয়ে লিখেছেন যে যাঁদের সামান্য কর্ম্মফল বাকি থাকে তাঁদের নাকি পূনর্জ্জন্ম হয় না। শেষ ভোগটুকু এই অসুখের ভোগের মধ্যেই শেষ হয়। রোগ ভোগ এক পরম তপস্যা।

আমি এসব জটিলতত্ব বুঝি না—আমার মনের বিশ্বাস অন্য রকম। আমার মনে হয় আমাদের মনের তৃপ্তির জন্যই তাঁর এ রোগ ভোগ। নানাবিধ চিকিৎসায় যখন কণামাত্রও কষ্টের উপশম হল না তখন সত্য সত্যই মনে হয়েছিল এভাবে বেঁচে আমাদের তৃপ্তির জন্য বাবা আর কত কষ্ট সইবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে আক্ষেপ না রাখার জন্যই তাঁর এ কষ্টকর দীর্ঘ রোগ ভোগ। কখনো মনে হয় আমাকে নিজের পরমায়ু দান করে বাবা চলে গেলেন। এবার যখন আমার দুরন্ত গ্যাসট্রিক আলসার ও বিলিয়ারী কলিক আরম্ভ হল তখন অনেক ডাক্তারই হতাশ হয়েছিলেন। শেষে বাবাই আমায় জোর করে মিহিজাম পাঠান। বহু আত্মীয় স্বজনের নিষেধ আপত্তি না মেনে সে মিহিজাম যাওয়ার কথা আজও মনে পড়ে। আমার পরম স্নেহময়ী বৈবাহিকা (বুলুর শাশুড়ী মা) নিজে এসে আমায় কত বোঝান "নিজের মুখটা আরশীতে একবার দেখেছ কি? কি ভরসায় বিদেশে যাবে?" আমার স্বামীকে ভৎর্সনা করে বলেন এমন রুগীকে কখনো কলকাতা ছেড়ে বিদেশে নিয়ে যেতে আছে?" কোন রকমে ষ্ট্রেচারে করে আমায় তো নিয়ে গেল, আর বাবার সে কী উদ্বেগ? গত পুজোর সময় কাজের জন্য বাবা বাঁকুড়ায় ছিলেন। একদিন চিঠি দেরী হলেই এসে হাজির হত টেলিগ্রাফ। তারপর যেদিন বাবা মিহিজামে যান অর্থাৎ যার পরদিনই হয় এই কঠিন রোগ তারপরও বাবার অজস্র বন্ধু ও সহকর্মীর চিঠি এসেছে, সেই এক প্রশ্ন যে আপনার মেয়ে কেমন

আছে। এর আগেও আর একবার গ্যাসট্রিক আলসার আমার হয়েছিল। সারার পর বরাবরই খুব সাবধানে থেকেছি তবুও প্রায়ই কিছু না কিছু উৎপাৎ কষ্ট দিয়েইছে। এবার বিশেষ করে বাবা চলে যাবার পর যেন সব রোগ নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে শরীর থেকে। অথচ এবার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না।

মনে পড়ে ছোটবেলায় পড়া ইতিহাসের কল্পা। কেমন করে বাবর হুমায়ুনকে তাঁর পরমায়ু দান করেছিলেন। মনে আছে তখন বাবা পাবনায় পোষ্টেড বাইরের বারন্দায় তক্তাপোষে বসে আমি পড়ছি সবে মাষ্টারমশাই চলে গেলেন। এমন সময় বাবা ফিরলেন কোথায় টুর সেরে। গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে বই হাতেই ছুটলুম বাবার কাছে। বাবা মণিব্যাগ খুলে দুটি ছোট্ট ছোট্ট কাঁচা আম বের করে আমার হাতে দিতেই জিজ্ঞেস কর্লুম 'হ্যাঁ বাবা এই যে বইয়ে লিখেছে বাবর হুমায়ুনকে তাঁর নিজের জীবন দিয়েছিলেন একি সত্যি?' এর উত্তরে বাবা বলেছিলেন 'সত্যি বৈকি নিশ্চয়ই সত্যি।' বাবা বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন আমি সেই বাঁধানো পেয়ারা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে মনের মধ্যে কতনা অতীত ইতিহাসের সুন্দর স্বপ্নজালই রচনা করেছিলুম।

বাবার কাছে অপরিমেয় যে স্নেহ আমরা পেয়েছি তাতে ও গল্পে অবিশ্বাস আসার কারণ ছিল না।

মনে পড়ে একবার যখন আমার মেজভাই অক্ষয়ের ডাক্তাররা প্লুরেসী আশঙ্কা করেছিলেন, তখন কল্পনা প্রবণ অনেক নিকটতম আত্মীয় আত্মীয়ারা ভেবে সারা হয়েছিলেন যদি ঐ থেকে টি বি দাঁড়ায় তখন কে থাকবে ঐ ছোঁয়াছে রোগ নিয়ে। কথাটা বাবার কানে ওঠায় বলেন "কেন আমিতো বেঁচে আছি এখনো।"

জীবনে কোন কাজে ও কথায় তাঁর পার্থক্য ছিল না। নিজের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে দেখিয়ে গেছেন তাঁর মহান আদর্শ। তাঁর নিজের জন্য কারুকে কষ্ট দিতে কারুকে বিব্রত কর্ত্তে তাঁর বড় কষ্ট হত। তাই যেদিন মারা গেলেন সেদিন কারুর বিশ্রামটুকু অবধি নষ্ট করলেন না। রবিবার, দিনের বেলা খাওয়া দাওয়া সেরে ঝি চাকর অবধি বিশ্রাম করে উঠেছে এমনি সময় বেলা তিনটের সময় হল তাঁর অন্তিম সময়। ছুটীর দিন কাজেই কারুর হল না কর্ত্তব্যে বাধা বা কাজে কোন অসুবিধে।

এর পরের ঘটনা আরো আশ্চর্য্য সে তাঁর মহাপ্রস্থানের। যে মানুষের জন্য শিশু জীবন থেকে আমার ভাবনার অন্ত ছিল না সেই মানুষ যখন সত্যি সত্যি শিশুর মত হয়ে শেষ ছমাস ছিলেন, আমার তখনকার মনের অবস্থা বলে বোঝানর নয়। আহার বিশ্রাম সবের মধ্যে তাঁর চিন্তা ছাড়া অন্য কিছুইতো ছিল না। সেই মানুষ যখন চলে গেলেন তারপর একদিনের জন্যেও আর তাঁকে

স্বপ্নের মধ্যেও দেখলুম না। মনে হল না আচমকা কোন একদিন তাঁর ডাক শুনতে পেলুম। একী চলে যাওয়া? যখন চলে গেলেন সত্যিই গেলেন পেছন ফিরে আর তাকালেন না। তাঁর কথায় আর কাজেতো কোন পার্থক্য ছিল না।

তাঁকে হারিয়ে সব চেয়ে কষ্ট হত বারন্দায় দাঁড়ালে। মনে হত এখুনি বুঝি দেখতে পাব সেই প্রিয় পরিচিত মূর্ত্তি পথের মোড় থেকে। দীর্ঘ ঋজু সবলদেহ দৃঢ় পদক্ষেপ কী তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী সে উজ্জ্বল চোখ।

মনে হত সেই পূত নয়নের দৃষ্টি ধারায় ধুয়ে
নির্ম্মল হল দেহ মন মোর ও চরণ দুটি ছুঁয়ে।

তাঁর সজীব কণ্ঠস্বর সুন্দর সাবলীল স্বচ্ছন্দ চলায় তো কারুর সঙ্গে সাদৃশ্য হওয়া সম্ভব নয়? কাজেই কোথাও খুঁজে পাই না তাঁর কণাও তুলনা। শুধু এই আক্ষেপ আমার আজীবন থাকবে যে সুযোগ পেয়েও তাঁর সেবা করার সামর্থ্য আমার ছিল না। শরীরে যদি এখনের মত শক্তি পেতুম তাহলে প্রাণভরে সেবা করে মনের এ দুঃখ খানিক লাঘব হত। বিশেষ করে শেষের তিনচার দিন আমি বাবার কাছে থাকতেই পারিনি। যখন থেকে তাঁর নিজের কিছু বলার সামর্থ্য রইলো না তখন থেকে বাইরের লোকের হাতে তাঁকে মুহূর্ত্তের জন্য দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। দিনে বীণা মোনোবুলু থাকতো—ও রাত্রে থাকতুম আমি। প্রায় এক সপ্তাহ এইভাবে অবিশ্রান্ত রাত জাগার ফলে আমার সেই পুরনো রোগ আবার দেখা দিল।

একভাবে বসে মনে হত পাঁজরার তলায় যেন পাকা ফোড়ার মত ব্যথা। পাছে এই দুর্দ্দিনে আমায় নিয়ে সবাইকে বিব্রত হয়ে হয় এই আশঙ্কায় জোর করেই আমি দুতিন দিন অন্য ঘরে ছিলুম। এই সময় পর পর তিন চার রাত আমার ছোট ভাই সুধীরের একা অক্লান্ত সেবার কথা বলে শেষ করার নয়। সমস্তদিন সেই সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা অবধি অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর কি করে যে সে অমনভাবে সেবা করতে পারতো তা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। কতদিন এমন হয়েছে যে রাতে পালা করে ভাইবোনে থেকেছি বাবার কাছে। রাত হয়তো দুটোর পর আমার পালা, ঘুমিয়ে পড়েছি উঠে ধড়মড় করে ছুটে গেছি বাবার ঘরে, তখন সকাল হয়ে গেছে। সমস্ত রাত পুরো ঘুমিয়েছি গিয়ে দেখি খতু সেই একভাবেই বাবার কাজ করে যাচ্ছে। যেই বলেছি কী কাণ্ড ডাকিসনি কেন আমায়? সেই শান্ত মুখে শুধু ফুটে উঠতো একটু কুণ্ঠা ভরা হাসি। তার প্রীতি ব্যবহারে মনে হত বাবার প্রতি যা কিছু কর্ত্তব্য সব তারই একার—। আমরা যে যা কর্চ্ছি তার জন্য যেন তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আর কি আদর করে যে বাবাকে কথা বলতো সে যে না শুনেছে তার বোঝা সম্ভব নয়। বাবার শেষ কটি দিনের স্মৃতিতে খতু বীণা বুলুর সেবা অবর্ণনীয়।



ডেপুটী ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার—১৯৪৪

এ সময়ে বুলুর ধৈর্য্য দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকতো না। ঐ দিনে বড় বেশী করে অনুভব করেছি আমার মেজ ভাই অক্ষয়ের অভাব যে ছেলে পাড়ার লোকের কঠিন দুরন্ত রোগে সেবা করে বেড়িয়েছে তারই বাপের হল সেবার অভাব—এখন মনে হয় আরো অনেক আগে তাকে টেলিগ্রাফ করা উচিৎ ছিল। অনেকে আমায় ভোলান ওরকম কঠিনরোগে বাঙ্গালীর বাড়ী এমন সেবা নাকি হয় না কিন্তু আমি আমার নিজের ক্ষমা পাই না। আমার জীবনে এ ক্রটী অপূরণীয়

"জানি তুমি ক্ষমিয়াছ তনয়ার অপরাধ
তবু মনে শান্তি নাহি পাই।
যেদিকে ফিরাই আঁখি জলন্ত অক্ষরে লেখা
সবি শূন্য বাবা মোর নাই
সে দুটি আখরে লেখা কি গভীর শূন্যতা
পূর্ণ হবার কভু নহে
তুমি কি দেখিছ আজ তোমারি তরেতে মোর
দুনয়নে অশ্রুধারা বহে?
সহিতে পারনি তুমি ক্ষণিক এ মুখম্লান
আজ তুমি স্থির কেন এত
কেহ কি ডাকিল আজ কঠিন কর্ত্তব্য তরে
ভুলি মোরে সেই ব্রতে রত?
জানি আমি চিরদিন তোমারও দেহখানি
ছিল শুধু মমতায় গড়া—.
পুষ্পকোমল হৃদি নবনীত কম সে যে
স্নেহ মায়া ভালোবাসা ভরা।
শত দুখ সহিয়াছি চেয়ে ওই মুখপানে
আজ মিছে চারিদিকে চাই
সুশীতল ছায়া দিতে স্নিগ্ধ করিতে দেহ
দেখি আর কেহ কোথা নাই।
তোমারি সাথেতে পিতা হারায়ে ফেলেছি আমি
মোর দুই নয়নের আলো
নাহি আশা নাহি ভাষা বেদনা ঝঞ্ঝা শুধু
চারিধারে শুধু ধুধু কালো
পেয়েছি অনেকখানি তাই হারানর দুখ,
আজ এত বেশী হয়ে লাগে

৬

পূর্ণ হবার নহে প্রতি কাজে প্রতিক্ষণে
ওই মুখ সব আগে জাগে।
অমৃত সবারে দিয়ে বিষটুকু নিজে নিয়ে
নীলকণ্ঠ সহে গেলে দুখ
একবার বল শুধু নাহি সেথা কোন ব্যথা
শুধু সেথা অতুলন সুখ।

শেষকটি দিনের কথা।

৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার—

মহাত্মাজী নিহত হবার খবর বাবাকে দোয়া হবে না বলে খবরের কাগজ লুকানো হয়। তাতে বলেন এমন কি ঘটনা হয়েছে যাতে আমি কষ্ট পাব? বসন্ত বা মা মারা যাওয়া কি অক্ষয়ের ফেলের খবরই আমায় শুধু কষ্ট দিতে পার্কে। মহাত্মাজীকে হত্যা করার যে চেষ্টা করা হয়েছিল সেও তো আমি সহ্য করতে পেরেছি?

৩১শে জানুয়ারী—গানশুনতে চান "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী" ঐ গানটি প্রায় রোজই শুনতেন, সন্ধ্যা বেলা মোনো বুলু তপু বীণা সীমা অমিয় সবাই মিলে একসঙ্গে গাইত। গান চিরকালই বাবার খুব প্রিয় ছিল। ছোটবেলায় আমি জানতুম "জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে" এই গানটি বাবা খুব ভালোবাসতেন। আমায় বলেছিলেন এই গানটির অর্থ এক কথায়—বিশ্বপ্রেম।

১লা—ঐ দিন খবরের কাগজের জন্য ঝোঁক ধরেন। অনেক কষ্টে বিনোদ বাবু ও ডাঃ ভৌমিক সামলান। দুর্গা আসে বাবাকে দেখতে তাকে পেয়ে বড় খুশী হন। আমার স্বামীকে ছুটি নোবার কথা বলেন।

২রা—মহাত্মাজীর খবর শোনান হয়। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন তার পরই বুকের কষ্ট বেড়ে অজ্ঞান হয়ে যান।

৩রা—সীতানাথকে আনানর জন্য ব্যস্ত হন। ঐ ছেলেটি বাবার একান্ত প্রিয় ছিল। আমি জানি বাবাও যেমন সীতানাথকে আমাদের সঙ্গে সমান করে ভালোবাসতেন সীতানাথও তেমনি বাবাকে ভালোবাসতো। এবং বাবার এই অসুখে সেবায় এবং তাঁর শেষ কাজে এর সাহায্য পেয়েছি আমরা সর্ব্বাগ্রে। এই ছেলেটি রাতের পর রাত বাবার পাশে বসে কাটিয়েছে এবং বাবাকে হারিয়ে তার আঘাত আমাদের সঙ্গে সমান করে পেয়েছে। সীতানাথের বিষয় বলতে গেলে আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি বাবার এ স্নেহ যোগ্য পাত্রেই পড়েছিল।

৪ঠা—বিনোদবাবুর সঙ্গে পুকুর পঙ্কোদ্ধারের কথা হয় অনেকক্ষণ ধরে। আমি বেশী কথা বলতে বারণ করি। তাতে বিনোদবাবু চলে গেলে আমায়

বলেন বিনোদ বাবুর সঙ্গে কথা বলতে আমায় তুমি বারণ কোরো না। নিশি-কান্তকে ডাকতে বলেন, ডিকটেসান দিতে চান কিসব পুকুর পঙ্কোদ্ধারের বিষয়।

৫ই—বলেন অসুখ সারলে, আমি বিনোদ বাবুর সঙ্গে চেঞ্জে যাব। লক্ষ্মী (বিনোদ বাবুর কন্যা) সঙ্গে থাকবে আমাদের জন্য তাহলে তুই ভাববি না তো? সীমা শিবাজী উৎসব পড়ে শোনায়। বাবা খুব প্রশংসা করেন সীমার পড়ার।

৬ই—বলেন অসুখ হয়ে ভালোই হল তাইতে তবু দুচার দিন তোদের কাছে থাকলুম? নইলে এখানে সেখানে ছুটে বেড়াতুম তো?

৭ই—বিলাস বাবু আসেন তাঁকে বলেন মহাত্মাজীর স্মৃতি ফাণ্ডের বিষয় কি কি করা উচিৎ। বলেন আমি তো এখন পার্ব্ব না তোমরা আরম্ভ করে দাও। বিলাসবাবু বলেন আর একটু আপনি সেরে উঠুন পরে এসব বিষয় আলোচনা হবে। আমার স্বামীকে বলেন ম্যাগাজিন কিনে আনতে। আমায় বলেন তোর ঠিক আবার অসুখ হবে পুষ্প একটু বিশ্রাম নেরে!

৮ই—মাথা ধোয়ানর সময় আমি বলি ও মাথা কি সহজ মাথা? ওর মধ্যে কত পুকুর কত কি ভরা। তাতে বাবা বলেন যে মাথায় পুকুর নেই সে মাথা আমি চাই না। আমি হেঁসে বলি "আমরা কিন্তু এই বাকী বাড়ী শুদ্ধ মানুষ তেমনি মাথাই সগৌরবে বয়ে বেড়াচ্ছি।"

৯ই—আমার স্বামীর কলেজ থেকে আসতে দেরী হওয়ায় অস্থির হন। যত বলি নিশ্চয়ই ম্যাগাজিন কিনতে গেছেন, শুনতে চান না। ও কেন ম্যাগাজিন কিনতে যাবে? কারুকে দিয়ে কেনালেই তো হত। এমন সময় উনি ফিরেছেন শুনে খুসীর হাঁসি হেঁসে বলেন 'এক কাপ চা দিয়ে ওকে আমার কাছে পাঠাও।'

১০ই—ছোট মাসীমা আসেন তাঁকে বলেন "তোর বৌ কি রাঁধতে পারে?" মাসীমা বলেন ও মাতৃহারা মেয়ে কাজ কিছু শেখেনি। তখন বাবা বলেন আমার এরা বীণা সীমা ও মাতৃহারা এরা কিন্তু সব কাজ পারে। মেজবৌমার তো প্রতিটি কাজই চমৎকার। সীমার ও রান্না খুব ভালো। সেবার হরিশ মুখার্জ্জীর রোডে ও আমায় পায়েস রেঁধে পাঠিয়েছিল।

১১ই—বুলু আসে খোকনকে আদর করেন। বুলু চালকুমড়োর মোরব্বা আনায় খুব খুসী হন। বুলুকে বলেন তোর মা এবার মরে যাবে ওর গরম সেমিজটি ছাড়া দেখি? দিনরাত ঐ একটা গরম সেমিজ গায়ে দিয়ে পাগলের মত ঘুরছে। চানও করে না খায়ও না ও ঠিক একটা বিপদ করবে।

১২ই—কমল দত্তকে ডেকে পাঠান। আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন "এ আমার নিজের ছেলের মত অনেক উপকার পাবে একে দিয়ে" এই কর্ত্তব্য পরায়ণ ছেলেটির বহু ব্যবহারে বাবার অসুখের মধ্যে বাবার সে কথার পরিচয় পেয়েছি। বাবার স্নেহ এই অনাত্মীয় ছেলের কাছে ব্যর্থ হয় নি। বাবার প্রতি এদের ভালোবাসা দেখে বিস্মিত হয়েছি।

১৩ই—বিনোদবাবুর কথা বলে বলেন "বিনোদবাবু যে আমার জন্যে এত কর্বেন একথা কে জানতো ? ও আমার ভায়ের অধিক কাজ করেছে নইলে এত বড় বিপদের দিনে কে তোমাদের ভরসা দিতো ?" বাবার বহু বন্ধুর সঙ্গে আমি পরিচিত কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো বিনোদবাবুও বক্সীকাকা, এঁদের দুজনের বন্ধু-প্রেমের তুলনা হয় না। বিনোদবাবু শান্তিপ্রিয় নির্ব্বিরোধী মানুষ কিন্তু ঘটনা চক্রে আমাদের এই দুর্ভাগ্যময় পারিবারিক জীবনের সান্নিধ্যে এসে ও শুধু বাবার কথা স্মরণ করে কত ঝঞ্চাট ও কত হাঙ্গাম যে তিনি বহন করেছেন তা ধারণার অতীত। তাঁর বিষয় বলতে গেলে আমি শুধু এই কথাই বলবো, বাবার অসুখে অযাচিত ভাবে বিনোদবাবুর এমন সাহায্য না পেলে কি যে হত আমি ভাবতেও পারি না এবং বাবাও নির্ভর যোগ্য কারুকে না পেয়ে শেষের কটা দিন এত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না।

১৪ই—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে পুকুর. পঙ্কোদ্ধারের বিষয় লিখতে বলেন। ছোটকাকা ও বিনোদ বাবু এলে তাঁদের ও ঐ বিষয়ে রাজেন্দ্র প্রসাদকে লিখতে বলেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

১৫ই—বীণাকে দিয়ে লেখান খানিকটা দাদার দুঃখময় ব্যবহার। বলেন ও যদি নিজের অপরাধ তোমাদের উপর না চাপাতো কখনো আমি বলতুম না ওর অপরাধের কাহিনী।

১৬ই—ঠাকুমা পিসীমা আসেন। ঠাকুমাকে বলেন আপনি অমন ছুটে ছুটে আসবেন না। আস্তে আস্তে সেরে উঠবো। পুষ্প তো রয়েছে। ঠাকুমা চলে গেলে বলেন শৈলকে কিছু খাইয়েছিলি ? ক্ষতি হবে ভেবে কতদিন ওর মুখের কাছ থেকে খাবার সরিয়ে নিয়েছি—হায় হায় !

১৭ই—বিনোদবাবুর সঙ্গে মিনিষ্ট্রীর বিষয় অনেক কথা হয়, বুলুকে বলেন "মরতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই বুলুম্, অনেক কাজ আরম্ভ করেছি শেষ করতে হবে।" মামা দেখতে আসেন।

১৮ই—দাদার ছেলে বাবলুকে দেখতে চান এ বিষয় ছোট কাকাকে বলেন। সম্ভবতঃ ঐ দিন রাজু অশোকা বাবাকে দেখতে এসেছিল, তাদের দাদার বিষয় অনেক কথা বলেন সে সময় আমি ছিলুম না। বিনয় দাশগুপ্ত মহাশয় বাবাকে দেখতে আসেন।

১৯ই—ওঁকে বলেন শান্তনু কীকাণ্ড ? আমি কথা প্রসঙ্গে বুলি মিহিজামে যদি না যেতুম্ এ বিপদ হোত না তাতে বলেন কিন্তু তুই যে মরে যেতিস্ পুষ পুষ ? অশোক গৌরী বাবাকে দেখতে আসে।

২০শে—ওঁকে বলেন নার্সিং এর বই বীণাকে এনে দিতে। বলেন দুর্গাকেও এই বই একটা দিতে হবে। তপুকে বলেন তোর মা ভাতটাত খায় তো ?

২১শে—বাবার ঘরে সাজানর জন্য ফুলের গাছের টব আনা হয়।

বাবা আনন্দ করে বলেন আমায় বসতে দিলে ছাতে এই সব গাছের কাছে চেয়ার পেতে আমি বসবো। সবু উমা বাবাকে দেখতে আসে। বিনোদবাবুর সঙ্গে দেশের কথা হয়।

২২শে—দাদার কথা প্রসঙ্গে বক্সী কাকাকে বলেন "তুই যে বলেছিলি যে কলেরা থেকে বেঁচে উঠলি তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে, মনে আছে সেকথা?" ভবানী মাছের ষ্টু করে পাঠায়, খুব খুসী হন্।

২৩শে—উনি গৌরীর ছেলের পৈতেয় যান, বাবা বার বার খোঁজ করেন বলেন আমার এত কষ্ট সে কোথায় গেল? এমন তো সে কখনো করে না।

২৪শে—মোনোকে বলেন পুষ্প আমার জন্তে কর্বে এ আর বেশী কথা কি? কিন্তু শান্তনু যা কচ্ছে এমন কেউ দেখেনি। ঐ বিষয় উল্লেখ করে ধরণীকে দিয়ে অক্ষয়কে চিঠি লেখান। নীরদ ও অতুল্যবাবু বাবাকে দেখতে আসেন।

২৫শে—সীম্মকে শিবাজী উৎসব পড়ে শোনাতে বলেন। বীণা কিছু খেয়েছে কি না এ জন্ত ব্যস্ত হন্—বলেন ও সেই কত সকালে খায় ওকে আগে খেতে দেয়া দরকার।

২৬শে—বলেন বীণার সেবা অদ্ভুত। কি করে এত সুন্দর কাজ শিখলো অতটুকু মেয়ে? আমি ঠাট্টা করে বলি হ্যাঁ আপনার বীণার মত কাজ কেউ পারে না আর। তাতে বলেন নারে শুধু আমি কি বলছি বিনোদ বাবুও তাই বলেন।

২৭শে—মোনোর তৈরী সন্দেশ খেয়ে খুব আনন্দ করেন। বিনোদ বাবু ও বিনয় দাশগুপ্ত মহাশয়কে ঐ সন্দেশ খাওয়ান। বীণা বাবার জন্ত তরকারি করে। খুব ভালো লাগে বাবার। বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতির বিষয় অনেক কথা আমাদের বলেন। পরিতোষ আসে তাকে বলেন শান্তনুর কাছে অসুখের বিষয় সব শোন।

২৮শে—বিলাসবাবু ও লতাদি আসেন। লতাদিকে বলেন নার্সদের একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাও। গৌরী ও আবু আসে, তাদের দেখে খুব খুসী হন।

২৯শে—মিসেস রায় ও মিঃ রায় আসেন। রানীকে বলেন শুনলুম আমার জন্ত অনেক করেছ তুমি, দেখো কি হয়? রেভারেণ্ড সি সি পাণ্ডে আসেন ও প্রার্থনা করেন। অমন সুন্দর প্রাণময় প্রার্থনা আমি আর কখনো শুনিনি। বাবার ঘরে তখন আমিও নার্স ছাড়া আর কেউ ছিল না। ঐ ছেলেটি আসায় মোনো বুলু বীণা সীমা সব ঘর থেকে চলে যায়। ঐ ছেলেটির প্রার্থনার আবেগ দেখে আমি এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাই যে ওদের ডাকার কথাও আমার মনে আসেনি। পরে সি, সি, পাণ্ডে চলে যেতে বাবাই বললেন বীণা মোনোদের ডাকলে না কেন?

আমার প্রার্থনা নিষ্ফল হওয়ার কারণ যদি বা খুঁজে পাই ঐ ধর্মপ্রাণ কিশোর সুকুমার নিষ্পাপ ছেলের প্রার্থনা যে কেমন করে নিষ্ফল হল তা ভেবে পাই না। মনে পড়ে ঘরের কোনে সেলফে টেবিল ল্যাম্প জলছে, ঘরটি মৃদু আলোকে আলোকিত, সাদা রংএর স্প্রিং এর হসপিটাল বেডে বাবা শুয়ে আছেন। মাথার কাছে যে ছেলেটি নার্স করতো সেই ছেলেটি। পাশে নতজানু হয়ে বসে সি সি পাণ্ডে প্রার্থনারত। ঘরের কোনে রজনীগন্ধা ও লিলির গুচ্ছ সবে মিলে একটি ভারি সুন্দর শান্ত সমাহিত পবিত্রতার সৃষ্টি করেছিল। বাবার মাথার দিকে অপর পাশে আমি দাঁড়িয়ে সে প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলুম।

১লা-মার্চ্চ—পরিতোষ আসে বুলুকে নিযে যেতে। বাবা যেন দোমনা হয়ে মত দেন। আমায় বলেন পরিতোষকে বলে দাও যেন ঠিক তিনদিন অন্তর আমায় বুলুকে দেখিয়ে নিয়ে যায়। বলেন বুলুর মত সেবা কেউ আমার করে নি।

২রা—হরিপদ সরকার আসে তাব সঙ্গে দেশের কথা হয়। কাকে কাকে চিঠিও লেখান। গরমে বড কষ্ট বলেন। বলেন আমার একটা নৈহাটীর পাখা সুশীলের কাছে আছে, দেখো বসন্তকে দিযে একবার চেযে পাঠিয়ে। যদি দেয় অনর্থক তোমাদের টাকা খরচ হবে না।

৩রা—গরমের কষ্টে অস্থির হন, খসখসের পর্দ্দা আনান হয়। তবুও সে কী অস্থিরতা। খতুকে অফিস যেতে দিতে চান না, বলেন একী অন্যায় বাপের অসুখে ছুটী দেবে না?

৪ঠা—মোনোর রান্না ষ্টু খেযে বড খুসী হন। বিনোদবাবুকে বলেন যার নাতনী নেই তাব কেউ নেই। ঘরে টব শুদ্ধ রজনীগন্ধার গাছ দেখে বড় খুসী হন।

৫ই—বুকের কষ্ট বেশী হয়। বলেন বড় গরমের কষ্ট। ডাক্তাররা বলেন এসব কষ্ট সহ্য করতেই হবে তাতে বলেন, বেশ খতু আর পুষ্প আমার দুপাশে বোস্ তোদের মুখের দিকে চেয়ে সহ্য করার চেষ্টা করি। আমার তৈরী চা খেতে চান না, বলেন মেজ বৌমা এলে তার তৈরী চা খাব।

৬ই—কাকা এসে বলেন ও পাখার আশা তোমরা ছেড়ে দাও। ও সুশীল দেবে না। আমি লোক পাঠালে উত্তর দেয় না। বাবাকে ওসব বলা হয় না, সেই রকম নতুন পাখা আনা হয়। টাঙ্গান হলে বাবা বলেন 'আমার পাখা তো এ নয়? আমি জানতুম সুশীল পাখা দেবে না।' হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী গান শুনতে চান।'

৭ই—পটায়ের D. C. H. পরীক্ষার উল্লেখ করে বলেন, পটাইকে বোলো

ওর ডিপ্লোমাখানার একটা ফটো তুলে যেন আমাদের পাঠায়। বিলেতের ডিপ্লোমা কেমন আমরা দেখিনিত?

৮ই—আমি বাবার কাছে বসেছিলুম। উনি এসে দাঁড়াতে আমি উঠে বলি তুমি বোসো বাবার কাছে। তাতে উনি বলেন না না তুমি বসলেই বাবার বেশী ভালো লাগবে। তাতে বাবা ওঁর হাত ধরে বলেন না তা নয়। সামাজিকতা বা ভদ্রতার অনুরোধে অন্য রকম কথা বলার অভ্যাস বাবার ছিল না, আমি জানি এটা তাঁর অন্তরের কথাই।

৯ই—বিনোদবাবুর কথা বলে বলেন আমি যদি না বাঁচি ওর কষ্ট হবে সব চেয়ে বেশী. ওর আর কোন বন্ধু নেই। দুর্গার বিয়ের খবরে খুব আনন্দিত হন।

১০ই—হঠাৎ রাতে বুকের কষ্ট বাড়ে বলেন কে যেন আমায় বললো অক্ষয় ফেল করেছে। খবরটি কদিন আগেই এসেছিল বাবাকে বলা হয় নি। আমরা গিয়ে কাছে দাঁড়াতে, ওঁর হাত ধরে বলেন উপায় কি এসব সইতেই হবে। দুর্গাকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে নিজে হাতে চিঠি লেখেন। চিঠির উত্তরে দুর্গা প্রণাম জানালে সে চিঠি হাতে করে চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে।

১১ই—অমিয়কে দিযে অক্ষয়কে চিঠি লেখান দাদার বিষয় জানিয়ে। এবং আমাদের এই ঋণ অক্ষয় কখনো শোধ করতে পার্ব্বে না। তাতে আমি বলি বেশ তো? এতে অক্ষয় কেন ঋণী হবে? আমাদের বাবা বলে আমরা কর্চ্ছি অক্ষয়ের বাবা বলে তো নয়? ঠাকুমাকে বলে পাঠান দুর্গার বিয়েতে সুশীল যেন না আসে। সুশীল যদি ওবাড়ীতে ঢোকে আমি আর ও বাড়ীতে যেতে পার্ব্ব না। অসুখ সারলে তো হরিশ মুখার্জ্জীর রোডে আমায় ফিরতেই হবে। বিনোদ বাবুর সঙ্গে দেশের বিষয় কথা বলেন।

১২ই—দুর্গা বাবাকে প্রণাম কর্ত্তে আসে। আমায় বলেন নেকলেশটা পরিয়ে দে, আমি দেখি কেমন দেখাচ্ছে। দুর্গার চিবুক ধরে আদর করেন। সারাদিন দুর্গার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হন। বারে বারে হরিশ মুখার্জ্জীর রোডে খবরের জন্য লোক পাঠান। পিতৃহীনা স্নেহাস্পদা ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিয়েতে নিজের অক্ষমতা তাঁকে যে কত পীড়া দিয়েছিল তা ঐদিন তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত। রাত্রে বিয়ে হয়ে গেছে, বর কনে বাসরে বসেছে খবর পেয়ে তবে ঘুমের ওষুধ খান।

১৩ই—কেবল মেজকাকার কথা বলেন ঐ দিন মেজকাকার অভাব বড় বেশী অনুভব করেন। বারে বারে বলেন কত ভাবনা নিয়েই শৈ চলে গেছে। জীবনে কোন শান্তি সে পেল না। আমাদের বংশে জানি না কার অভিশাপ আছে, শৈলটার কথা ভাবলেও শান্তির উপায় নেই। কিছুই করতে পারলুম না।

১৪ই—বাঁকড়োর কথাই সারাদিন বলেন ৺রামানন্দ ঠাকুরদার কথা। কি

কি কাজ বাকি আছে। ঠাকুরদার কথাও অনেক বলেন। বোধ হয় ঐ দিন রাতে দুর্গা ও দুর্গার বর আসে, বড় তৃপ্তি পান, বলেন বড় আলোটা জেলে দাও। ওরা চলে গেলে বলেন বড় ভালো হয়েছে জামাইটি ওরা সুখী হোক, বারে বারে বলেন।

১৫ই—ডাঃ ভৌমিকের শ্বশুর মশাই বাবার অসুখ শুনে দেখতে আসেন তাঁকে বলেন আর কি দেখছেন বেয়াই মশাই মৃত্যু আমার কেশাগ্র ধরেছে বলে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলেন। বিনোদবাবুর সঙ্গে পুকুর পঙ্কোদ্ধারের কথা হয়।

১৬ই—বিনোদ বাবুকে দাদার কথা বলেন। নিশিকান্তকে কি ডিকটেসান দিতে চান, আমি বারণ করায় বলেন এ সব কাজে আমায় বাধা দিস নি।

১৭ই—ডাঃ রাম অধিকারী মশায়ের উল্লেখ করে বহু প্রশংসা করেন বলেন মানুষটির বহু সদগুন আছে অমন মন আজকাল দেখা যায় না। বুকে কষ্ট হয় বলেন দেখছো তো কোন ওষুধেই এ যখন কমছে না, সইতেই হবে। অকারণ ব্যস্ত হয়ে তো কোন লাভ নেই পুষপুষ ?

১৮ই—গঙ্গাধর বাবুকে বলেন আমার মেয়েকে একটু দেখুন। বিনোদ বাবুকে বলেন শান্তনু পুষ্প হোমিওপ্যাথি জেনে খুব আমার সুবিধে হয়েছে। শান্তনু সারারাত বই নিয়ে বসে সিমটাম মেলায়। আমরা শ্বশুরের জন্য কিছু করি নি।

১৯শে—বীণার কথা বলে বলেন ও বড় ভালো মেয়ে আজকালকার যুগে অমন মেয়ে দেখা যায় না। ওর বাবা খুব ভালো, তাই মেয়ের অমন উচ্চস্তরের কর্তব্য জ্ঞান হয়েছে। ছোটকাকা রঘুবংশ পড়ে শোনান।

২০শে—ভৌমিকের কথা বলে বলেন ভালো কাজের ফল মানুষ হাতে হাতে পায় দেখো কবে পাবনায় ওর বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেই বন্ধুত্ব স্মরণ করে আজ কি চেষ্টাই না ছেলেটা কর্চ্ছে। ঐ ভৌমিককে প্রথম যখন পুষ্পদের বাড়ী পাঠাই পুষ্পর কি রাগ ? এখন কুলু ছাড়া মুখে কথা নেই।

২১শে—বিলাসবাবু আসেন। বাবা অন্য কথার পর ডাঃ ইন্দু ঘোসের কথা বলেন। বলেন যদি ইন্দু ঘোস উপস্থিত থাকেন আমার শ্রাদ্ধ বাসরে তিনি (ওঁ মধু ওঁ মধু) কীর্ত্তন গাইবেন। তাতে বিলাস বাবু বলেন তিনি তো অপারেশানের জন্য হাঁসপাতালে গেছেন, কে কার জন্য কীর্ত্তন গান করে দেখুন ? মহাত্মাজীর স্মৃতি রক্ষার বিষয় অনেক আলোচনা হয়। সীমা বীণার দোলের সাড়ী আনান হয়, দেখে খুব খুসী হন্।

২২শে—সীতানাথকে বাঁকড়ো থেকে আনানর জন্য খুব ব্যস্ত হন। রাজবংশীকে চিঠি দিয়ে পাঠান রাইটার্স বিল্ডিংএ। কেবল সীতানাথের কথা

বলেন। বাঁকড়োর উন্নয়ন সমিতির বিষয় কিছু ডিকটেসান দেন্‌। বলেন সি সি পাণ্ডে আছে, নন্দ আছে জানি ওরা কাজ কচ্ছে, তবুও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না ওরা ছেলেমানুষ।

২৩শে—বীণার কথা বাবে বারে বলেন। বলেন অমন মেয়ে আমি আর দেখিনি। অক্ষয়ের খুব ভাগ্য ভালো তাই, অমন স্ত্রী পেয়েছে মেয়েদের যা প্রধান গুণ ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা তা ওর আছে। ওকে একটা নার্সিংএর বই কিনে দিতে হবে।

২৪শে—হরিপদ আসে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে। হরিপদকে বলেন ডাক্তাররা বলছে আমি ভালো আছি কিন্তু আমি তো তা বুঝছি না। জ্যোৎস্নাকে বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বলে হরিপদ। এই প্রথম দেখি বাবা আপত্তি করেন না। সচরাচর অজানাতো বটেই অনাত্মীয়া মেয়ের সেবাও বাবা সইতে পারতেন না, যে কারণে মেয়ে নার্শদের কোন সেবা তিনি গ্রহণ করেন নি। দেখি বাবার চোখ দিয়ে টস টস্‌ করে জল পড়ছে বুঝি জ্যোৎস্না বীণা সীমার সমান স্থানই অধিকার করেছে।

২৫শে—আমায় বলেন তুই না থাকলে আমি বাঁচতুম না পুষ্প. কি কাণ্ড এ রকম রোগ কখনো দেখিনি। ছোট ঠাকুমাকে ছাড়তে চান না। বলেন এ বয়সে মা পেয়েছি আর কি ছাড়ি?

২৬শে—আমায় বলেন জ্যোৎস্নার জন্যে আমায একটা সাড়ী আনিয়ে দিতে হবে। ধরনীকে দিয়ে অক্ষয়কে চিঠি লেখান শুধু আমাদের কথা। চিঠিটি শেষ না হওয়ায় পোষ্ট করা হয় নি।

২৭শে—খতুর কাশি হয় তার ওষুধের জন্য ব্যস্ত হন। ওষুধ আনিয়ে নিজের টেবিলে রাখেন। বলেন আমার ঘরে এসে রোজ খাবে। ভবানীর ছোট ছেলে পুনুর কথা বারে বারে বলেন।

২৮শে—ডাঃ ইন্দু বোস আসেন বাবাকে দেখতে। বাবা তাঁকে দেখে বড় খুশী হন। বাবা তাঁর কাছে রায় বাহাদুর যোগীন মিত্র মশায়ের উল্লেখ করে বলেন বাংলা দেশে ওঁর সমকক্ষ মাত্র দুজনকে দেখেছি। বুলু এসেছিল, বুলুর গাড়ীতে ডাঃ বোসের ফেরার ব্যবস্থা করতে বলেন।

২৯শে—বিনোদ বাবুর সঙ্গে ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেণ্ট সম্বন্ধে কথা হয়। অনেক ক্ষণ কথা বলায় আমি আর কথা বলতে বারণ করি। তাতে বলেন "এযে আমার প্রাণের কথা। যদি আমার প্রাণের এতে সামান্য হানি হয় তাতে লোকসান নেই এ কাজ যদি হয়, লক্ষ প্রাণ পুষ্ট হবে বাঁচবে।" আমি রাগ করে বলি অত লক্ষ প্রাণের খবরে আমার দরকার নেই। এখন ঐ একটা প্রাণ সামলালেই আমার যথেষ্ট। এ কথার উত্তর দেন না। মুখ দেখে মনে হয় কথাটা আমার বাবার মনঃপুত হয় নি।

৩০শে—ব্যোমকেশ বাবুকে চিঠি লেখান।

"আপনি বলেছিলেন আপনার মাতৃহীনা কন্যাকে আপনি কোন শিক্ষা দিতে পারেন নি। কিন্তু যা সত্যকারের শিক্ষা, সকলের কাছে নত হয়ে থাকা ও অর্থের অহঙ্কারে গর্ব্বিত না হওয়া সে শিক্ষা তাকে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়ে আমি বড় সুখী হয়েছি।"

এই চিঠির উত্তরে ব্যোমকেশবাবু একখানি ভারি সুন্দর চিঠি দেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি হারিয়ে ফেলিছি। সীতানাথ আসছে খবর পেয়ে বাবা খুব খুশী।

৩১শে—বাবার দই তপুকে খেতে দেয়ায় আমি ছোটঠাকুমার উপর রাগ করি। বোধহয় সেকথা বাবা শুনে থাকবেন। আমি ঘরে ঢুকতেই বলেন হ্যারে বাবা কি কারুর হয় না ?

১লা এপ্রিল—সীতানাথ আসবে শুনে ভৌমিককে বলেন আমার আর একটি ছেলেকে তুমি দেখেছ ? ভৌমিক ইতস্ততঃ করে বলে বালিগঞ্জ প্লেসের সুশীলদা তো ? তাতে বলেন না না, সীতানাথ সীতানাথকে দেখনি ? সে আসবে।

২রা—ছোটকাকাকে বলেন সীমা আজ আমার সব জামা কাপড় কেচে দিয়েছে। ওর অনেক গুণ আছে। ওর আবৃত্তি তুমি শুনেছ ? ঐদিন বিকেলে আমায় বলেন এ বছর বিনয় স্মৃতি মন্দিরের উৎসবে সীমা শিবাজী উৎসব আবৃত্তি কর্ব্বে আর তাকে আমার নাম করে সোনার মেডেল দেয়া হবে।

৩রা—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দু হোষ্টেলে থাকার সময়কার অনেক গল্প বলেন। বাবাও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাল্যবন্ধু ছিলেন ও একই সময়ে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে থেকে পড়েছেন। এই সময়ে এঁদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তা বরাবর অটুট ছিল। ঐদিন বাবা তাঁর শ্রীনিকেতনের ফাইল থেকে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের একখানি চিঠি বের করে আমাদের দেখান। সম্পূর্ণ চিঠিখানি স্থানাভাবে না দিয়ে তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করেদিলুম—

Dakbunglow, Muzaffarpur,
22nd. January' 39

My dear Sukumar Babu,

I am so pleased to receive your letter after a long time. • • This is "half meeting" as they call it in Hindi proverb, through your letter. You can easily imagine how pleased I am. It is just possible that I may come to Shantiniketan for a day on the 6th of February and I am looking forward

to the pleasure of meeting you on that occasion. More when we meet.

yours sincerely
Rajendra Prasad.

এই সঙ্গে আমাদের দেশের একটি দুর্ভাগ্যের কাহিনী না বলে পারলুম না। ১৯৪৬.সালে সরকারের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবস্থার প্রতিবাদের জন্য বাবা যখন পুকুর উন্নয়ন বিভাগের স্পেশাল অফিসারের পদত্যাগ করেন তখন তিনি দিল্লি গিয়ে সমস্ত ব্যাপার রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জানান। এবং ঐ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐ কাজের জন্য ৫ লক্ষ টাকা দোয়া স্থির হয়। কিন্তু তখন বাঙ্গলার গদীতে লীগমন্ত্রী মণ্ডলী থাকার দরুণ টাকাটি অপব্যয়ের আশঙ্কা ছিল তাই তখন টাকাটি দোয়া হয়নি। সেই অর্দ্ধসমাপ্ত কাজের জন্য বাবা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে চিঠি দেন।

৪ঠা—বুলু শ্বশুর বাড়ী থেকে আসে বাবা বলেন এবার আমি ঠিক সেরে উঠবো বুলু চলে গেলেই আমার কষ্ট বাড়ে। হসপিটাল বেড আসে। মোনোকে বলেন "মোনোদিদি তুমি তোমার মেয়েকে কত টাকা দিয়ে খাট কিনে দিয়েছ?" তাতে মোনো বলে ১৫০টাকা। আমায় দেখিয়ে মোনোকে বলেন আমার মা আমায় ৪৫০ টাকা দিয়ে খাট কিনে দিয়েছে। বলা বাহুল্য বাবারই টাকা, আমায় বলেন আমায় গ্লুকোজ জল খাইয়ে তুই চান করে আয় পুষ্প নইলে তুই ঠিক মরে যাবি।

৫ই—বাবাকে মোনো বলে আজতো আপনি ভালো আছেন দেখছেন না মা কত খুসী? বাবা বলেন ওসব তোমার মা-ই জানেন। কখন যে আমি ভালো থাকি তোমার মার আনন্দ হয়, আর কখন যে আমি খারাপ থাকি তোমার মার নিরানন্দ হয় আমি বুঝি না।

৬ই—সীতানাথ আসে। মোনোকে বলেন আমার মরতে একটুও ইচ্ছে নেই কত কাজ করতে যে বাকি দেশের। মোনো বলে আপনি তো সেরে উঠেছেন। স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বলেন কে, বল্লে?

৭ই—বড্ড কষ্ট হওয়ায় মোনো জিগেস করে কি কষ্ট হচ্ছে দাদু? বাবা বলেন, হৃদয়ে বড় ব্যথা। ঐ অবস্থায় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কলকাতায় আসছেন শুনে আনন্দিত হন। ছোট কাকাকে ডেকে পাঠান ও বলেন ছোট কাকা যেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে পুকুরের জন্য নির্দ্ধারিত টাকার কথা মনে করিয়ে দেন। বারবার পিসিমার কথা বলেন।

৮ই—খড়ুকে বলেন এমন সেবা কখনো দেখেছিস? আত্মীয়স্বজন আমার সেবা দেখে ভাববে এমন সেবা যেন তাদের হয়। বিনোদবাবুকে বলেন ডাঃ

রাজেন্দ্র প্রসাদ আসছে, সে কাজের মানুষ আপনি যান্ আমার হয়ে তাকে ঐসব পুকুরের বিষয় মনে করিয়ে দিন।

৯ই—অশোকা আসে তাকে দেখে খুব খুসী হন ও বলেন হ্যাঁরে তোদের কাঁচের বাসনের কারখানা, আর আমি বাসন কিনে চা খাব? নীলু (ধীরেন্দ্র-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী) আসে বাবাকে দেখতে। নীলুকে দেখে বাবা বলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে একবার ধরে আনতে পার আমার কাছে? সীমা বাবার জন্যে স্পোর্ট সোয়েটার বুনেছিল শেষ হলে দেখায়, বাবা বলেন এত সুন্দর জামা আমায় কেউ দেয়নি।

১০ই—মোনোবুলুকে বলেন ইতিহাসে পড়েছিলুম এক রাজা ছিল, তাকে চকোলেট খাওয়াতে ১১জন লোক লাগতো আমায় ওষুধ খাওয়াতে ও তাই হয়েছে।

১১ই—নিজের সেবার কথা বলে বলেন আমরা বাবার কিছু সেবাই করিনি এখন বুঝছি তাঁর কত কষ্টই হয়েছে। আমি বলি—তাঁর তো এমন অসুখ হয়নি হলে আপনিও করতেন। কিছুতে তা মানতে চান না।

১২ই—অমিয়র বিষয় উল্লেখ করে বলেন ও হল একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে আমাদের বাড়ীর ভেতর। আমরা ওর বিষয় বড় অন্যায় করেছি আগে একটু লক্ষ্য রাখলে ও ঠিক আই সি এস হত।

আমায় বলেন আগে তুই চান করে আয় নইলে আমি খাব না। আমি দেরী হয়ে যাচ্ছে বলায় বলেন বেশ গ্লুকোজ জল খাইয়ে যা। ঐদিন অশোকা কাঁচের বাসন পাঠানয় খুব আনন্দ করেন। বাবার পাশের টেবিলে বাসনগুলি সাজিয়ে দিই। যে আসে তাকে বলেন দেখো লোকনাথের জামাই আমায় এইসব পাঠিয়েছে তার নিজের কারখানার তৈরী জিনিষ।

১৩ই—ঐদিন আমার অসুখ করেছিল ঝোঁক করে নিজের ঘরে নেয়ারের খাট পেতে আমায় শোয়ান। মাঝে বাবার বেশী কষ্ট দেখে আমি বিছানা থেকে উঠে কাছে গিয়ে বসায় বলেন এতো আমি চাইনি পুষ পুষ তুই শুধু আমার চোখের সামনে শুয়ে থাক আমি দেখবো আমার মেযে আছে সামনে। বলেন বুকের কষ্ট যখন বাড়ে মনে মনে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করি। কি শ্লোক তা ছোট কাকাকে বলেন। ঐদিন মেজ কাকার সেজ ছেলে অমিয় আর ছোট কাকার ছোট ছেলে দেবীপ্রসাদকে দিয়ে দাদাকে বলে পাঠান "বেশতো আমার ওপর কোন কর্ত্তব্য সে যদি না করতে চায় নাই করুক। বড় ছেলে আর কৃতি ছেলে হিসেবে তার মায়ের প্রতি তো কর্ত্তব্য আছে। সেই কথা মনে করে ও আমার কাছে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে আমার দোয়া বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ীর একতলার ভাড়াটুকু সে তার মাকে দেবে দলিল করে দিক। আমার দোয়া সম্পত্তির কোন আয় তো অবশ্য

বন্ধু এখনও পায়নি। সুশীলতো এতদিন ধরে বাড়ী, বাড়ীর ভাড়া সব ভোগ দখল করছে। আমি অবর্ত্তমানে মায়ের ঐটুকু দায়িত্ব সে নিক্।" এই প্রস্তাব দিয়ে পূর্ব্বেও বারে বারে ছোটকাকাকে দাদার কাছে পাঠান। কিন্তু দাদা রাজী হন নি।

১৪ই—ঐদিন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবাকে দেখতে আসেন। এই দীর্ঘ ছয়মাসের মধ্যে ঐদিন যে বাবাকে কি আনন্দিত হতে দেখেছি বলার নয়। শৈশবের বন্ধু অত বড় হয়েও তাঁকে ভোলেনি এই কথা মনে করে তাঁর রোগশীর্ণ মুখে পরম পরিতৃপ্তির হাঁসি ফুটে উঠলো। কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে বাবা তেতলার ঘরে থাকায় ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মশায়ের ঐসময় অ্যাজমার এ্যাটাক্ হওয়ায় তাঁর পক্ষে তেতলায় ওঠা সম্ভব হয়নি। বাবা চেয়ারে করে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তেতলায় তুলতে বলেন। কিন্তু আমরা ডাঃ প্রসাদকে কুণ্ঠায় সে কথা বলতে পারিনি। তখন বাবা নিজে চেয়ারে করে নামতে চান অনেক কষ্টে থামান হয়। তখন এই চিঠিটি রাজেন্দ্রপ্রসাদ মশাই লিখে পাঠান।

My dear Sukumar Babu,

I came to see you but understand you are on the third storey. It is not possible for me with my asthma to go up and have therefore to get news about your health from friends, and to contend myself with this.

I am sorry but unfortunately there is no help. I hope we shall both improve and be fit once again to see each other.

Yours

14-4-48. Rajendra Prasad

এর উত্তরে বাবা যা লেখেন তার মর্ম্মার্থ এই যে :—

"আমার অসুখ শুনে আপনি দেখতে আশায় আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। পুকুর পঙ্কোদ্ধারের বিষয় আপনাকে অনেক বলার ছিল কিন্তু তা হয়ে উঠলো না। আমি সুস্থ হলে এ বিষয় আপনার সঙ্গে আলোচনা কর্ব্ব। আমাদের বন্ধু শ্রীবিনোদ বিহারী সরকার এ বিষয় সমস্ত জানেন। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আপনি কথাবার্ত্তা বললে ভালো হয়। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুকুর পঙ্কোদ্ধার সম্বন্ধে কোন প্রকার কার্য্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন না। এ বিষয় আপনি ডাঃ বিধান রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ব্বেন" ইত্যাদি। ঐ দীর্ঘ চিঠির মধ্যে বাবার ব্যক্তিগত একটি কথাও ছিল না। এমন কি ঐ সময় বাবার চিকিৎসার জন্য আমরা ডাঃ বিধানরায়কে একবার আনার চেষ্টায় যে কি ব্যাকুল হয়ে ঘুরেছি তাও বাবা জানতেন। বাবার একটু ইঙ্গিত পেলেই

হয়তো ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সাহায্যে বিধান বাবুকে একবার আনা অসম্ভব হত না। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে নিজের জীবনের চেয়ে দেশের মঙ্গলের আকাঙ্খাই প্রবল ছিল।

১৫ই—মোনোকে জিগেস করেন তোর বয়েস কত? ২১ বছর শুনে বলেন, দূর? আমায় বলেন অসুখ সেরে উঠে আমরা একটা ছোট্ট বাড়ী করে সবাই মিলে থাকবো তুই শান্তনু আমি বীণা অক্ষয় খতু সীমা সব্বাই মিলে? তাতে আমি বলি বাঃ আমায় বুঝি শ্বশুর বাড়ী ফিরতে হবে না? চিরকাল এখানে থাকবো নাকি? তারপর মোনোকে বলেন পুষ্পতো এখানে থাকতে পার্ব্বে না। অসুখ সারলে ও চলে গেলে এক বেলা খতুর সঙ্গে খাব আর সন্ধ্যেবেলা পুষ্পর কাছে খাব। ওদের বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা খাওয়ায় খুব আনন্দ পাওয়া যায় তখন শান্তনু ফিরে আসে কলেজ থেকে? ঐ দিন ছোট কাকার ছেলে দেবীপ্রসাদ এসে বলে সুশীল দা জ্যাঠাইমার জন্য দলিলে রাজী হলেন না জ্যাঠামশাই। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বাবা শুধু বলেন আমাদের বংশের ছেলে হয়ে এত বড় অন্যায় সে করতে পারলো? মন্তু সান্ত্বনার স্বরে বলে আমরা তো সবাই রয়েছি কেন ভাবছেন জ্যাঠাইমার জন্যে? তাতে বলেন আমার স্ত্রী হয়ে ওকি তোমাদের দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াবে?"

মন্তু যাওয়ার পরই বুকের কষ্ট বাড়ে বলেন একটু আঘাত সইবারও শক্তি আর নেই অথচ সংসারে থাকতে গেলে একে এড়ানরও উপায় নেই। সারারাতই বুকের কষ্ট সমানে চলে—রাত্তির দেড়টার সময় ডাক্তার আসেন। অসহ্য কষ্ট। আমি বলি যারা ভালো বাসলো তাদের কথা একবার ভাবুন বাবা, যারা ভালো বাসেনি তাদের কথা আর কেন?

১৬ই—বুকে সমানে খুব কষ্ট। ঝর্ণা আসে। ঝর্ণাকে বলেন গীতার ১০০টি শ্রেষ্ঠ শ্লোক বেছে একটি বই বের করতে হবে। আমি বসন্তকেও বলেছি তুমিও চেষ্টা কোর। ঝর্ণা বলে চেষ্টা কর্ব্ব। ঝর্ণা আমার বড় জামাই সত্যপ্রসাদের কাকা চন্দননগরের জমিদার সত্যশরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ও বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্রবধূ (অঞ্জলী মুখোপাধ্যায় নামেই পরিচিতা) সতীশ বাবুর পুত্র রামচন্দ্র শিক্ষায় জ্ঞানে ও চরিত্র মাধুর্য্যে অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বজন পরিচিত হয়েছিলেন। এই শ্রী ধী মণ্ডিত ছেলেটির রূপের যেন তুলনা ছিলনা ও রকম বুদ্ধি উজ্জ্বল প্রতিভাময় চেহারা সত্যই দুর্লভ। ওদের দুজনের মিলনে সত্যই যোগ্যর সঙ্গে যোগ্যর মিলন হয়েছিল কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্যে সে সুখ সইলো না। ঝর্ণাকে বাবা বড় ভালো বাসতেন। বাবার স্বভাবের সঙ্গে ঝর্ণার একটা প্রকৃতিগত মিল ছিল। নিজের মর্ম্মান্তিক দুঃখ নিজের মধ্যে চেপে কর্ত্তব্য করে যাওয়া। এই ধৈর্য্যময়ী মেয়েটির সে দৃঢ়তায় মুগ্ধ না হয়ে

পারিনি।. আজো মনে পড়ে যেদিন রামকে আমরা হারাই সেদিন বাবার কি ব্যাকুলতা? আমার স্বামী তখন অসুস্থ। মেজ মেয়েটির সেপ্টিক ফিবারে অত্যন্ত বিপদগ্রস্থ বিব্রত আমি। বাবা আমাদের দেখতে এসে ঝর্ণার বিপদের খবর পেলেন। মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হয়ে বল্লেন উঃ কি সর্ব্বনাশ? চল্ পুষ্প তোকে আমি ঝর্ণার কাছে পৌছে দিয়ে আসি এদের জন্য ভাবিস নি তুই না ফেরা পর্য্যন্ত আমি থাকবো এদের কাছে। বাবার গাড়ীতেই গেলুম ঝর্ণাদের বাড়ী সারা পথের মধ্যে বাবার মুখে একটি কথা শুনিনি যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন আকস্মিক আঘাতে। সেদিনের ঝর্ণার ধৈর্য্য ও সংযমের কাহিনী অবর্ণনীয়। তারপরও ঝর্ণার জন্য বাবা যে কত ব্যস্ত হয়েছেন তা শুধু আমরাই জানি। বিশেষ করে সতীশ বাবুর মৃত্যুর পর। পাছে এই অভিভাবকহীনা অবস্থায় তাকে কেউ বিব্রত করে এজন্য বাবার ভাবনার অন্ত ছিল না। কখনো বলেছেন না ওর জন্যে একবার বেহালায় 'অমররায়ের সঙ্গে কথা বলি। (বেহালার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার অমরেন্দ্রনাথ রায় বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আবার তিনি ঝর্ণার বাবার মামা হন্। আমার বৈবাহিকরা শৈশবে পিতৃহারা হয়ে ঐ মামাদের স্নেহেই প্রতিপালিত) কখনো বলেছেন না স্বস্থুর উচিৎ অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করেও ঝর্ণার বিষয় সম্পত্তির দেখা শোনা করা, ওতো ল পড়েছে আইন বুঝবে। ধনী আত্মীয়ার কিছু করাও যে কত লোকের কত কথার সৃষ্টি করে তা বাবাকে বোঝান যেতোনা। কে কি বলবে বলে ভাই বোন্‌কে দেখবে না? একী অনাসৃষ্টি কথা? এই সব ব্যাপারে কত কষ্টে যে বাবাকে থামিয়েছি তা শুধু আমিই জানি।

ঐ দিন ঝর্ণা চলে যেতে বিনোদ বাবুকে বলেন ঝর্ণার ওপর এ ভারটা দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। ও যখন চেষ্টা কর্ব্বে বলেছে ও ঠিক বের কর্ব্বেই।

১৭ই—আমায় বলেন "তোর মুখের মধ্যে আমি ঠাকুরকে দেখতে পাই।" হায়রে অদৃষ্ট? আমি মনে মনে ভাবি আপনার অন্তরে আমার প্রতি যে অপরিমেয় স্নেহ সঞ্চিত তারি ছবি দেখেন আমার মুখে। সেতো এ সত্যিকারের পুষ্প নয়। ঐ দিন ছোট কাকাকে দিয়ে লেখান বাবার শ্রাদ্ধে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দাদার কোন অধিকার থাকবে না—বিনোদ বাবু সাক্ষী হন্ বাবা সই করেন।

১৮ই—খতুকে কি যেন বলছিলেন আমি ঘরে ঢুকতে থেমে যান। আমি বলি কি কথা হচ্ছে? তাতে বলেন সে একটা কথা খতু শুনলে খুব কষ্ট পাবে। তুই শুনলে হাজারো গুণ কষ্ট পাবি।" আমি বলি কি দরকার সে সব কথায়? কিছু বলেন না আর। তাঁর রোগ যন্ত্রণায় পাছে আমি কষ্ট পাই। এজন্য সহ্যের তাঁর সীমা ছিল না। এতে অনেকে তাঁর কষ্ট কম মনে করেছে কিন্তু আমি জানতুম তাঁর সহ্য কী অসম্ভব ছিল। ডাক্তাররা সে ঘটনা দেখে

অবাক হয়েছেন। বারে বারে মা মা বলে ডাকেন আমি সাড়া দোয়ায় স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলেন তুই বুঝি আমার মা ?

১৯শে—বুলুকে বলেন পটাইকে লিখেদিস তার জন্য আরো একমাস আমি অপেক্ষা করে থাকবো। পরীক্ষা হলেই সে যেন পুষ্পক রথে করে চলে আসে। আমি বলি আপনিতো সেরে গেছেন ম্লান হেঁসে বলেন তাও যদি হয়, আবার এই পথেইতো যেতে হবে ?

২০শে—বিনোদ বাবুর কাছে বলেন যার নাতনী সেই তার কিচ্ছু নেই। মোনোবুলু যে আমার কি সেবা করেছে বলার নয়। বিনোদ বাবুকে বলেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে চিঠি দিতে।

২১শে—দিনরাত বুকে কষ্ট একেবারেই কম নেই, অসহ্য কষ্ট। আমি বলি আপনিতো একটু ভালো আছেন ম্লান হেঁসে বলেন—কে বল্লে ?

২২শে—আমি আর মোনো বসে, আমায় বল্লেন—হ্যাঁরে আমায় যে এ রকম করে বারে বারে ওষুধ খাওয়াচ্ছিস তোর কষ্ট হচ্ছে না ?

আমি বলি তা কেন হবে ? আপনি কি ছোট বেলায় অসুখ হলে আমায় জোর করে ওষুধ খাওয়ান নি ? তাতে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন "না আমার চার সন্তান ছিল তার মধ্যে তুই ছিলি আমার চোখের মাণিক• তোকে কষ্ট দিয়ে কখনো কিছু করতে পারিনি। আমি চোখের জল সামলাতে মুখ ঘুরিয়ে নিলুম পেছনের জানলার দিকে, মনে মনে ভাবলুম—একথা আমার চেয়ে বেশী কে জানে ? বাপ সকলেরই হয় কিন্তু আমি যা পেয়েছি তা পায় ক জনে ? মনে পডলো আমার ছোট বেলায় ওষুধ খাওয়ার কথা এক দাগ মিকচার খেতে গেলে বাড়ী শুদ্ধ লোক জড হত। প্রকাণ্ড থালায় সাজানো হত নৈবিদ্যির মত ছোলা ভিজে, বেদানা ছাড়ান, কাঁচা পেয়ারা, আদার কুচি জারক লেবু বড় এলাচ মিছরি নানাবিধ উপকরণ, সামনে একজন পিকদান নিয়ে দাঁড়িয়ে একজনের হাতে জগ ভরা জল, গেলাসে খাবার জল খাটের ওপর বাবার কোলে আমি, তখন ৮ বছর বয়েস হবে পাবনায় স্কুলে পড়ি। কুইনাইন মিকচার হলে তো রক্ষেই নেই হাতে করে গুঁড়ো কুইনাইন চেটে চেটে খেয়ে বাবা দেখাতেন কুইনাইন খেতে তেমন মন্দ নয়। সব চেয়ে অন্যায় হত শেষে সেই ওষুধ কুলকুচো করে যখন ফেলতুম বাবার গায়ে—। মা রেগে যেতেন বলতেন কেন তেতো তো পিকদানীতে ফেল্ না, বাবার গায়ে ফেলবে ? এখন বুঝি অন্যায়ের মাত্রা আমার কতদূর ছিল। আমাদের পাঁচ বছরের মেয়েরও ও রকম আবদার কখনো আমরা সই না। আর একবারকার ঘটনা মনে পড়ে তখন আমি বছর ৬।৭। জলপাইগুড়ীতে তখন আমরা। কি একটা অসুখে ডাক্তার আমায় দুধ সাবু খেতে বলেন। বাবা অফিস থেকে ১২টায় লোক পাঠান আমি সাবু

অ্যাডাল্ট এডুকেসান মিটিং, বেহালা



............,শ্রীসুধীর রায়, ..., শ্রীবিনোদ বিহারী সরকার, শ্রীবিলাস মুখোপাধ্যায়,.........
শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

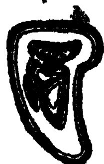
খেয়েছি কিনা জানতে চেয়ে। খবর যায় কেউ সাবু খাওয়াতে পাচ্ছে না। আফিস বাড়ী থেকে অনেক দূর। বাবা ফের সাইকেলে করে আসেন। বেশ মনে আছে বাবার আফিস ঘরে সেক্রেটারী টেবিলের ওপর পাম্প ষ্টোভ জেলে বাবা দুধ সাবু তৈরী কর্চ্ছেন। তাতে কিসমিশ মনেক্কা তেজপাতা আস্ত গরম মশলা সব দিয়ে সুন্দর পায়েস হল। সাদা পাথরের বাটি করে সেই পায়েস হল এই মহারাণীর ভোগ। আমিতো আনন্দে উৎফুল্ল পায়েস পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাটি শেষ। বাবা ফের ফিরলেন আফিসে। মা এসে তখন বলেন সেইতো সাবু খেলি শুধু শুধু সকলকে হায়রাণ করা? আমি বল্লুম বারে ওতো পায়েস সাবুতো নয়? মা বল্লেন "সাবুই তো? দুটো কিসমিস দিয়ে অমনি বোকা বুঝিয়ে দিলো। সে আমার কী রাগ? আজো মনে আছে কত সাধ্য সাধনা করে তবে আমার রাগ পড়ে বাবার ওপর থেকে?

২২শে—বীণার শরীর খারাপ থাকায় আমি তার আগের দিন বীণাকে বলি কাল তুই আসিসনি, তোর জামাইবাবুর ছুটি আছে বাবার কাছে দিনের বেলা থাকবে। বাবাও বলেন "হ্যাঁ সেই ভালো তোমার একটু বিশ্রাম দরকার হয়ে পড়েছে" তারপর দিন সকাল থেকে বার বার বলেন "আজতো মেজবৌমা আসবে না—না? ভালোই হল বিশ্রাম করুক একটু।" মুখে বলেন বটে তবে বেশ বুঝি বীণা না আসায় বেশ একটা অভাব অনুভব কচ্ছেন। খাওয়ার পর কিছুতে ঘুমুতে চান না। বলেন একজন নির্ভর যোগ্য লোক না থাকলে আমি ঘুমুই কি করে? আমি কাছে বসি, এমন সময় বীণা আসে—আমি একটু হেঁসে বলি ছুটি দিলে ছুটি নেয় না একি মেয়ে? বাবা দেখুন আপনার নির্ভর যোগ্য লোক এসে গেছে। বাবা শুধু বলেন ওর কর্ত্তব্য জ্ঞান বড় উচ্চ শ্রেণীর।"

২৪শে—আমায় বলেন তুই সংস্কৃত পড়বি? নইলে শেষ বয়েসে ভুল উচ্চারণে গীতা পড়বি তো? আমি বলি গীতা আমি পোড়বোই না—। তাতে স্নেহভরা শান্ত হাঁসি হেঁসে বলেন এ তোর অন্যায় রাগ গীতা খুব ভালো বই। আমি রান্নাঘরে যাই বাবা ডেকে পাঠান, বলেন কি কচ্ছে সে ঘুরে ঘুরে? মোনো বলে দাদুর কেবল মেয়ে আর মেয়ে? তাতে হেঁসে বলেন ওরে আমার পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটা মেয়ে।

২৬শে—বাবার কাছে আমি বসে আছি। সীমা এসে বলে "উঠে যান আমার বাবার কাছ থেকে, এতো আমার বাবা?" "আমি হেঁসে বলি তুইতো আমার মার কাছে বেশী থাকিসনি তাহলে জানতিস বাবাতে কারুর ভাগ নেই একেবারেই আমার।" সীমা বাবাকে জিগেস করে হ্যাঁ বাবা তাই? বাবা স্নিগ্ধ হেঁসে বলেন "হ্যাঁ, তুমিও একটু একটু পেয়েছো।"

এইদিন রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন" পড়ে শোনাবার সময় তার ভেতর এই চিঠিখানি বেরোয়। বোধ হয় মংপু থেকে লেখা।



ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

নিত্যকার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

[illegible]

ইতি ২৩।১০।৩৭ [illegible]

২৬শে—ঘুম ভেঙ্গেই বক্‌সী কাকাকে দেখে বলেন যাদের ডাকি তাদের পাইনা, যাদের পাবার কথা নয় তারাই এসে বসে থাকে। বিনোদ বাবুর সঙ্গে দেশের বিষয় কথা বলেন খানিকক্ষণ।

ঐদিন বাঁকুড়ার নন্দদুলালের উল্লেখ করে বলেন—বড়ভাল ছেলেরে—। বাবার অসুখে ঐ ছেলেটির অধীর উদ্বেগ ও সেবার আন্তরিকতা সত্যই উল্লেখযোগ্য।

২৭শে—আমি সীমাকে বকছি শুনে তাকে ডেকে আদর করেন। বলেন তোমার দিদি বড্ড বকেছে না? ও আমায়ও বকে দেখছো তো? ছোট ঠাকুমা ঘরে ঢোকায় বলেন আপনি একটু বিশ্রাম করুণ মাসীমা আপনার শরীর আমার চেয়ে দুর্ব্বল। রাজেন্দ্র প্রসাদকে পুকুরের বিষয় একখানি চিঠি লেখান, ভুলক্রমে এটি পোষ্ট করা হয় নি। সীতানাথকে রঘুবংশ পড়ে শোনাতে বলেন।

২৮শে—বীণার প্রসঙ্গে বলেন ওযে আমার মেয়ে ছিল, তাইতো ওর বিয়েতে আট হাজার টাকা পণ দিয়েছিলুম আমি অক্ষয়কে। বীণা হাঁসে।

২৯শে—'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান শুনতে চান্। মোনো বলে ওগান তো আমরা জানিনা, মা জানে। তাতে বলেন 'ওর গান গাইবার সময় হবে না। ওঠিক পাগল হয়ে যাবে, সময় মত চান নেই খাওয়া নেই—সমানে ঘুরছে তো ঘুরছে।' আজ কষ্ট একটু কম মনে হয়।

৩০শে—ঐদিন রাতে আমি বাবার ঘরে যাইনি সকলে বলেন তুই কাল সারারাত আমায় একবারও দেখতে আসিসনি কেন পুষ্প? অতক্ষণ তোকে দেখতে না পেয়ে আমার বড় কষ্টে কেটেছে।

১লা মে—মোনো বুলুকে বলেন তোমরা কে সবচেয়ে বেশী নভেল পড়েছ? লোকের পিতৃদায় হয় অনেক শুনেছ—শান্তনুর হয়েছে শ্বশুর দায়। তাতে বুলু বলে শ্বশুর দায় হবে কেন? বাপীর ও পিতৃদায় বাপীতো আপনার ছেলেই। বলেন নারে না ছেলে, হলে সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিতো। বিনোদ বাবুর সঙ্গে দেশের কথা হয়।

২রা মে—বাবার দুপুরের ষ্টু আমি না খাইয়ে মোনো না বীণা কেউ খাওয়ায় তাতে বলেন আমার এই আসল খাওয়াটা তুই খাওয়াস পুষ্প।

৩রা মে—বুকের খুব কষ্ট। আমায় বলেন "দেখছোতো কোনওযুধেই হঠাৎ কিছু হবে না। এমনি করতে করতে ঠিক সেরে উঠবো অহেতুক ভেবে শরীর নষ্ট কোর না।"

৪ঠা—আমি অসুস্থ বোধ করায় বাবার রাত্রের মানমণ্ড ও ঘুমের ওষুধ খাওয়ানর আগেই শুয়ে পড়ি। খতুব উপর ভার ছিল বাবাকে মানমণ্ড খাওয়ানব। রাত ১২টার সময় উনি আমায় ডাকেন যে কেউ নাকি বাবাকে মানমণ্ড খাওয়াতে পাচ্ছে না। আমি গিয়ে বসতেই বলেন কি কর্চ্ছিলি এতক্ষণ? আমি বলি শরীরটা ভালো লাগছিল না তাই শুয়েছিলুম খেতে হবে যে বাবা? খুব অম্লান বদনে বলেন দাওনা দিলেই খাই। উনি খতু, ছোট, ঠাকুমা সীতানাথ সবাই এতক্ষণ ঐ খাওয়ানর জন্যে হায়রাণ, পাঁচ মিনিটে খেয়ে নিয়ে বলেন যা যা শুয়ে পড়গে যা।

৫ই—মনু গিয়ে বাবার কাছে বসে। তাকে বলেন দেখেছো শান্তনু আমার জন্যে কি পরিশ্রম কর্চ্ছে? এমন জামাই দেখোছো? তোমরা শেখো কি রকম করতে হয়। বিনোদ বাবু বলেন 'এমন জামাই দেখা যায় না, আমি তো কোথাও দেখিনি।'

৬ই—মেসমশাই আসেন। তাঁকে বলেন "আমি মনে করলুম আর বুঝি নীরদের সঙ্গে দেখা হোলো না। বুকে কষ্ট সমানেই চলছে। আমায় বলেন এবার আমি ঠিক তোর কাছে থাকবো পুষ্প কোথাও যাব না। আমি বলি ওসব কথা বলে কি লাভ? কে আটকাবে আপনাকে? আবার আজ নোয়াখালি কাল বাঁকড়ো করে দেশের কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। দুর্ভিক্ষ বন্যা দাঙ্গা কিছু একটা হলেই হল। তাতে বলেন নারে না এবার তোর সব কথা শুনবো দেখিস?

৭ই—উনি ঘরে ঢুকতে বলেন, শান্তনু কী কাণ্ড? আমায় বলেন তুই আমার বড় উপকার করেছিস পুষ্প যে বীণার মত বৌ এনে দিয়েছিস্। বিয়ের

আগে স্মৃতিকে তুই দেখিস্‌নি না ? আমি বলি—না। অক্ষয়কে চিঠি লেখাতে চান।

৮ই—খুব কষ্ট, অস্থিরতা খুব। বেশী রাত্রে ডেলিরিয়াম আরম্ভ হয় কেবলই ছোটকাকাকে খোঁজেন বলেন 'ওরে একবার ভাইকে দেখা রে রে ?' কাকা অবশ্য প্রত্যহই আসেন। তবুও বরাবরই অসুখ হলেই বাবা কাকাকে বড্ড চাইতেন। নৈহাটিতে কলেরার সময়ও দেখেছি আমরা সবাই রয়েছি বাবা কেবল ছোট কাকার খোঁজ কচ্ছে'ন কতক্ষণে ছোটকাকা আসবেন। ছোট-কাকার প্রতি তাঁর ভালোবাসার অন্ত ছিল না।

৯ই—কষ্ট খুব বেশী। আমি মতি চাকরকে বকছি শুনে কষ্ট পান। মোনোকে বলেন দেখোগে কি হল ? তপু বলে দাদুর খাটটা কি সুন্দর আমার দেখে শুতে ইচ্ছে কচ্ছে। তাতে বলেন না না কক্ষনো যেন শুতে না হয়। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি গান শুনতে চান।

১০ই—সর্ব্বদাই কষ্ট বেশী। একমুহূর্ত্ত কষ্টের বিরাম নেই। এধারে বুলুর শ্বশুর বাড়ী থেকে খবর আসে বুলুর কলেরিক ডায়রিয়ার মত হয়েছে। অসুখ বেশী শুনে আমার স্বামী দেখতে যান। ডাঃ অধিকারীর রোনাল্ডকে নিয়ে আসার কথা, বাবা বারে বারে ওঁকে খোজেন। তখন বলি বুলুর শরীর ভালো নেই শুনে তাকে দেখতে গেছেন। শুনে কেবল বলেন বলনারে বুলুমের কি হয়েছে ? যতই বলি বেশী কিছু নয় বিশ্বাস করিতে চান না। আমার হাত ধরে বলেন তুই একবার যা না পুষ্প সীতানাথ আর খন্তু আমার কাছে বসুক। বারে বারে জেদ করেন। তখন আমি বলি সেতো আপনি জানেন বাবা যে আপনাকে ফেলে এসময় আমি কোথাও যেতে পারি না।

১১ই—নিঃশ্বাস একমিনিট থাকছে একমিনিট থাকছে না। বলেন ভগবানের একি বিচার ? কেন ১৩ই ডিসেম্বর সব শেষ হয়ে গেল না ? আমি বলি ওকথা কেন বলছেন বাবা আমাদের সেবায় কি আপনার তৃপ্তি হচ্ছে না ? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন "কত কষ্ট দিচ্ছি সবাইকে কে জানে আরো কত দোষ ?" বাবার মনস্তত্ত্ব আমাদের মনস্তত্ত্বর সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। একবার বাবা কৃষ্ণনগরে থাকতে আমার দৌহিত্র শ্রীমান কমলেশের সঙ্গে তোলা বাবার একখানি ছবি বাবাকে পাঠাই তার উত্তরে বাবা লেখেন। "ঐ রকম ফটো দেখলে মনে হয় ছোটরা বলছে "আর কেন তোমরা আমাদের জায়গা দখল করে আছ ? আমাদের এই দুঃখী দেশে আহার ও বাসস্থানের সবেরই অভাব তোমরা কতকাল ধরে জায়গা জুড়ে থাকবে ?" ঐ চিঠি পড়ে আমি খুব দুঃখ পাই, আমার মনে হয়েছিল কি অদ্ভুত বাবার দৃষ্টি ভঙ্গি আমারতো মনেহয় বড়দের স্নেহ শীতল ছায়ায় বড় হতে পেলেই তবে এরা

দুঃখ কষ্টের তাপ থেকে রক্ষা পেয়ে বাঁচবে। ঠিক এই মনস্তত্ত্বের জন্য নিজের জোর কখনো কারুর ওপর খাটাননি। মানুষ মাত্রেরই যে প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের প্রচুর কর্তব্য একথা তিনি মনে প্রাণে মানতেন এবং যেখানে অন্তরের যোগ নেই সেখানে আইনের দাবী নিয়ে বা শাসন দিয়ে নিজের দাবীকে তিনি ঘৃণা করতেন। এই কারণেই সন্তানের অত বড় অবিচার নীরবে মেনে নিয়ে নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে আসেন। আঘাতে, দুঃখে, মনস্তাপে, ঘৃণায় ঐ দীর্ঘ দুবৎসরের মধ্যে বালিগঞ্জ প্লেসের পাড়াতে ও আর একদিনও যাননি।

১২ই—ভীষণ বুকে কষ্ট বুলুর খবরের জন্য ব্যস্ত হন। মোনোকে চুপি চুপি বলেন তোর সরকারকে বল্‌না বুলুটার একবার খবর নিক্‌। মোনো বলে সকালেতো সীতানাথ মামা গিছলো, বুলু ভালো আছে। সীতানাথকে বলেন—আমায় কি সেকথা বলতে নেই? বুকের কষ্ট বাড়ে আমি চুপ করে পাশে চেয়ারে বসে থাকি আমায় বলেন কই তোর সে সাহস গেল কোথায়? ওষুধ কই? তারপর হেঁসে বলেন ডাক্তাররা বলছেন এ কষ্ট সইতেই হবে। তাই হোক, তোদের মুখ দেখে সইবারই চেষ্টা করি। জ্ঞান কখনো থাকছে কখনো থাকছেনা আমি ডাকি বাবা ওষুধ খেতে হবে যে? বলেন নিশ্চয়ই খেতে হবে নইলে বাঁচবো কি করে? ভবানী নীরদ আসে বাবাকে দেখতে।

১৩ইমে—বুকে ভয়ানক কষ্ট, বলেন ডাক্তার ডেকে আর কি হবে? খানিক স্তোক দিয়ে চলে যাবে তো? হরিপদ সরকার আসে তাকে বলেন ডাক্তাররা বলছে আমি ভালো আছি। কিন্তু আমার তো তা মনে হয় না। বীণাকে বলেন এই অসুখে চোখের ওপর আমি আমার দুজন বন্ধুকে মারা যেতে দেখেছি। নার্শ সুষমা মায়ের অসুখের খবরে চলে যায়। যাবার কথা শুনে বাবা বলেন, ভয় কি তোমার মা সেরে যাবেন।

১৪ই—রাত্রে কেবল ছোটকাকাকে খোঁজেন, বলেন—বল্‌, কথা দে সকালে বসন্তকে খবর দিবি বল্‌ আমায় ছুঁয়ে বল? সীতানাথকে বলেন যাও শিগ্গির যাও বসন্তকে ডেকে আন, আর রাস্তায় যদি পুলিশ ধরে বোলো কত কঠিন রুগী বাড়ীতে।

১৫ই—সীমার কাকা আসেন ঋতু সীমাকে নিতে তাদের বিয়ের তারিখ। বাবার কষ্ট খুব বেশী, জ্ঞান মাঝে মাঝে আসছে আবার চলে যাচ্ছে। অবস্থা দেখে বিমলবাবু ফিরে যেতে চান। আমি বলি—তা হয় না, অন্ততঃ আজকের মত সীমাকে আপনি নিয়ে যান। মেয়ের বাপের বাড়ীর লোক ফিরিয়ে দেওয়া আমার বাবা বড় অপছন্দ করেন। আজ তাঁর জ্ঞান নেই বলে সেকাজ আমি করতে পারি না। বিমল বাবু বলেন না মা আমি নিজেই ওকে নিয়ে যাচ্ছি না। আমি বলি না হয় ঘণ্টা খানেকের মত সীমা ঘুরে আসুক। বিমলবাবু অবস্থা জানিয়ে ফোন করেন, ব্যোমকেশ বাবু আসেন। তখন বাবার আবার

সামান্য জ্ঞান ফিরে এসেছে। বাবা বলেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি সীমা যাক। ব্যোমকেশ বাবু বলেন, না আপনার সেবা করার যে অধিকারটুকু সীমার আছে তাঁকে তাকে আমি বঞ্চিত করতে পারি না। বাবা বলেন সে কথা সীমাও বলেছে। তবু আমি আদেশ দিচ্ছি সীমা যাবে। বাবার আগ্রহে সীমাকে যেতে হয়। দুর্গা ও রাসকৃষ্ণ বাবাকে দেখিতে আসে।

১৬ই—বাবার খুব কষ্ট। হঠাৎ কুলকুল করে ঘাম হয়। মোনো বীণা সবাই হাত পা ঘষে ঘষে গরম করে আমি মাথায় হাওয়া করি। ছোটঠাকুমা আমার হাত থেকে পাখা নিয়ে হাওয়া কর্ত্তে থাকেন তাই দেখে বাবা বলেন "ছিঃ ছিঃ মাসীমা হাওয়া কর্বেন কি?" তখন একটি কথা বলতেও কষ্ট, ছোট ঠাকুমা বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন নারায়ণ তোমায় সারিয়ে দিন বাবা—। তাই শুনে বলেন—সারবে বইকি নিশ্চয়ই সারবে নারায়ণ ঠিক সারিয়ে দেবেন। ডাক্তারদের মতে এমন আদর্শ রোগী বড় দেখা যায় না। কখনো জানতে চাননি ডাক্তারদের মতামত। বলতেন—যান পাশের ঘরে আপনারা আমার জামাইএর সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করুন। কোনদিন টেম্পারেচার নেবার পর জিগেস করেননি কত টেম্পারেচার নাড়ী, দেখলে প্রশ্ন করেন নি কেমন দেখছেন। ডাক্তাররা যখন বলেছেন কষ্ট সইতে হবে, নীরবে সয়ে গেছেন অসহনীয় যন্ত্রণা।

১৭ই—বুকে ভীষণ কষ্ট। নিশ্বাস একমিনিট থাকছে এক মিনিট থাকছে না। মোনো চন্দননগর যাবে শুনে বলেন আমি অতদিন জামা না ছেড়ে থাকবো কেমন করে? আমি বলি কেন বুলু আসবে। স্নিগ্ধ হাঁসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যন্ত্রণা কাতর মুখ খানি। বলেন সেটা খুব ভালো কথা। ছোটকাকা এলে বলেন 'বসন্ত ওরে বসন্ত।' হঠাৎ চশমা চান। বলেন চশমাটি একবার দেতো? তারপর বলেন 'বড্ড অন্ধকার হয়ে গেল নারে পুষ পুষ?' তখন চড়চড়ে রোদ। বুঝি দৃষ্টি চলে গেল। কোন রকমে অশ্রুরোধ করে বলি হ্যাঁ বাবা বড্ড বাদলা আজ। বিনোদ বাবুর সঙ্গে দেশের কথা বলেন।

১৮ই—মোনো চন্দননগর যায়। বুলু আসে। অনেকক্ষণ পরে চিনতে পেরে বলেন 'বুলুম বুলুম'। হাতটা ধরে কাঁধে রাখেন। খোকনকে আদর করেন। খুকু অফিস যায় তার হাত ধরে বলেন—১২ টায় চলে আসিস্।

১৯শে—ভীষণ কষ্ট। ঘুম মোটে নেই। বিকেলবেলা আমার আর খুঁতুর দুটো হাত ধরে শুয়ে থাকেন। বুলু ঠাট্টা করে বলে দুপাশে ছেলে আর মেয়ে পেলেই দাদুর প্রাণ ঠাণ্ডা।

২০শে—আজ দিনের বেলাও মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যান। সব সময়ই

একটা আর্ত্ত চিৎকার। কখনো বা খানিক নিস্তব্ধ। বাবা বলে ডাকলে শুধু বলেন 'বল্ ?' বড় কষ্টে যেন স্বর বেরোয়। অনবরত চিৎকার করে ওঠেন। সেই সময় "এইতো আমরা কাছে আছি" বললে একটু শান্ত হন। অজ্ঞানের মধ্যে বলেন—পুষ্প পুষ্প, আমি বলি এইতো আমি রয়েছি বাবা।' বলেন আর একটা পুষ্প কই ? বুঝি বীণাকে খুঁজছেন। বীণার নাম করলে হাসেন বড় তৃপ্তি ভরা সে হাঁসি। সীমা অসুস্থ হওয়ায় বাবাকে বলি বাবা সীমা বাপের বাড়ী ঘুরে আসুক, অনেকদিন যায় নি তখন পরিষ্কার জ্ঞান, বলেন "গুড আইডিয়া।"

২১শে—আমায় মোটে ছাড়তে চান্না। বুলু বলে, আমি বসি আপনার কাছে মা চান করে আসুক্ ? এই প্রথম বলেন "না"। বুলু বলে আমরা খেটে খেটে মরি আর নিজের মেয়েব সাড়া পেলেই মুখে হাঁসি। দিনে খানিক খানিক জ্ঞান থাকে। বুলু বলে আজতো আপনার বেশী কষ্ট নেই দাদু ? বাবা চোখ বড় বড় করে বলেন দেখবি আমার কি কষ্ট ? পবে বলেন হার্টের যন্তরটাই বড় কষ্ট দিচ্ছে রে ? হাঁপাতে হাঁপাতে খানিক ইশারাতে বিনোদ বাবুকে বলেন "আপনি গাড়ী বিক্রী করার আগে বিনয়কে একদিন বেড়িয়ে আনবেন।"

২২শে—ঘুম একেবারেই নেই। ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে না। চোখের দৃষ্টি একেবারে নেই বললেই চলে। চোখের সাদাটি সম্পূর্ণ লাল ডাক্তাররা বলেন চোখের ভেতর হেমারেজ হচ্ছে। কালী মোহনকে বলেন মাকে ডাকো। কালীমোহন বুঝতে পারেনা তখন বলেন আমার মেয়েকে চেননা ? পুষ্প। বিনোদ বাবু ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের চিঠি নিয়ে আসেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বাবার ইচ্ছে জানিয়ে ডাঃ বিধানরায়কে বিনোদবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে কজে করতে লিখেছেন। বিনোদবাবু চিঠিখানি বাবাকে পড়ে শোনান্। বাবার তখন পূর্ণ জ্ঞান। বিনোদবাবুকে বলেন বলুন প্রাণ দিয়ে কাজ কর্বেন। বিনোদবাবু বলেন, ভার যখন দিলেন করতে হবেই, বাবার মুখ তৃপ্তি ভরা আনন্দময় উজ্জল হয়ে ওঠে বলেন এবার মরণেও আমার দুঃখনেই। বিনোদবাবু চলে যাবার পরই, ওরে বুকে বড কষ্ট, বলে অজ্ঞান হয়ে যান। শুধু আর্ত্তনাদ। উমাসবু আসে।

২৩শে—অমিয় আসে অনেকক্ষণ পরে চিনতে পেরে হাঁসেন বড় মধুর সে হাঁসি। আমি বলি আমি এলে বাবা বড় খুশী। অনেকক্ষণ পরে বলেন "বড় খুশী" অস্পষ্ট উচ্চারণ। আমার হাতটা বুকে চেপে ধরেন।

২৩শে—সীমা আসে। সীমাকে দেখে বাবা বড় খুসীর হাঁসি হাঁসেন। মনে হয় চিনতে পেরেছিলেন। সীমা আয়ার আমি তাকে বকি 'কেনতুই অসুস্থ

শরীর নিয়ে এলি আবার কি বিপদ বাধাবি এর মধ্যে ?' সীমা কেঁদে বলে বাবার এত অসুখ কিকরে সেখানে থাকবো দিদি ? বড্ড মনকেমন করে যে ? বকতে গিয়ে আমিও চোখের জল সামলাতে পারি না। বাবা আমায় ডেকে বলেন "তোমায় যে বলেছিলুম যে, খাবনা বলবনা,সেকথা আজ ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

২৫শে—হঠাৎ বলেন গুজব শুনছি তপু এসেছে। নিঃশ্বাসের কষ্টর জন্য বাবার ঘরে লোকের ভীড় মোটে হতে দেয়া হতনা। বিনা প্রয়োজনে কেউ ঘরে ঢুকলে আমি বকতুম। তপুকে ডেকে দিই। তপুর হাত ধরে বলেন ভাত খেয়েছ ? মাছ ছিল ? মাথায় বড় কষ্ট বলেন। বলেন অনেক কষ্টে তোমাদের মনের মধ্যে আনছি, আবার তোমরা হারিয়ে যাচ্ছ। এই প্রথম ওষুধ খেতে চান না—বলেন ওরে ও বড়ি গুলো আর জোর করে আমায় খাওয়াসনে তবুও আমি ওষুধ খাওয়াই। রাত্রে ডেলিরিয়ামের মধ্যে বলেন—কেন সবাই কর্ব্বেনা ? দেশ কি আমার একার ? ধান হলে কি আমার গোলায় উঠবে ? দেবতার মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য আছে মানুষের মধ্যেও আছে প্রকাশ করতে পারলেই হল।

২৬শে—বলেন, গলায় ব্যথা হয়েছে বড্ড, তাই খেতে পার্চ্ছেন না। তখন আমি বলি এই জন্যে বাবা খেতে পাচ্ছিলেন না আমি শুধু শুধু রাগ করেছি তাতে বলেন তোমরা সময়ে বোঝনাত ? রাত্রে খতুও ধরণী বাবার কাছে থাকে। রাত ১২টার সময় ধরণী আমায় ডাকে, ধরণীবলে বাবা নাকি খতু কি ধরণী কারুকে দাদা ভেবে খুব বকছেন, ওরা থামাতে পার্চ্ছেনা। বলেছেন "ওরা কি খাট কাঁধে করেও তোমার সঙ্গে তর্ক করবে ? পিতা পুত্রে কি তর্ক বিতর্কর সম্পর্ক ? তুমি অনুতপ্ত হলে আমার চেয়ে বেশী সুখী কেউ হবেনা।" এই সময় আমি ঘরে যাই বড আলো জ্বেলে বুঝিয়ে বলি কাকে বকছেন বাবা ? দাদাতো এখানে নেই এই তো আমরা রয়েছি তখন বুঝতে পেরে বলেন "তোমাদের বকেছি তাহলে অন্যায় করেছি।"

২৭শে—৯৯ জ্বর হয় গলার গ্ল্যাণ্ড ফোলা দেখা যায়। গলায় ব্যথা বলেন বেশী। পেনিসিলিন দেয়া হল। খাওয়া বন্ধ। রেকটাল স্যালাইন দেয়া হয়। শুধু আর্ত্তনাদ অসহ্য যন্ত্রণা।

২৮শে—হঠাৎ বলেন তোমাদের কল্যান হোক। অনবরত আর্ত্ত চিৎকার। বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সীতানাথকে দেখে অমিয় ভেবে বলেন "কে ? কোন ছেলেটা ? যে জেলে গেছে"। মোনো আসে। অনেক বলার পর তাকে চিনতে পারেন।

২৯শে—খোকন বলে যীশুকেষ্ট তুমি কেমন আছ ? অনেক কষ্টে বলেন "ভালো আছি।" দুর্গা আসে। খানিক বাদে দুর্গাকে চিনতে পেয়ে বলেন

হায়হায় মা। সীতানাথকে আদর করেন। আমি বলি ঐজন্যে তো সীতানাথকে আমার হিংসে হয়। বলেন হিংসে? আবার জ্ঞান চলে যায়। ফের জ্ঞান এসেছে দেখে আমার স্বামী বলেন, আমায় কিছু বলবেন বাবা? অতি শান্ত হেঁসে ওঁর হাত ধরে বলেন "তোমায় আর কি বলবো?"

৩০শে—অক্ষয়কে ডাকেন "আয়রে আয়রে" কি করুণ সুর। আমি জিগেশ করি বাবা আমায় ডাকছেন? বলেন, না। আবার বলি বাবা খতুকে ডাকছেন? বলেন, না। বলি দাদাকে? না। এবার বলি অক্ষয়কে ডাকছেন বাবা? অতিস্নিগ্ধ তৃপ্তির হাঁসি হেঁসে বলেন—"হ্যাঁ'। অক্ষয়কে টেলিগ্রাম করা হয়। দুপুরে "সু সু" করেন আমি দাদা মনে করে বারে বারে দাদার কথাই বলি। হাত নেড়ে জানান্ না। শেষে বোঝা যায় সুনুকে ডাকছেন। সুনুকে আদর করেন "মা মাঁ" বলে কি যে বলেন বোঝা যায়না। আমার বিষয় কিছু বলতে চেয়েছিলেন মনে হয়।

৩১শে—রাত্রে অনেক কথা বলেন। নার্স খতু ও আমি ছিলুম। প্রথমে বলেন "কে আব জলদেবে? তোমবাই দাও" বুঝতে না পেরে বারে বারে আমি জলদিই। তখন খতুকে বলেন "দিদির হাত থেকে জলতুমি একটু দাও।" খতু শুতে যায়। বুনু আমি আর নার্স থাকি। বলেন "উঃ কি বিরাট কি বিশাল—।" তারপব খানিক থেমে বলেন "মনেহল যেন বাবা এসেছেন।" তারপর ডানদিকে ফিবে "আমার চিবুক ধবে হাতে চুমো খান, বলেন আবার যদি জগতে আসি তোর—" এর পবেব কথা বোঝা যায় না।

১লা জুন—কথাবন্ধ জ্ঞানও প্রায় নেই হঠাৎ উনি এসে দাঁড়াতে বলেন "শান্তনু তুমি ভালো আছ তো?" সবাই অবাক হই। আশাকরি আবার হয়তো কথা ফিরে আসবে। সর্ব্বদা আর্ত্তনাদ।

২রা—তিনদিন গলার আওয়াজ বন্ধ। চোখ খুব লাল। বড্ড কষ্ট হচ্ছে? বল্লে ইশারায় জানান্—হ্যাঁ। কষ্ট একটু কমেছে কি? বল্লে জানান—না। মুখের সর্দ্দি ফেলতে বল্লে গিলে ফেলেন। ম্লান হেঁসে ইশারায় জানান্ পার্চ্ছি না।

৩রা—জ্ঞান প্রায়নেই। ডাকলে মাথা নেড়ে উত্তর দেন। মুখে ম্লান হাঁসি। কথা কইবার প্রাণপণে চেষ্টা করেন পারেন না।

৪ঠা—বেড শোর দেখা দেয়। ছোটকাকা এলে শুধু অস্পষ্ট উচ্চারণে বোঝান "পুষ্প" আমি অসুস্থ বোধ করায় শুয়েছিলুম। কাকা এসে বলেন দাদা তোমার নাম কর্চ্ছেন। আমি গিয়ে বসায় বুলুকে ইশারা করে জিগেস করেন আমি কিছু খেয়েছি কিনা জানতে চেয়ে। ৬ মাস পরে আজ কেবল বাঁ দিক ফিরে শোবার চেষ্টা করেন। শোয়ালে কষ্ট হয় কিনা বোঝা যায় না।

৫ই—বেডশোর কমের দিকে। জ্ঞান প্রায়নেই। বুলু আমায় ডাকে বলে মা দেখো দাদু হাঁসছেন। কী করুণ সে হাঁসি। খানিক বাদে আবার 'মা মা' করেন আমি কাছে যেতে অনেক কষ্টে হাত তুলে আমার গালে টোকা দেন্ মনে হল চিনতে পেরেছিলেন। খোকন ডাকে "যীশুকেষ্ট যীশুকেষ্ট" উত্তর না পেয়ে বলে—কি কর্ব্ব বলো? অত করে ডাকলুম তবু যীশুকেষ্ট উত্তরই দিলোনা।

সন্ধ্যা থেকে গলা ঘড় ঘড় আরম্ভ হয়। ভৌমিক বলে অ্যাপনিয়া পিরিয়াডের পর যে জোরে নিঃশ্বাস টানতেন তার জোর কমে এসেছে এটা ভালো নয়। এই থেকে টুক্ করে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া এসে যায়। খুব বৃষ্টি বাদলা বাবার গায়ে সীমা তপুর বোনা উলের জামা দিয়ে দিই। এই দিন রাত ১২ টার পর আমি ঘুমিয়ে পড়ি সারারাত খতু ছিল। ভোর ৪॥ টেয় আমি যাই। তখন গলা ঘড় ঘড় নেই। খেতে গেলেই বিষম লাগে।

৬ই—সকালে বক্সী কাকা আসেন। সামান্য ৯৯ টেম্পারেচার। সকাল ৭টায় শীতলবাবু আসেন বলেন আজ গ্লাণ্ডগুলি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বুকে সর্দ্দির জর, অ্যান্টিম আর্শ দোয়া হয় টেম্পারেচার ৯৮ হয়ে যায় বেড্সোর শুখিয়ে গেছে। বক্সীকাকা বিনোদ বাবু ফিরে যান। চোখে অনবরত সয়ের মত পড়ছে। পরিষ্কার করলে আবার তক্ষুণি পড়ে। পিঠের একটা জায়গায় খুব লাল, বেড সোরের আশঙ্কা। ১২ টায় মাথা ধোয়ান গা স্পাঞ্জ হয়। ১২॥ টায় মোনোর হাতে শেষ দুধ খান। আবার গলার ঘড় ঘড় শব্দ আরম্ভ হয় এবার অনেক জোরে। ১ টায় বীণা আসে তারপর লক্ষ্যকরি, হঠাৎ অ্যাপনিয়া পিরিয়াড বন্ধ হল কেন? সীতানাথ ডাক্তার বাবুর কাছে যায় তিনি বলেন "ওটা ওষুধে হয়েছে ওতো ভালো লক্ষণ।" তারপর দেখি পেটটা যেন ফুলো বোধ হচ্ছে। কালীমোহন যায় ডাক্তার বাবুর কাছে তিনি বলেন ভয়নেই ফলের রস বেশী করে দিতে বল। তারপর হঠাৎ গা বেশী গরম বোধহয় টেম্পারেচার নিই ১০০° ৬, ধরণী যায় ডাক্তারবাবু ওষুধ দেন। ঘড় ঘড় আওয়াজ খুব বাড়ে ঠিক যেন গড়গড়া টানার মত আওয়াজ। খতু যায়, ডাক্তার বাবু বলেন সর্দ্দি সরল হচ্ছে। তারপর লেবুর রস খাওয়ান হয়। তখন মনে হয়েছিল খেয়েছেন মৃত্যুর পর দেখা যায় গলায় আটকে ছিল। হঠাৎ দেখি আগে যেমন ডাকলে চোখ খুলতেন, তেমন আর খুলছেন না। আমার স্বামী পালস দেখে ভয় পান। পালস অত্যন্ত ক্ষীণ। খতু যায় শীতলবাবুকে ডাকতে। বীণা বলে "দিদি দিদি বাবার ঠোঁটটা কেমন নীল হয়ে গেল।" সীতানাথ ভৌমিককে নিয়ে পৌছয় তখন রেসপিরিশন অনেক দূরে দূরে হচ্ছে। মুখে গভীর যন্ত্রণার চিহ্ন। ৩টে ২০ মিনিটে সব শেষ হয় যায়। শীতলবাবুকে নিয়ে খতু

এসে পৌঁছয় তখনও বীণা অক্সিজেন দিচ্ছে। শীতলবাবু বলেন—আর কাকে অক্সিজেন দিচ্ছেন? বক্সীকাকা আসেন।

অশ্রুহীন চক্ষে আমি স্থির হয়ে দেখলুম, আমারই চোখের সামনে নিভে গেল আমার সারা জগতের আলো আমার জীবনের আনন্দ উৎসব যাকিছু প্রাণ প্রাচুর্য্য। একসঙ্গে হারিয়ে ফেললুম, আমার আরাধ্য দেবতা, পিতা, একমাত্র সন্তানকেও।

ধীরে ধীরে রোগ যন্ত্রণা মুছে গেল মুখথেকে। ফুটে উঠলো আগেকার সেই ক্ষমাসুন্দর হাঁসিটুকু ওষ্ঠ প্রান্তে। অসহ মর্মান্তিক বেদনা নিজের মধ্যে দমনকরে একান্ত ভাবে নারায়ণের চরণে সমর্পণ করলুম আমার বক্ষের নিধিকে। বল্লুম ঠাকুর অনেক কষ্টই তো আমায় দিলে শুধু এইটুকু দয়া করো যেন আমার বন্ধন বাধাকে না পেছু ডাকে। কেন·বাবা বললেন "যদি আবার জগতে আসি তোর—" এত দুঃখ পেয়েও কি আমার কাছে আসার সাধ তাঁর মেটেনি? এমন বন্ধন যেন আমি তাঁর না হই।

শুধু পিতা নহ বক্ষের নিধি তুমি
সন্তান হারা মার সে মর্ম্ম ব্যথা
নহে এ মিথ্যা সত্য যে কতখানি
অন্তরর্যামী তুমি জানো সেই কথা।
শত মোনোবুলু তপুর সাধ্য নাই
তোমার অভাব ক্ষণতরে মেটে যাতে
দেহ পড়ে আছে প্রাণ গেছে সেইদিন
তুমি জানো পিতা তোমারই প্রাণের সাথে।
নির্ব্ভর ভরে হাতে তুলে দিলে প্রাণ
সেকথা ভাবিলে আজো কি অধীর মন
শুধু মোর পিতা, সন্তান তুমি নহ
ছিল সেই প্রাণ দেশের দশের ধন
সবি হোল বৃথা আমার ভাগ্য দোষে
অপরাধ ত্রুটী রাশি রাশি মনে পড়ে,
করার যাকিছু সবিষে আমার বাকি
অসহায় হয়ে কেবলই অশ্রু ঝরে।

পরদিন এই খবর অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা বাংলা বসুমতী প্রভৃতি কাগজে জন সাধারণের কাছে পৌছয়। স্থানাভাবে শুধু বসুমতীর লেখাটি এতে উদ্ধৃত করে দিলুম

পরলোকে সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

(দৈনিক বসুমতী ৭ই জুন ১৯৪৮)

গত রবিবার বেলা ৩টা ২০ মিনিটে ৬১ বৎসর বয়সে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ১৯৩ নং ল্যান্সডাউন রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, তিন পুত্র ও এক কন্যা জামাতা এবং অসংখ্য আত্মীয় বন্ধুকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সুকুমার বাবু তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর রামসদন চট্টোপাধ্যায়ের কর্ম্মস্থল যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরাবর খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। বিশেষ যোগ্যতা ও সুনামের সহিত তিনি বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্য্য করিয়া ১৯৩৩ সালে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্ব-ভারতীর পল্লী উন্নয়ন বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনে তিনি প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অগ্রণী হইয়া ঐ কার্য্যে বহু মূল্যবান পরিকল্পনা দিয়া তাহার সমৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধার কার্য্য তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধারের আইন তিনি গভর্ণমেন্টকে দিয়া পাশ করাইয়াছিলেন।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুকুমার বাবুর অসুস্থতার খবর পাইয়া তাঁহার ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া কঠিন রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি পশ্চিমবঙ্গের পুষ্করিণীর পঙ্কো-দ্ধারের বিষয় তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।

বাহিরের নাম ও আড়ম্বর তিনি ভালবাসিতেন না, সে কারণ সরকার বাহাদুর প্রদত্ত রায়বাহাদুর ও এম-বি-ই পদবী তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশ বাঁকুড়া জেলার তিনি আদর্শ সুসন্তান ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত শ্রদ্ধের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর ও বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন সমিতিরও সভাপতি ছিলেন।

তাঁহার মত উদার, চিন্তাশীল ও সত্যকারের কর্মীর অভাবে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

আর দিলুম ঐ দিনের বাঁকুড়া দর্পণের লেখাটুকু। যে দেশের জন্ম মৃত্যু-শয্যায় শুয়েও তার চিন্তার বিরাম ছিল না।

বাঁকুড়া-দর্পণ

(৮ই জুন ১৯৪৮)

তিরোধান

দুর্যোগের ঘনঘটা যতোই নিবিড় হয়ে আসছে,—দুর্ভাগ্যক্রমে ততোই বাঁকুড়ার ভাগ্যাকাশ হতে একটির পর একটি ক'রে তারকা খসে খসে পড়ছে বাঁকুড়াবাসীকে অনন্তশোকসাগরে নিমজ্জিত করে।

মর্ম্মান্তিক দুঃখের সঙ্গেই আমাদের জানাতে হচ্ছে যে, গত ৬ই জুন, রবিবার বেলা ৩টায় শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে অমর্ত্তলোকে চলে গেছেন।

বাঁকুড়ার এক সুপ্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ পরিবারের সন্তান, ৺রায় বাহাদুর রাম-সদন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শিশু সুকুমারের জন্ম—যশোরে ইংরেজী ডিসেম্বর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র চিরযুবা সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, সি, এস, যৌবনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যকালে কয়েক বৎসর বাঁকুড়ায় অবস্থান করেন। সেই সময় ইংরাজ সরকার তাঁকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সভ্য (M, B, E) মনোনীত করে। ইংরাজী ১৯২৮ সালে তিনি বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের অন্যতম কর্ণধার ও ১৯৩৬ সালে বাংলা সরকারের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা (Inspector general) নিযুক্ত হন। বঙ্গদেশে বয়ঃপ্রাপ্তদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে তাঁকে সরকার হ'তে এই সময় 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নিখিল ভারত কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের (A, I, Institute of agricultural Economics) ও তিনি ছিলেন জীবন সভ্য। I, G, R, এর পদে অধিষ্ঠান থাকার কালে তৎকালীন সরকারের সঙ্গে মতদ্বৈধ বিধায়, শ্রীনিকেতনের গঠনমূলক কাজে—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আহ্বান করলে—অসময়ে সরকারী চাকরী হ'তে অবসর নিয়ে তিনি কয়েক বৎসরের জন্য শ্রীনিকেতনের সচিবের পদ অলঙ্কৃত করেন। ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা দূরী-করণের জন্যে সরকার তাঁর সাহায্য চাইলে সুকুমার বাবু আবার সরকারী বিভাগে ফিরে আসেন ও পরে বাংলা সরকারের উন্নয়ন বিভাগের ডেপুটি কমিশনার হন। এই সময় তৎকালীন লীগ সরকার ও তার ফলে সে

সময় সরকারী মহলে যে অসন্তোষের প্রতিক্রিয়া হয়—তারই উপযুক্ত প্রত্যুত্তর হিসাবে তিনি নিজের জেলায় স্বনামধন্য কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ সিংহের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া জেলা রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটী গঠন করেন। এর পর তিনি রাজদত্ত ভূষণরূপ 'রায় বাহাদুর' পদবী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সভ্য পদ ত্যাগ করেন ও বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন সমিতির সভাপতিত্ব অলঙ্কৃত করেন জেলার একনিষ্ঠ হিতসাধনে সংগঠন ও উন্নয়নমূলক কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁর এই দেশসেবার ব্রতে ছিলেন সচেতন ও উৎকণ্ঠ, তাই রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন শেষবার কলিকাতায় আসেন তখনও তাঁকে দেখি মৃত্যুশয্যায় শায়িত এই অক্লান্ত কর্ম্মীর সাথে এই বিষয়ে আলাপ কর'তে। তৎপরিচালিত জেলা উন্নয়ন সমিতির কার্য্যতৎপরতার সম্বন্ধে 'প্রবাসী' ও 'বাঁকুড়া দর্পণ' স্তম্ভে বিভিন্ন সময়ে যে সকল আলোচনা হয়েছে দেশবাসী সাধারণ তার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত।

জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বাঁকুড়ার একনিষ্ঠ সেবক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখে সেবা ও চরিত্রবলে বাঁকুড়া তথা সেই সেই প্রতিষ্ঠান সমূহকে সম্মানিত করে গেছেন। আজীবন তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর একজন মহৎকর্ম্মী এবং রামানন্দ বাবুর তিরোধানের পর সহ-সভাপতি সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপর যখন এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব আরোপিত হয় তখন বাঁকুডাবাসী সেই দুর্য্যোগ মুহূর্ত্তেও আশার আলো দেখেছিল। কিন্তু সম্মিলনের কলিকাতার কার্য্যকরী সমিতির কয়েকজন বাস্তুঘুঘুদের নিয়ে যথাযথ কায্য পরিচালনা অসম্ভব বিবেচনায়, তিনি মাত্র ৪ মাস পূর্ব্বে সভাপতির আসন ত্যাগ করেন।

কিন্তু বাঁকুড়াবাসীর বিশেষ দুর্ভাগ্য গত ডিসেম্বর মাসে তিনি মিহিজামে তাঁর কন্যার বাড়ীতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই দীর্ঘ ছয়মাস যাবৎ শয্যাশায়ী থাকিয়া গত রবিবার কলিকাতায় সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ করেছেন।—তাঁহার সেবার ভার তাঁহার কন্যা, জামাতা ও কনিষ্ঠ পুত্র যথাযথ পালন করেন।

সুকুমার বাবুর বিধবা জননী বৃদ্ধ, বিধবা পত্নী অপ্রকৃতিস্থা, তিন পুত্রের একজন সাত সাগরের পারে বিলেতে, মুহ্যমান পুত্র, কনিষ্ঠভ্রাতা বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও কন্যা জামাতা শোকে আচ্ছন্ন। তাঁদেরকে, স্বজন বর্গকে অগণিত সপ্রশংস বন্ধু ও দেশবাসীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—তাঁর অমর আত্মাই যেন সকলকে সান্ত্বনা দেয়; বাঁকুড়ার এই দুঃসময়ে তাঁর আদর্শ ও আশীর্ব্বাদ যেন আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

বাঁকুড়াবাসীকেও বলবার আমাদের কিছু নেই; শুধু বলবো—বাঁকুড়াবাসী! কাঁদো; চোখের জলে তর্পণ কর, বলো—

ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!

বাঁকুড়া সম্মিলনী

৩নং ভবানী দত্তর লেন।
কলিকাতা
১২।৩।৪৮

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে গত ১০।৬।৪৮ তারিখে ৩নং ভবানী দত্তর লেনে বাঁকুড়া সম্মিলনীর এক শোকসভা হয় সম্মিলনীর নির্দ্দেশমত সভায় গৃহীত প্রস্তাবের অনুলিপি আপনাকে এইসঙ্গে পাঠাইতেছি।

ইতি—বিনীত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কর্ম্মসচিব—

"বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল ও হাঁসপাতালের ছাত্র ও শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর শোকসভা সম্মিলনীর সভাপতি শ্রদ্ধেয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এর পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং জেলার দরদী ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকামী বন্ধুর বিয়োগে অপূরণীয় অভাব অনুভব করিতেছে। এই সভায় তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে এবং তাঁহার শোকতপ্ত পরিবারবর্গকে সহবেদনা ও সহানুভূতি জানাইতেছে।

স্বাক্ষর—
রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়—(চেয়ার ম্যান)

বাঁকুড়া সম্মিলনী

শোকসভা

তারিখ ১০।৬।৪৮

আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ণকার্য্যতৎপর হৃদয়বান ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৬১ বৎসর বয়সে ২৩শে জৈষ্ঠ সন ১৩৫৫ বেলা ৩টের সময় পরলোক গমন করায় বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভ্যগণ গভীর শোকাক্রান্ত অন্তঃকরণে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি দেশের এবং বাঁকুড়া সম্মিলনীর একজন একান্ত উদ্যোগী কর্ম্মী ছিলেন। সম্মিলনীর সভাপতিরূপে তাঁহার কার্য্য তৎপরতা অতুলনীয়।

তাঁহার অভাবে বিশেষতঃ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সম্মিলনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

এই মন্তব্যের অনুলিপি তাঁহার ভ্রাতা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে তাঁহাদের পরিবারবর্গের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হউক।

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
কর্ম্মসচিব

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি

বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন সমিতি
বিশেষ সভা

স্থান—সমিতির কার্য্যালয়।
সময়—অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।
তাং—১১ই জুন ১৯৪৮।

সভাপতি—অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন সমিতির অদ্যকার এই বিশেষ সভা সবিশেষ ও মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছে যে এই দরিদ্রতম জেলার সম্যক হিতসাধনে আজীবন ব্রতী জেলার একনিষ্ঠ কর্ম্মী আমাদের সমিতির সভাপতি মহাপ্রাণ শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ৬ই জুন রবিবার বেলা ৮টে ৩০ মিনিটের সময় জেলাবাসীকে অনন্ত শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া অমর্ত্ত্যলোকে মহাপ্রয়াণ করেছেন। সুকুমার বাবু ঐ জেলায় ২৮ বৎসর পূর্ব্বে সরকারি কার্য্যব্যপদেশে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ৺গুরুসদয় দত্ত মহোদয়ের সমভিব্যাহারে এই জেলার সমুদয় সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলার যাবতীয় কৃষি সেচ সমবায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই ছিলেন আ-মৃত্যু সচেতন ও সক্রিয়। জেলার কৃষি ও সেচ বিষয় সমস্যা সমাধানের যে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন তাহার সাধন কল্পে যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা শুধু মহৎ দৃষ্টান্তের মূল্যেই মূল্যবান নয়। বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার উপযুক্ত। বাঁকুড়া জেলার কো অর্ডিনেশান কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও জেলা উন্নয়ন সমিতির সভাপতিরূপে জেলার সত্যকার হিতসাধনে জীবন সায়াহ্নেও তিনি যে অসাধারণ ও অতি অদ্ভুত প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার জন্য শুধু বাঁকুড়াবাসীই নয় এতদ অঞ্চলের সমুদয় দেশবাসী সাধারণ তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আজীবন আবদ্ধ থাকিবে। জেলা উন্নয়ন সমিতির এই বিশেষ সভা তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করিতেছে এবং কামনা করিতেছে যে তাঁহার আদর্শ ও আশীর্ব্বাদ জেলাবাসীকে যেন চিরদিন সৎপথে পরিচালিত করে।

তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ও অগণিত সপ্রশংস গুণগ্রাহী দেশবাসী সাধারণকে এই সভা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিবারবর্গকে অবগতির জন্য ১৭৩ ল্যান্সডাউন রোডে প্রেরিত হউক।

সম্পাদক—
স্বাঃ—শ্রীখৃষ্টচরণ পাণ্ডে।

শ্রীশশাঙ্কশেখর ঘোষ।
সভাপতি।

INSTITUTE OF RURAL RECONSTRUCTION

Sriniketan

Visya Bharati

Founder President—
Rabindra Nath Tagore.

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
১৭৩নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পিতা রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে শ্রীনিকেতনবাসী সকলেই বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন। শ্রীনিকেতনে থাকিয়া পল্লীসংগঠন কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তিনি যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মত আদর্শবাদী লোকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার সংস্পর্শে এখানকার যে সকল কর্ম্মী আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি শ্রীনিকেতনের সকল কর্ম্মীই গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং শ্রীনিকেতনের জন্য তাঁহার কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছেন।

আপনাদের শোকে অংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীনিকেতনকর্ম্মীসংঘ যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন তাহার নকল এই সঙ্গে পাঠান হইল।

নমস্কারান্তে ইতি—

বিনীত—

শ্রীনিকেতন।
১০।৩।৪৮

জ্যোতিঃ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
(সম্পাদক কর্ম্মীসংঘ)

১২।৩।৪৮ তারিখে

শ্রীনিকেতনের কর্ম্মিসংঘের শোকসভার

(গৃহীত প্রস্তাবের নকল)

শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন উপসচিব (ডেপুটী সেক্রেটারী) রায় বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শ্রীনিকেতন কর্ম্মিসংঘের এই সভা গভীর

শোক প্রকাশ করিতেছে। এবং তাঁহার আদর্শও কর্মনিষ্ঠা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছে। শ্রীনিকেতনের কর্ম্মিসংঘের সভ্যগণ তাঁহার অমর আত্মার শান্তি কামনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সম্পাদক কর্ম্মিসংঘ
জ্যোতিঃ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

Sri Mákhan Lal Banerji,
Secretary, Bhatpara Municipal
Employees Association.

Dear Sir,

I beg to forward herewith on behalf of this Association an extract from th. proceedings of the meeting held on 15-6-48 at the Municipal Office, Bhatpara,

Sri Sudhir Kumar Chatterjee, Yours faithfully
193, Lansdown Road Extension M, Mukherjee.
Calcutta

Resolution N. 2

Sri Subodh Kumar Banerji informed the house reg- death of Sri Sukumar Chatterji, Late Executive Officer of the Bhatpara Municipality.

The deceased took a keen interest in the affairs of this Municipality and particularly to the welfare of the Municipal employees and it was felt that at the critical days of 1943 the staff would have terribly suffered but for kind assistance offered by the late Executive Officer in various ways.

Resolved that this Association records its deep sorrow at the sad demise of Sri Sukumar Chatterji (then Rai Bahadur which title was since renounced).

Further resolved that a copy of this be sent to the members of the bereaved family.

Viswa Bharati News—Volume XVI. No 12

June 1948

We deeply regret to announce the death of Sukumar Chatterjee on June 6th. last. He had been Suffering from heart trouble for the last few months, he vas 61 at the time of his death.

A nephew of late Ramananda Chatterjee, early in his life Sukumar Babu came under the influence of Gurudeva's teachings and was, along with a number of his contemporaries, one of the most avid readers of Gurudeva's literature. As a Senior member of the Bengal Civil Service he tried to give effect to a number of Nation Building projects in accordance with Gurudeva's ideal of rural reconstruction. He left Goverment service while holding the highly responsible post of Inspector General of Registration, and served our Institute at Sriniketan as Depfuy Secretary for a period of more than two years. He directed the activities of the Institute with commend able Enthusiasm and rendered valuable Service to Viswa Bharati

We share his loss with the bereaved members of his family to whom we convey our heartfelt Sympathy.

প্রবাসী আষাঢ় ১৩৫৫

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন) পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। সুকুমার বাবু বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামসদন চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র।

সুকুমার বাবু ১৯০৮ সনে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯৩৬ সনে ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল অফ

রেজিষ্ট্রেশন পদে উন্নীত হন। সত্যকার স্বদেশপ্রীতি থাকিলে ইংরেজ আমলের শেষের দিকে সরকারী কর্ম্মচারীরা কখন কখন কিরূপে দেশের কাজ সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাইতে পারিতেন সুকুমার বাবু ছিলেন তাঁহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বীরভূম জেলার দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব বিমোচনে, গোপালগঞ্জের কচুরীপানা ধ্বংস-কার্য্যে, ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটির উন্নতি-বিধানে তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার রচিত বয়স্কদের শিক্ষা-পরিকল্পনা তৎকালীন বাংলা-সরকার গ্রহণ করেন। তিনি বয়স্কদের সহজ-পাঠ 'পড়ার বই' প্রবর্ত্তন করেন। সুকুমার বাবু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সরকারী কর্ম্ম ছাড়িয়া ১৯৩৮ সনে বিশ্বভারতীর পল্লীউন্নয়ন বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার অবসর গ্রহণের অল্পকয়েক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। দেশসেবায় তাঁহার এতাদৃশ ত্যাগস্বীকার কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি দেশের কথা ভাবিয়া গিয়াছেন। 'পশ্চিম বঙ্গের দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ জলাভাব ও সেচের অব্যবস্থা। আর ইহার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে সেচোপযোগী পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার দ্বারা। সুকুমার বাবু অসুস্থ অবস্থায়ও এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন এবং আলাপ-আলোচনা চালান। বাঁকুড়ার তিনি আদর্শ সুসন্তান ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর ও বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতির সভাপতি ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য সুকুমার বাবুর বড় প্রিয় ছিল। রবীন্দ্র সাহিত্যেও তাঁহার গভীর প্রবেশ ছিল।

মাসিক বসুমতী আষাঢ় ১৩৫৫

পরলোকে সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেশকর্ম্মী শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ৬ই রবিবার তাহার ১৯৩ নং ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, তিন পুত্র, একমাত্র জামাতা, কন্যা, এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী বন্ধু ও দরিদ্র আশ্রিতদের শোক-সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃঃ পিতা রায় বাহাদুর রামসদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মস্থল যশোহরে শিশু সুকুমারের জন্ম হয়। বালক সুকুমার শিশুকাল হইতেই তাঁহার অসামান্য বিদ্যানুরাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই ইংরাজী সাহিত্যে বরাবর তিনি প্রথম হন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান শুধু তাহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্য ও রবীন্দ্র সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ১৯০৮ খৃঃ বি,সি,এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রচুর

যোগ্যতা ও সুনামের সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯৩৬ সালে ইনস্পেক্টার জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেশন পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু উচ্চ-পদ ও অর্থের মোহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ১৯৩৮ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই তিনি রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্বভারতীর পল্লী উন্নয়ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময় চাকুরী ছাড়ার জন্য সুকুমার বাবু ন্যূনপক্ষে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা ক্ষতি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছেন। আই জি আর পদের ১২০০৲ মাহিনার পরিবর্ত্তে শ্রীনিকেতন সচিবের পদের জন্য যে ১০০৲ মাত্র লইতেন, তাহাও প্রতি মাসে বাঁকুড়া রিলিফে দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অন্যান্য কর্ম্মীদের সহিত মত-বিরোধ হওয়ায় ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্ম্মকর্তা হইয়া সেখানে যান। ইহার পর পুষ্করিণী সংস্কারের স্পেশাল অফিসার হইয়া রাইটার্স বিল্ডিংএ কিছু কাল কাজ করেন। বাংলা দেশের পুষ্করিণী সংস্কার বিষয়ে তিনি অনেক নূতন আইন ও ব্যবস্থা করিয়া দেশের ও দশের প্রচুর হিতসাধন করিয়াছেন। বয়স্ক শিক্ষা সঙ্ঘদেব তিনিই প্রথম ও প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ হন। সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া বয়স্কদের জন্য পড়ার বই প্রবর্ত্তন তাঁহার দ্বারাই হয়। রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারের প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অগ্রদূত। বহু সুধিবৃন্দের সহিত একত্র কাজ করিয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকা তুলিয়া পরে নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্পণ করেন। দেশের কুটীরশিল্পের দ্বারা দরিদ্র দেশবাসীর কত সহজে যে জীবন যাপনের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তাহাও বিস্ময়কর। তাঁহার খুল্লতাত শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভাপতি হন। বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন সমিতিরও তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৬ সালে বাঁকুড়া মেদিনীপুরের দুর্গম পল্লী-অঞ্চলে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কার্য্য পরিচালনা করিতে করিতে তাঁহার একমাত্র কন্যার কঠিন রোগসংবাদ পাইয়া তাঁহার বৈবাহিক স্বনামধন্য অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মিহিজামের বাড়ীতে যান ও পরদিন সহসা কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনা হয়। ঐ সময় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুকুমার বাবুকে দেখিতে আসেন। ঐ দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও ডাঃ প্রসাদকে তাঁহার পুকুর পঙ্কোদ্ধারের বিষয় মন্তব্য জানান এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়কে ঐ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে নির্দ্দেশ দেন। রায় বাহাদুর পদবী, এম বি ই খেতাব, করনেশন ও সিলভার জুবিলী ইত্যাদি মেডেল সবই তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু তাঁহার সন্তানগণ পিতৃহারা হইল তাহা নহে, বাংলা দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

বাবা দাদার ব্যবহারে দুঃখিত হয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ দাদাকে করিতে নিষেধ করে গিছলেন এবং আমার মেজ ভাই বিলেতে থাকায় আমার ছোটভাই শ্রীমান সুধীর,বাবার শেষ ইচ্ছামত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ১৯৩ল্যান্সডাউন-রোডে শ্রাদ্ধাদি কাজ করে। সেই শ্রাদ্ধ বাসরে এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি বিতরিত হয়েছিল।

পরলোকে সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

—::*::—

৬ই জুন রবিবার তিনটে পনেরো মিনিটে ৬১ বৎসব বয়সে শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাব ১৯৩ নং ল্যান্সডাউন রোডস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, তিনপুত্র, ভ্রাতা একমাত্র জামাতা, কন্যা ও অসংখ্য আত্মীয় বন্ধুকে শোক সাগবে ভাসাইযা গিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সম্মান রক্ষার্থে, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট রেজিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্ট, ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, বাকুডা মেডিকেল স্কুল এবং বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ছুটি দেওয়া হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সুকুমার বাবু ১৮৮৬ খৃঃ ডিসেম্বব মাসে তাঁহার পিতা ৺রাম সদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের,কর্ম্মস্থলে, যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরাবর অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৮ খৃঃ তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। বিশেষ যোগ্যতা ও সুনামের সহিত তিনি বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন পদে কায্য কবিয়া ১৯২৬ সালে ইনসপেক্টাব জেনারেল অফ্ রেজিষ্ট্রেশান হন। তাঁহার মনস্তত্ব সাধারণ রাজ কর্ম্মচারী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, গীতা, কুমার সম্ভব, রঘুবংশ ইত্যাদি তাঁহার সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ছিল। রবীন্দ্র সাহিত্যে তাঁহার সমান অধিকার খুব কম লোকেরই ছিল।

দেশের উন্নতি ও দরিদ্র দুঃস্থ দেশবাসীর মঙ্গল সাধনই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। ১৯৩৮ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের ইচ্ছায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্বভারতীর পল্লী উন্নয়ন বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে রেজিষ্ট্রি বিভাগে তাঁহার মাহিনা ১২০০৲ টাকা ছিল এবং বৃদ্ধি ও পেনসেনাদিতে ঐ সময় চাকুরী ছাড়ার জন্য তাঁহার হ্যান পক্ষে

৪৫ হাজার টাকা ক্ষতি তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন। বিশ্বভারতী হইতে মাত্র যে ১০০৲ টাকা পাইতেন তাহা প্রতি মাসে বাঁকুড়া রিলিফে দান করিয়াছেন। তাঁহার বাসের জন্য রবীন্দ্রনাথ স্থরুলের বিখ্যাত সুসজ্জিত গেষ্টহাউসটিতে সুকুমার বাবুকে থাকিতে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী না হইয়া সাধারণ কেরাণী ও কর্ম্মীদের সঙ্গে সমান কোয়টার্স লন। সব সময় সকল কাজের মধ্যেই তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মশক্তির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। বীরভূম জেলায় থাকাকালীন সেখানকার আঁকড় ডালের লাঠি, তালপাতার পাখা ও তালের রসের গুড় ইত্যাদির প্রথম প্রচলন তিনিই করেন। ঐ আঁকড় গাছের শিকড় পূর্ব্বে শুধু দরিদ্রের গৃহের অনিষ্টই করিত। শেষে তাঁহার নির্দ্দেশে সেই ক্ষতির জিনিষই প্রচুর লাভের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্য বোধ হইতে ছোট বড় কেহ না বঞ্চিত হয় এ বিষয়ে সর্ব্বদা তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। যাহারই হউক না কেন একটু খালি জায়গা দেখিলেই সেখানে যাহা সহজে মরে না এইরূপ নানা ফলও ফুলের গাছ তৎক্ষণাৎ লাগানির তিনি ব্যবস্থা করিতেন। খারাপ কুলের গাছে চোখ কলম বসাইয়া দরিদ্র পল্লীশিশুদের আনন্দের যে ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও রহিয়াছে।

একবার বীরভূম জেলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে খাদ্য ও জলের অভাবে অনেক মানুষ ও গরুর প্রাণ রক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, তখন তিনি কোপাই নদীর ধারে খোঁয়াড় তৈরি করিয়া হাজার হাজার গরুর জলের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

গোপালগঞ্জে থাকার সময় তিনি কচুরী পানা ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ধান রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন তিনি ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির চীফ্ একজিকিউটিভ আফিসার তখন সেখানকার একটি বিখ্যাত পচা ড্রেনের তিনি সংস্কার করাইয়া তাহার পাশে ক্যানা ও গোল্ড মোহরের গাছ লাগাইয়া অতি সুন্দর একটি রমণীয় স্থান সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই স্থানে মেথরদের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা ও সুন্দর বাসস্থান করাইয়া দেন। মেথর বস্তিতে কলেরার সময় নিজে হাতে কাজ করার জন্য একবার কঠিন কলেরা রোগে আক্রান্ত হন।

তিনিই প্রথম বাংলা দেশে বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেন সেই সময়ের গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন ও শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক সেই কল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনিই বয়স্ক শিক্ষা সংসদের প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষ হন। ক' একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন বয়স্কদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষা করা বড় দুরূহ হইত। যে শব্দ

গুলি সকলের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের জন্য সহজসাধ্য "পল্লীর বই" প্রবর্ত্তন তিনিই করেন।

রবীন্দ্র মেমোরিয়ালের প্রথম প্রচেষ্টা ও তাঁহার দ্বারাই হয় তিনি মাননীয় নলিনী সরকার জাষ্টিসএস,আর,দাস, ও বি, কে গুহ একত্র কাজ করেন এবং ৫০ হাজার টাকা তুলে , সুরেশ মজুমদার মহাশয় ঐ কাজ আরম্ভ করায় তাঁর হাতে দেন। তিনি রেজিষ্ট্রেশান বিভাগেও অনেক নূতন আইন প্রচলন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটি ছিল যে জমীবেচাকেনায টিপ সহির পরিবর্ত্তে দলিলাদিতে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম সই করা। ইহাতে স্বার্থের খাতিরে জনসাধারণ অন্ততঃ কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। এবং অনেকেই নানা প্রকার জালিয়াতির ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইত। এছাড়া তিনি সরকার বাহাদুরকে কত যে নানা বিষয়ে কত পরিকল্পনা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহারই পরামর্শে দুর্ভিক্ষ আইনের অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ জলাভাব ও সেচের অব্যবস্থা। তাহার একমাত্র প্রতিকার সেচোপযোগী পুষ্করিণী সকলের পঙ্কোদ্ধার। তিনি এই সম্পর্কে বহু নিয়ম ও প্রয়োজনীয় আইন পাশ করাইয়াছিলেন। বাংলা দেশের পুকুর উন্নয়ন ও সংস্কার ছিল তাঁর দেশ সেবার মন্ত্র। সমবায় সমিতিতে কাজকরার সময় পুকুরের উন্নতিকল্পে তিনি বহুবিধ ব্যবস্থা করেন। একের পুকুর ও অন্যের জমি হওয়ার ফলে কেহই পুকুর সংস্কার করিত না। তাঁহার ব্যবস্থায় সমবায় সমিতির টাকায় পুকুর সংস্কার করিয়া যাহাদের জমীতে সেচ দেওয়া হইত তাহাদের ধান হইলে ঐ টাকা আদায় করা হইত। ঐরূপে বাঁকুড়া ও বীরভূমে বহু পুকুর সংস্কার করাইয়া ও কাটাইয়া কত সহস্র সহস্র প্রাণীর যে জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নিজের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি তাঁহার কোনদিনই লক্ষ্য ছিল না। শেষ বয়সে অসুস্থ শরীরে দেশের জন্য বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের নানান্ দুর্গমস্থানে নিজে যাইয়া বহু কষ্ট সহিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের কাজ ও চিন্তাই তাঁহার ধ্যান ও জ্ঞান ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি দিল্লী যাইয়া শ্রদ্ধেয় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধারের বিষয় নানা পরিকল্পনা ও অর্থ নৈতিক সমালোচনা করেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন খাদ্য সচিব ছিলেন। তাহার এই আলোচনার পর ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ শেঠীকে বাংলা সরকারের সহিত আলোচনার জন্য পাঠান। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তখনকার লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর সহানুভূতির অভাবে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। তিনি যখন শেষ শয্যায় দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন তখন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে দেখিতে ১৯৩নং ল্যান্সডাউন রোডে আসেন। তখনও তিনি পুকুর

পরোক্ষারের বিষয় তাঁহার মন্তব্য ডাঃ প্রসাদকে জানান এবং তিনি তৎক্ষণাৎ পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায়কে এই বিষয় জানাইয়া যাহাতে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয় দৃষ্টি রাখেন তাহার নির্দ্দেশ দেন।

১৯৪৬ সালের শেষে দাঙ্গা পীড়িত দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বসতি কার্য্যে তিনি হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে নোয়াখালি যান ও সেখানকার কার্য্যভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া পরিশ্রম করাই তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

তাঁহার দেশ, বাঁকুড়ার তিনি আদর্শ সুসন্তান ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের চিন্তাই করিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর ও বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কার্য্য পরিচালনার মধ্যে তাঁহার একমাত্র কন্যার কঠিন রোগ সংবাদ পাইয়া তাঁহার বৈবাহিক অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মিহিজামের বাড়ীতে যান এবং তাহার পরদিনই সহসা কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

বাহিরের নাম তিনি ভালবাসিতেন না সেই জন্য সরকার প্রদত্ত রায় বাহাদুর এম্, বি, ই, পদবী, করনেশান মেডেল, সিলভার জুবিলি মেডেল ইত্যাদি সবই তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে কত দুস্থ ও দরিদ্রের যে নিজ ব্যয়ে তিনি শিক্ষা ও সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার মত উন্নত হৃদয় পরদুঃখকাতর চিন্তাশীল ও সত্যকারের নীরব কর্ম্মী সংসারে বিরল। শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই ছিলেন।

দৈনিক বসুমতী

(১৭ই জুন ১৯৪৮ সাল)

গত ১৬ই জুন বুধবার ১৯৩নং ল্যান্সডাউন রোডে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তাঁহার সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে মিঃ বি কে গুহ আই-সি-এস, মিঃ কে কে হাজরা আই-সি-এস, মিঃ এ বি গাঙ্গুলী আই-সি-এস, রায় বাহাদুর বিনোদবিহারী সরকার, রায় বাহাদুর বিজয় মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর তারক রায়, রায় বাহাদুর ভবেশ রায়, রায় বাহাদুর উপেন্দ্র ঘোষ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী চিফ ইঞ্জিনীয়ার, ডাঃ কালিদাস

নাগ, ডাঃ ডি এম সেন সেক্রেটারী এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী পাবলিক সার্ভিস কমিশন, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় দাশগুপ্ত সেক্রেটারী ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, শ্রীগুরুদাস সরকার, শ্রীমায়াতরু হালদার, মিঃ বি বি রায়, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বক্সী, ডাঃ কেনারাম ভট্টাচার্য্য, রেভারেণ্ড বিলাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য্য ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী (শান্তি নিকেতন), রায় বাহাদুর রনজিৎ চৌধুরী কমিশনার একসাইজ ডিপার্টমেণ্ট, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (ভাটপাড়া), ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার চন্দননগর, বিনয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়. ও ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় (বৈবাহিকদ্বয়) ও আরও অনেক মাননীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সুযোগ্য ভগিনীপতি উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীলোকনাথ মুখোপাধ্যায় ও জামাতা শ্রীশান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায় অতিথিদিগের সম্বর্দ্ধনা করেন। ডাঃ ইন্দু বোস মহাশয় ও শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় সুমধুর কীর্ত্তন গানে সকলকে তৃপ্ত করেন।



১৯৪৩

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটী, চিফ্ একজিকিউটীভ অফিসার

"আমার হিয়ার কমল যে শুধু একেলা আমার নয়
সবাকার চোখে অশ্রুর ধারা দিল সেই পরিচয়"

High Court টালিগঞ্জ
Calcutta.

কল্যাণীয়াসু

আপনার পিতা, পরলোকগত রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে যে কিছু লিখে বলব সেরকম ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সঙ্গে মিশবার কিংবা তাঁকে জানার আমার সুযোগ সুবিধা ঘটেনি।

তবে রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির সম্পর্কে তাঁকে সহকর্মী রূপে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল. সেকাজে তাঁর উদ্যম উৎসাহ, দেখে বিস্মিত হয়েছি। তিনি ছিলেন আইডিয়ালিষ্ট মানুষ। রবীন্দ্র সাহিত্যে তিনি ডুবেছিলেন বলতে পারা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি নিজের সময় ব্যয় করেছিলেন রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির কাজে।

শ্রদ্ধেয় অতুলগুপ্ত মহাশয়, রায়বাহাদুর বিনোদ বিহারী সরকার ও শ্রী বি, কে গুহ মহাশয়রা নিঃসন্দেহে আপনার পিতার সম্বন্ধে আরো ঘনিষ্ঠতর ভাবে বলতে পারবেন।

ইতি

শুভার্থী শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

The Lowis Jubilee Sanitarium
Darjeeling

My dear Sriman Akshaya Kumar

I was disturbed to see in the paper the untimely death of your beloved father, a sincere friend of mine for whom I had the greatest regards. Please accept you all my sincere Sympathy at the great loss sustained by you.

with best wishes.
I remain yours affectionately
Manilal Singha Roy

Rujah Bahadur of
Chakdighi

সবিনয় নিবেদন!

আপনার পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণের সংবাদে ব্যথিত হইলাম। তাঁহার অভাবে দেশ ও দশ সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হইল। আমাকেও আপনাদের সমব্যথী জানিবেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত, তাঁহার আদর্শ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করুক ইহাই প্রার্থনা করি।

সেক্রেটারী এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট· ইতি
গভর্ণমেণ্ট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল। ধীরেন্দ্র মোহন সেন

মিসেস্ এস. এন হালদার I. C. S. ২৬ এলগিন রোড

মাননীয়াসু

আপনার পিতা আমার খুবই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এবং সত্যই তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার কর্ম্মের·উৎসাহ ও আদর্শ আমাকে তাঁহাব সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে যুক্ত কবিয়াছিল। আজ দেশের দুরবস্থার দিনে খাঁটি লোকের অভাব খুবই। কাজেই তাঁব অভাব আপনাদের সহিত আমরাও অনুভব করিতেছি।

আমি সময় করিয়া যদি কিছু লিখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে পারি নিশ্চয়ই তাহা·করিব। তবে তাহা কাহারও পাঠের যোগ্য হইবে একথা ভরসা·করিনা। অবশ্য গভীর শ্রদ্ধা জানানর পক্ষে তাহা হয়তো সত্য এবং খাটি জিনিষ বলে আপনার কাছে তাহার মূল্য হতে পারে।

পিতাব নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং কর্ম্মময় জীবন দিয়ে যাঁরা সন্তানের জন্য পরমার্থ সঞ্চয় করে রেখে যান সে পিতার অভাব কন্যার জীবনের যে কতবড আকুলতার জিনিষ তাহাব আমি ভুক্তভোগী। আপনাকে আমি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। আমার·সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আমি আজ বাঁকুড়া যাইব এবং দিন কয় বাদে ফিরিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা কবিব। পোঃ কার্ডে যে ঠিকানা দিয়াছেন বোধহয় সেই ঠিকানাতেই দেখা হইতে পারিবে।

ইতি—
শ্রীউষা হালদার

H. S. M. Ishaque O.B.E., P.A.S. **No 262 Ingle Road**
(I. C. S.) **Karachi. 30th July 1948.**

Dear Mrs Chatterjee,

In the midst of papers I found a copy of the biography of your deceased husband and one of my dearest friends

Rai Bahadur Sukumar Chatterjee. Death has never spared any living soul, nor will it ever do so. We mourn his loss but it will take a life for his friends and admirers, of whom I had the honour to be one, to forget this very sincere, very genuine and very great social worker, and lover of poor humanity. Please convey this message to your sons also.

To. Mrs. S. Chatterjee
193 Lansdowne Road
Calcutta.

Yours sinceely
H. Ishaque.

S. Basu I. C. S., C. I. E., O.B.E. 3, Bhagowan Das Road
New Delhi.

পূজনীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর জীবন সায়াহ্নে আমার পরিচয় হয়। কিছুদিন আমরা একসঙ্গে কাজও করিয়াছি। দেশের বিশেষতঃ গরীবের এবং গ্রামের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। দেশকে সত্য সত্যই তিনি ভালোবাসিতেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সত্যিকার দেশ প্রেমের এক জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যদি আমরা দেশের সেবা অল্প মাত্রায়ও করিতে পারি তাহাতে তাঁহার পুণ্যাত্মার শান্তি হইবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা তাঁহার আত্মার যেন শান্তি হয়।

সুকুমার বসু

S. Datta. I.C.S. 27 Aurangzeb Road
New Delhi

মাননীয়াসু

কর্ম্মসূত্রে আপনার পিতৃদেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৩৩৭ সালে। নয় বছর পরে আমরা সহকর্ম্মী হিসাবে বাঙ্গলা দেশের কৃষি ও উন্নয়ন বিভাগে কাজ করিয়াছি। তাঁহার দেশপ্রেম ও কর্ম্মস্পৃহা ছিল প্রবল এবং পল্লী উন্নয়নে তাঁহার উৎসাহ ছিল প্রচুর। বাঙ্গলা দেশের পল্লী উন্নয়ন একজনের কাজ নয় বা একদিনের কাজও নয়, অনেক সময় হয়তো আমরা একমত ও হইতে

পারিনাই। কিন্তু তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও আন্তরিক আগ্রহকে সর্ব্বদাই সম্মান করিয়াছি। ভগবান তাঁর পুণ্য আত্মাকে শান্তিদান করুণ ইহাই কামনা।

ইতি
শ্রীসুবিমল দত্ত

শ্রীক্ষিতি নাথ ঘোষ — যশোহর

স্নেহের পুষ্প! আশাকরি আমার চিঠি ও বই তুমি পেয়েছ। তোমার বাবার কোন কথা আমার নিকট গোপন নাই। তাহার Patriotic কার্য্য এবং তদ্বিষয়ক চিন্তা এবং পরিকল্পনা শতদিকে প্রসারিত হয়েছিল কতকমাত্র ফলপ্রসূ হয়েছে। অধিকাংশ হয়নি। সুদীর্ঘ পথ মোটরে চলিতে চলিতে, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ডাকবাঙ্গলার বারান্দায় বসিয়া দিনের পর দিন গভর্ণমেণ্ট ষ্টীমলঞ্চে নদীতে নদীতে বেড়াইয়া পরস্পরের মনের ভাবের আদান প্রদানের কিছু বাকি ছিল না। দুঃখের বিষয় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমাকে বঙ্গ বিভাগ ভূতে পেয়েছিল তজ্জন্য প্রায় নিজের দেড়হাজার এবং চাঁদার টাকা আট নয় হাজার ব্যয় করিয়া কলিকাতা দিল্লি ইত্যাদি করিয়াছি। সে কষ্টেরও শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ইয়ত্বা হয়না। ইহার মধ্যে দুইদিন তোমার বাবাকে এই কার্য্যে সাহায্যর জন্য কলিকাতায় অনেক কষ্ট দিয়াছি কিছুই কাজের হয় নাই। লোকচরিত্র সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে মাত্র। এই সময় একদিন তোমার বাবা তোমার দাদার কথা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় শুনাইয়া আমাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। চিঠি লিখেন নাই। তোমরা যাহা শুনেছ তাহার অধিক যদি কিছু থাকে তাহা তোমাদের শোনার যোগ্য নয় বলিয়া তিনি বলেন নাই। * * * সংসারে আমরা যে আয়ু নিয়ে আসি, যে কর্ম্মফল ভোগ করিতে আসি, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় নাই ভোগ করিতেই হইবে আয়ু থাকিতে কেহ মরেনা, কর্ম্মক্ষয় না হইলে কেহ মরেনা, সুতরাং শোকের কারণ নাই। শুনিয়া থাকিবে যে আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরহইতে আমি ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করি এবং পরাবিদ্যাবিৎ অনেক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনার সুযোগ আমার ঘটেছে। আমার লেখা বইটি পড়িলে সব বুঝিবে। সাক্ষাতে, অনেক কথার আলোচনা করিব। আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভার্থী তোমার
জ্যাঠামশাই

R. K. Mitra I.C.S.

9, Roy Mansion. Elgin Road

কল্যাণীয়াসু!

আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাহচর্য্য লাভের সুযোগ আমার অল্পই হইয়াছিল। আমার দুই অগ্রজের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। সেইজন্য অনুজ হিসাবে আমি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহভাজন হইতে সমর্থ হই।

মনে পড়ে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার কৃষ্ণনগরে যাওয়ার কথা। তাঁহার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত একটি বাগান হইতে নানা প্রকার শাক আমায় পাঠাইয়া ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আলিপুরে আবার দেখা হয়। বলিলেন দার্জ্জিলিং যাইতেছেন ফিরিলে আবার দেখা হইবে। এই দেখা আর হয় নাই। ইহার পর সংবাদ পাই তাঁহার গুরুতর পীড়ার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিল তাঁহার অমরধাম গমনের সংবাদ। তাঁহার অপূর্ব্ব দেশসেবা ও কর্ম্মনিষ্ঠার কথা লোকে ভুলিবে না। আমার ঐকান্তিক সমবেদনা জানিবেন।

ইতি

শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র

Dear Mrs, Mukheji,

I am sorry that my absence in Delhi has prevented my replying earlier to your card of the 30th., which came to me from the Bengal Chamber.

I remember your father, for whom I had the highest regard, and with whom I had a great deal of contact while we were both in Government service. Suffice it to say that I knew him as a fearless fighter for what was right, quite uninfluenced by thoughts of temporary advantage, and of the most resolute character, and principle.

I shall look forward with interest to the publication of your book, for which I wish you every success. Meanwhile, I remain,

11.A. Mayfair
Ballygange.

yours sincerely
J. L. Llewellyn

S. N. Guha Roy, I. C. S.

৮নং মেফেয়ার রোড
কলিকাতা

মাননীয়াসু

আপনার পিতৃদেবের সঙ্গে আমার ঠিক কর্মসূত্রে পরিচয় ঘটে নাই। তিনি যখন শম্ভুনগর ফার্মে থাকিতেন তখন শম্ভুনগর হইতে কৃষ্ণনগর যাতায়াতের পথের পাশেই আমি থাকিতাম। একদিন হঠাৎ তিনি এমনি আমার বাড়ীতে আসিলেন প্রায় সন্ধ্যার সময়। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও নামে এবং কর্মখ্যাতিতে তিনি আমার কাছে অজানা ছিলেন না৷ সেদিন প্রায় ঘণ্টাখানেক আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ইহার পর আর একদিনও আসিয়াছিলেন। শেষ আমার সঙ্গে দেখা হয় একদিন হাওড়া ষ্টেশানে। এইতো আমাদের পরিচয় যথার্থই যেন পথের পাশে কুড়াইয়া পাওয়া। তবু সংবাদ পত্রে যখন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পড়িলাম মনে হইল যেন একজন নিকট বন্ধুই হারাইলাম। এইখানেই তাঁহার প্রকৃতির মাধুর্য্য। শিশু সুলভ সারল্য অকপটতা ও সাহিত্য রসিকতার যে আভাস তাঁহার চরিত্রে এই অল্প পরিচয়েই আমি পাইয়াছিলাম তাহা এ যুগে বিরল একথা মোটেই অত্যুক্তি নয়।

তাঁহার পারিবারিক দুঃখে তিনি পীড়িত হইলেও তাঁহার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন হয় নাই এটা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। আজ তিনি এ পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে আনন্দলোকে সেখানে তাঁহার আত্মা চিরকাল বিরাজ করুক ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা। ইতি—

আপনাদের শুভার্থী
শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

To Puspa Devi
193 Lansdowne Road,

Magistrates House.
Berhampore. W. Bengal.

সুচরিতাসু

আপনার পিতার সঙ্গে শেষ দেখা গত বছর কলিকাতায়। তখনো তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম কিছুমাত্র কমেনি। আমরা হঠাৎ বদলি হয়ে কলকাতা থেকে চলে না এলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হত ও একসঙ্গে দেশের কাজ করা যেত। এখানে আসা অবধি সব সময় ব্যস্ত আছি। তাঁর খোঁজ নিতে পারিনি এমন সময় একজনের মুখে শুনলাম তিনি মৃত্যুশয্যায়। শুনে বিশ্বাস হোলনা। কিন্তু নানা গোলমালে চিঠি লেখা হয়ে উঠলো না। তারপরে খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পড়ে মর্ম্মাহত হয়েছি। * * *

তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপের পর পনের যোলো বছর কেটে গেছে। তাঁর মত কর্মী পুরুষ অল্পই দেখলুম। একটা না একটা আইডিয়া তাঁকে পেয়ে বসতো আর তাই নিয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। কিসে দেশের মঙ্গল হয় এই তাঁর দিবারাত্রির ধ্যান ছিল। কজন রাজনৈতিক কর্মী তাঁরমত দেশ প্রেমিক? * * * জীবনে যত কাজ তিনি সুরু করেছিলেন তত কাজ সারা হয়নি। অমন একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি আর দেখতে পাব কি? তাঁর প্রাণ পরপারে গিয়েও মহান থাকবে। মৃত্যু তার বিশেষ ক্ষতি কর্বে না। আপনারা তাঁর জন্য শোক কর্বেন না।

আমাদের স্নেহ ও শুভাকাঙ্খা জানবেন

ইতি—অন্নদাশঙ্কর রায়

কল্যাণীয়াসু,

অনেকদিন হইতেই সুকুমার বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তিনি যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। বহুদিন সরকারী কর্ম্ম যশের সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্মপ্রবণ জীবনে তাহাতে কিছুমাত্র পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে নাই। তিনি সর্বদাই কর্মচঞ্চল থাকিতেন। কাজ করিতেই তিনি ভালো বাসিতেন এবং কাজের জন্য সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে মনে হইত না যে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের কোথাও ছেদ ঘটিয়াছে। অনেক সৎকর্মে তিনি ইচ্ছা করিয়াই যোগদান করিতেন। আমার বাড়ীর অতি নিকটেই তাঁহার বাড়ী। তিনি যখন সেখানে থাকিতেন তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে উদাত্ত কণ্ঠে তাহার স্তব পাঠ শুনিয়াছি। তিনি সংস্কৃত বেশ ভালো জানিতেন এবং তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ সংবলিত স্তোত্রপাঠ বহুদূর হইতেও লোকে শুনিতে পাইত এবং উপভোগ করিত।

এইরূপ একজন পণ্ডিত সাত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন কর্মনিষ্ঠ বন্ধুর অপ্রত্যাশিত বিয়োগে আমরা ব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার পুত্রকন্যাকে সান্ত্বনা দিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বহুবন্ধু ও সহকর্মী আজ তাঁহাদের সহিত বিয়োগ ব্যথার অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

৬ বালীগঞ্জ প্রেস (অধ্যাপক) শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

Rai Bahadur K. C. Ray. M. A. Manasatala
Retired Inspector of Schools. Chinsurah.

কল্যানীয়াসু

মা পুষ্পরানী! তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। মা আমি অত্যন্ত অসুস্থ হাত কাঁপে লিখিতে পারি না। সেজন্য ইচ্ছাসত্ত্বেও বেশী লিখিতে পারিলাম না। বন্ধুবর সুকুমার বাবুর পারিবারিক সব খবরই আমি জানি। ঐরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তি সাংসারিক হিসাবে কতই না ব্যথা পাইয়া গিয়াছেন। নিয়তির খেলা ছাড়া আর কি বলিব? আমিও ভাগ্যক্রমে অশেষ কষ্ট পাইয়াছি। উভয়ে সমব্যথার ব্যথী আমাদের দুজনের কতনা কথা হইত। পরস্পর পরস্পরকে কর্মপ্রবনতায় জোর দিতে চেষ্টা করিতাম। গীতা উপনিষদ ও রবীন্দ্র সাহিত্য হইতে প্রাণেও মনে বল সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরূপে কাটাইয়া দিয়াছি, সে সব কথা ভুলিবার নয়। নিয়তির বিধান সুকুমার বাবুর মহাপ্রয়াণের সময় আমি ছিলাম পুরীতে। তাহার শেষ দর্শন পাইলাম না। তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি সর্ব্বদা।

ইতি—আঃ
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়

কল্যানীয়াসু,

মা পুষ্প, তোমার পত্রে তোমার পিতাঠাকুর গত হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, আমি ইহা জানিতাম না। তাহার সহিত আমার বহুকাল দেখা হয় নাই, শুনিয়াছিলাম তিনি retire করিয়া বোলপুরে settle করিবেন এবং শান্তিনিকেতন educational work সম্বন্ধে কিছু কাজ করিবেন। তুমি তাহার বন্ধু ক্ষিতীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে লিখিয়াছ কি? তিনি Hoogly Collegeএর Principal হইয়া retire করিয়াছেন এবং চুঁচুড়ায় বাড়ী কিনিয়া retired life যাপন করিতেছেন, আমার সহিত মাঝে মাঝে দেখা হয় (তাঁহার ঠিকানা Kshitish Ch. Roy, M. A. Rai Bahadur—Manshatola, Chinsurah P. O.—Hoogly Dt.)

তুমি তোমার বাবার জীবনী লিখিতেছ শুনিয়া খুব খুসী হইলাম—ইহা বেশ ভাল কাজ। আমার মনে পড়ে ১৯০৫—৬ সালে হিন্দু হোষ্টেলে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরে হইয়াছিল, তোমার বাবা আমার এক ক্লাস উপরে পড়িতেন (আমি যখন 3rd yearএ, তিনি তখন 4th yearএ) তোমার বাবা Universityর খুব কৃতী ছাত্র ছিলেন—আমরা সব হিন্দু হোষ্টেল হইতে

procession করিয়া ৺সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী মহাশয়কে হাওড়া ষ্টেশন হইতে ঘোড়া খুলিয়া গাড়ী টানিয়া গোলদিঘীতে আনিয়াছিলাম। তোমার বাবা এ বিষয়ে খুব অগ্রণী ছিলেন এবং আমরা (তোমার বাবা, আমি এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন) Govt. কলেজ হইতে নাম withdraw করিয়া National Collegeএর খাতায় নাম লিখাইয়াছিলাম। গোলদিঘীর Meetingএ Surendra Nath Banarjee খুব জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং Cal. Universityকে 'গোলামখানা' নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় National University কার্য্যকরী হয় নাই এবং আমরা পরে আবার Presidency College এ ফিরিয়া আসিয়া নিয়মমত লেখাপড়া করি। আমি সময় অভাবে আর বিশেষ কিছু লিখিতে পারিলাম না।

এখন আমি আসি। আশা করি তুমি ভালই আছ। ইতি

১৩।২এ বৃন্দাবন মল্লিক লেন (অধ্যাপক) শ্রীসহায়রাম বসু
কলিকাতা।

সবিনয় নিবেদন

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে আমি একজন পরম নিকট বন্ধুকে হারাইলাম। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা যতদিন বাঁচিব স্মরণ করিব। তিনি বহু দুর্লভ সদগুনের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সরল উদারচেতা অক্লান্ত কর্মী অমায়িক সজ্জন ব্যক্তি বিরল। তিনি দেশকে ও দুস্থকে অন্তরের সহিত ভালোবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের জেলার অপূরনীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমি কি সান্ত্বনা দিব ? শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর মহান্ আত্মা পরমশান্তি ও আনন্দলাভ করুক।

ইতি বিনীত

বাঁকুড়া। শ্রীমনীন্দ্রভূষণ সিংহ

Prof. B. K. Sen. Kamala Niloya.
৩ এ লেবুবাগান লেন

পরমস্নেহাস্পদাসু

মা পুষ্পরাণী! আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমার সহিত পরিচিত নই। কিন্তু হয়তো পিতৃদেবের নিকট শুনিয়া থাকিবে যে আমি তাঁর ছাত্রাবস্থার

একজন ঘনিষ্ঠও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমার পিতৃদেবের তিরোধানে আমি যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছি তা পত্রে লেখা সম্ভব নয়। তাঁর মত মহানুভব সৎকর্মে উৎসাহী কাব্যামোদী দেশের মঙ্গলসাধক সদাব্যস্ত ও জনহিত চিন্তিত নিঃস্বার্থ বন্ধুবৎসল বন্ধু আমার আর নাই। তাঁহার স্বর্গারোহনে আমার জগৎ আরও একক নির্জ্জন সঙ্গীশূন্য ও নিরানন্দময় হইল। তাই আজ তোমাদের এই শোকের সময়ে আমাকেও তোমাদের দুঃখের সমভাগী জানিও। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা তোমাদের মহানুভব পিতার উপযুক্ত সন্তান হইয়া নিজেদের জীবন সার্থক কর।

মা! তোমার পোঃকার্ড খানি যথা সময়েই পেয়েছি।. পেয়ে যথেষ্ট আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করলাম এই ভেবে যে তুমি তোমার এই বিপদের ও শোকের দিনে আমাকে নিজের আত্মীয় ভেবে মনের শোক ও দুঃখের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে .আমাকে পত্র লিখেছ ও দুঃখ পেলাম এই ভেবে যে তোমার আরাধ্য দেবতা স্বরূপ পিতৃদেবের এতকষ্ট পাইয়া ইহধাম ত্যাগ করায় তুমি অসহনীয় যন্ত্রণায় অনেকটা দিশাহারা হইয়া গিয়াছ।

তাই যদি কিছু সান্ত্বনা পাও এই ভেবে চিঠি লিখতে বসেছি। তোমার পিতার সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনধরে। ১৯০৩ সালে যখন তোমার ঠাকুর্দ্দা বহরমপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসেন। তখন তোমার বাবা প্রেসীডেন্সী কলেজে থার্ড ইয়ারে ও আমি বহরমপুর কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। তারপর এই দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরে আমাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আমাদের দুজনের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে আনন্দের মধ্যে ও উদ্দেশ্যের মধ্যে খুব মিল থাকায় আমাদের সত্যকার প্রাণের মিল হয়েছিল এই দীর্ঘ দিন-এর কত স্মৃতি যে আজ আমার মনে ভরে উঠছে তা তোমাকে লিখে জানাবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যদি একবার আস সারাদিন ধরে তোমার বাবার গল্প বলব। তুমি আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত নও। যেদিন মদনমিত্রর লেনের বাড়ীতে তোমার অন্নপ্রাশনে এক গা গয়না পরা ফুটফুটে ছোট মেয়েটিকে প্রথম দেখি, তারপর তোমাদের হরিশ মুখার্জ্জির রোডের বাড়ীতে বৃদ্ধা ঝির কোলে সুর করিয়া "পুষ্পলতা জল শুখালে থাকবি কোথা" ইত্যাদি ছড়া গাইতে, তখন হইতে তোমার সহিত আমার পরিচয়।

মা! তোমার দুর্ব্বিসহ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমার নাই এর একমাত্র উপায় সতত ভগবানের অসীম জ্ঞানের কথা, তাঁর অপরিসীম শক্তির কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা। মানুষের কর্ম্মের উপরই অধিকার আছে, ফলের উপর নাই। আমরা ভগবানকে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে আশা করছি। সকল ভুলের উৎপত্তি এইখানেই। এরই ফলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তির শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজন মনে কত না কষ্ট পান। * * * *

মা! তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না আসতে পারলেও একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়ো যে তোমার মন এখন অনেকটা শান্ত হইয়াছে! তোমার পত্রে তোমার মনের যে ছবি পাইলাম তাহাতে তোমার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তান্বিত রহিলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমায় শান্তি ও সান্ত্বনা দেন ও তুমি তোমার দেবতুল্য পিতার সারা জীবনের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত থেকে তোমার বাকি জীবনের সকল কর্ত্তব্য ভার সহজে বহন করতে পার।

ইতি একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবিনয়কুমার সেন

Rai Bahadur A. D. Banerji 110 Amherst Street

কল্যাণবরাষু মা পুষ্প,

তোমার পিতৃদেবের মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছি! আমরা প্রেসীডেন্সী কলেজে সতীর্থ ছিলাম এবং আলীপুরে আমাদের উভয়ের কর্ম্ম জীবনের সূত্রপাত। ইংরাজী ১৯১২ সনের পরিবর্ত্তনে ভিন্ন প্রদেশগত হইলেও আমাদের সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং পত্রের আদান প্রদানে কোন বাধা ছিল না। সরকারী কার্য্যে কৃতিত্ব হেতু তাহার উচ্চপদ ও সম্মানাদি লাভ প্রচুরই ঘটিয়াছিল কিন্তু তাঁহার চরিত্রে যে সরলতা, ঔদার্য্য, আত্মোৎসর্গ, ও কর্ম্মকুশলতা ছিল তাহার প্রকৃত পরিচয় ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত জানিবার উপায় অনেকের হয় নাই। দরিদ্রের প্রতি তাহার ছিল অসীম সহানুভূতি। সমবায় ঋণ সমিতি স্থাপনে পল্লী সমাজ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যয়িত হয়।

স্বদেশ বাঁকুড়া জেলার উন্নতিকল্পে তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল অবসর গ্রহণের পরও তিনি দেশও দশের হিতকর নানাকাজে নিজেকে অর্পণ করেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে আজ সকলেই ব্যথিত। একমাত্র ভগবানই ঐ শোক নিবারণের আশ্রয় স্থান।

শ্রীঅতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়

N. C. Ghosh. 17, Willingdon Circus
Director General of Civil Aviation. New Delhi

কল্যাণীয়াসু,

কদিন পূর্ব্বে Geneva থেকে ফিরে তোমার পিতৃদেব ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলেম। তাঁর ত শরীর

কর্ম্মপটু ও খুব ভালোই ছিল বরাবর। হঠাৎ তাঁর দেহত্যাগ হবে এ ভাবতেও পারিনি। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁকে বন্ধুভাবে জ্যেষ্ঠ ভায়ের মতই বরাবর দেখেছি। তাঁর স্বর্গপ্রয়াণ ব্যক্তিগতভাবেই আমায় শোকাচ্ছন্ন করেছে। তোমাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। যিনি শোক দুঃখ দিয়েছেন একমাত্র তিনিই সন্তাপের মধ্যে শান্তি বিধান করতে পারেন। তাঁরই ভরসা। প্রার্থনা করি আমার স্বর্গত বন্ধুর আত্মা ব্রহ্মলোকে শান্তিতে বিরাজ করুক।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ

প্রিয় অক্ষয় ভাই।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁর তিরোধানে শুধু আপনাদের ও আমাদের নয়, দেশ ও দশ উভয়েই যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হল সন্দেহ নাই। যে তাঁর সংস্পর্শে কিছুক্ষণের জন্যও এসেছে সেই জানে তাঁর চরিত্রের অসামান্য দৃঢ়তা ও কতটা শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁহার ন্যায় উদার মহাপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যু নাই। নব জগতে তাঁহার দর্শন পাইব না এই আক্ষেপ প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাঁহার ফটো আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে উহাই দেখিয়া প্রাণের নৈরাশ্য দূর করি আপনাদের সহিত আমরাও পিতৃহীন হইয়াছি।

ইতি

বর্দ্ধমান ভাগ্যহীন ভবানীচরণ সেন

মিসেস পি, এন, ব্যানার্জ্জী। ৬ লোয়ার সারকুলার রোড

কল্যাণীয়াসু।

স্নেহের পুষ্প তোমার পিতৃদেবের লোকান্তরের কথা শুনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছি। তুমি মনে করে তাঁর নামে যা লিখেছ তা পাঠিয়েছ দেখে বড় আনন্দিত হয়েছি। প্রীতির নিকট এই বইখানি পড়ে খুব ভালো লেগেছিল। তোমার লেখা চিরদিনই সুন্দর। যা লিখেছ খুব হৃদয়স্পর্শী।

আমি ১২ বৎসর হল আমার পিতৃদেবকে হারিয়েছি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে এ শোকের গভীরতা বিশেষভাবে অনুভব করছি। এ শোকে সান্ত্বনা

দেবার ভাষা নেই, ভগবানের বিধান মাথা পেতে নেয়া ছাড়া উপায় দেখিনা। তোমার পিতার জন্য কতশত লোক আজ চোখের জল ফেলছেন তাঁদের অশ্রুতে তোমার অশ্রু এক হয়ে মিশেই যা সান্ত্বনা পাবে। দীর্ঘদিন তোমার সহিত দেখা হয় নি—তবু আজ এই শোকের দিনে মনেতে আমি তোমার কাছেই আছি জেন। আজকাল চারিদিকেই অশান্তি। কত মহামূল্য প্রাণ যে চলে যাচ্ছে তাঁর সংখ্যা নেই। দেশ ও দশের দুর্ভাগ্য যে তাঁদেরই হারাচ্ছে যারা থাকলে দেশের কত উপকার হোতো। ভগবান যেন তাঁদেরই ডেকে নিচ্ছেন। তাঁর লীলা বোঝবার সাধ্য আমাদের নেই।

ভগবান তোমাকে এই দুর্ব্বিসহ শোক সহ্য করবার ক্ষমতা প্রদান করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।

ইতি তোমার শুভার্থিনী
মায়া দিদি

Mrs. B. K. Ghosh. ৪৬ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট

মা আমার! তোর চিঠি পেয়ে তোর মনের অবস্থা বুঝে মনে যে কত কষ্ট পাচ্ছি বলার নয়। কোথাউ যাবার মত অবস্থা তো নেই সব সময় লেখার শক্তিও পাই না।

তোমার অমন বাবা শেষ জীবনে সন্তানের নিকট এত দুঃখ পেয়ে গেলেন শুনে বড কষ্ট হয়। যাদের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, কত প্রাণপাত করতে হয়, তাদের কাছে আঘাত, সে আঘাতে মানুষের অন্তর ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তিনি তো চলে গেছেন সেই দুঃখ তোমায় মর্ম্মাহত করেছে আঘাতের ওপর আঘাত।

তোমায় তিনি সত্যি সত্যিই বেশী ভালবাসতেন তুমিও যথাসাধ্য করেছ। এ সৌভাগ্য তো সব মেয়ের হয় না। তোমার দুঃখ বেদনা আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব কর্চ্ছি। সত্যিই মা ভাগ্য জোরে যে রত্ন মেলে সে ভাগ্য বুঝিবা সেই সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। তুই ঠিকই বলেছিস মা "বেশী পাওয়ার দুঃখ বড় বেশী" সৌভাগ্যের চরম শিখরে উঠেও যখন মুহূর্ত্তে সব নিঃশেষ হয়ে যায় দাঁড়াবার শক্তিও আর থাকে না।

মা আমার ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে তোর কাছে গিয়ে তোকে বুকে নিয়ে ক্ষণিকের জন্যও তোর এ দুঃখ ব্যথা ভুলিয়ে দিই। মাগো তুই যে কত বড় আঘাত পেয়েছিস তা অন্তরে অন্তরে খুবই অনুভব কর্চ্ছি। এত বড় আঘাত জীবনে পাসনি আর কোনদিন যেন পাও না।

লেখার সময় অন্তরের সব কথা ভাষায় হয় তো প্রকাশ করতে পারিনি তবু এখানের সকলকেই বলেছি "পুষ্পর বাবাই ছিলেন পুষ্পর সব" তোমায় অসীম স্নেহে তিনি ঘিরে রেখেছিলেন। কোন কিছুর অভাব বুঝতে দেননি মায়েও এত স্নেহ এত যত্ন আদরে সন্তানকে ভরিয়ে রাখতে পারে না। অমন পিতা সকলের ভাগ্যেতো হয় না মা। বাপ মা' সকলেরই হয় কিন্তু অমন বাপ কজনের হয়? তোর মনের অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি মা। এত বড় শোক তোর দুর্ব্বহ হয়েছে মা যেন মন ভেঙ্গে পড়েছে। তুই লিখেছিস "বাবা নেই অথচ আমি আছি ভাবতে অবাক লাগে" কত দুঃখে কত কষ্টে যে একথা মনে আসে তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কচ্ছি। কেবলই মনে হয় এরকম দুঃখ তো তোর পাবার কথা নয়?

আমি তোমার বাবাকে চাক্ষুষ দেখিনি বটে কিন্তু মা এমন অনেক সময় হয় যে না চোখে দেখেও কল্পনায় মনঃশ্চক্ষে দেখা যায়। তোর কাছে তোর লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর মূর্ত্তি আমি ধারণা করে নিয়েছিলুম। যখনি তোর কাছে শুনতুম বা পড়তুম আমার চোখের সামনে স্নেহ বাৎসল্য মাখা করুণা-ভরা সৌম্য মূর্ত্তি ভেসে উঠতো। তোর কবিতায় লেখা বাবার কথা পড়েছি মনে হত ছোট্ট মেয়েটি বাবাকে যেন সব ভালোবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে। অপরের কাছে তার দাবী দাওয়া কিছু রাখেনি। সব দেয়া সব পাওয়া তার বাবার কাছেই। তাই আজ এত আঘাত দিচ্ছে মর্ম্মে মর্ম্মে, আশ্চর্য্য করে দিচ্ছে তাঁকে ছেড়ে থাকা, কী বোঝাব মা তোকে অন্তর্যামী তোর অন্তরের ব্যথা মুছে দিন এই প্রার্থনা করি। ছোট ভাই ভাজদের তোমায়ই দেখতে হবে। যাঁর গলায় তুমি মালা দিয়েছ তোমার সে মহাভাগ্যেরও তুলনা হয়না মা বহু সাধনায় মেলে। তারই জন্যে বাবার যথার্থ সন্তানের কাজ তোমরাই করেছ—তাঁহার পুণ্যফলেই এ সৌভাগ্য সম্ভব হয়েছিল তিনিও তাঁর একান্ত স্নেহের ধনকে যোগ্যতম ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। সেই শান্তনুর কথা ভেবেই আজ তোমায় মনে শান্তি আনতে হবে। তোমার বাবা তোমারই আছেন এখনও তোমায় তেমনি ভালোবাসছেন তেমনি স্নেহ করছেন। শান্তনুর শরীর খারাপ, সেওতো কম আঘাত পায়নি মা? অনিয়ম অত্যাচারও কম গেলো না—? তাঁর আশীর্ব্বাদ চিরদিন তোমাদের জীবন ঘিরে থাকবে—। তোর কাছে মন গেলেও দেহটাতো যেতে পাচ্ছে না। লক্ষ্মী মেয়ে আমার, মনকে শান্ত করার চেষ্টা কর, তুই দুঃখ পেলে সেখানে তোর বাবাও যে দুঃখ পাবেন মা। চিঠির উত্তর দিস্। বিলেত থেকে তোর মেজ ভাইটি ফিরেছে কি?

ইতি—

তোর মা।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে

কোন সে সুদিনে দেবের দয়ায় বঙ্গ মনীষার হে নবদূত
এসেছিলে তুমি এই ভারতেতে দেশ মার এক শ্লাঘার সুত
লয়ে অফুরন্ত পাণ্ডিত্য সাধনা মানব সেবার আবেগ ভরে
এসেছিলে তুমি মহান্ ধীমান মোহিতে সদগুণে এমন ক'রে।
কত লোক প্রীতি স্বদেশ বাৎসল্য কি সমাজ চিন্তা প্রগাঢ় জ্ঞান
কি বিচার শক্তি সত্যে অনুরাগ দয়াল তোমায় করিল দান
চির নিরপেক্ষ সাধু ন্যায় নিষ্ঠ তুমি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবান
প্রশান্ত মূরতি সহাস্য বদন স্বভাবের এক সাধের দাম
ন্যায় সুশাসনে বিচার পালনে সাধি কতরূপে দেশের হিত
হয়ে বাঙ্গালীর আশীষ ভাজন হলে স্মরণীয় উদার চিত
জন্মভূমি তব গরবে উজল কর্ম্মভূমি এই সারাটি দেশ
যতনে প্রকৃতি পরাল তোমায় দীনের সেবার মোহন বেশ
জলে ধিকি ধিকি মধুর উজল তোমার বিমল প্রতিভা ভবে
জনহিত ব্রতে রত ওগো ঋষি হেরিয়া প্রণত নমিল সবে।
তারাই পূজিত তাঁরাই বরেণ্য তাঁরাই মানুষ বিশ্বের মাঝে
তোমার মতন যাহারা জীবন দানিল সবার কল্যাণকাজে
সদগুণ সৌরভে কাযের গৌরবে তুষেছিলে দেশ জননী মন
মোদের জাতির গৌরব আস্পদ ভারত মায়ের স্নেহের ধন
দুখীদের তরে কেঁদেছিল হিয়া বেসেছিলে ভালো জীবন ভরে
তাই গেলে চলি কাঁদায়ে সবারে কে অত করিবে দীনের তরে
অভয় ভরা ও বদন কমল হেরিয়া মনেতে সাহস কত
আশ্রয় দিলে নিরাশ্রয়েরে করিলে রক্ষা মায়ের মত।
পূত পবিত্র পাবকের মত তব পরশেতে যা কিছু কালো
পরশ করিয়া হত অমলিন উঠিত ফুটিয়া দীপ্ত আলো
হেথাকার কাজ নাহি হতে শেষ সেথায় গেলে কি কাজের তরে
হের সমাগত সুদিন আসিছে ডাকিছে তোমায় ত্বরিত করে
উঠহে বিজয়ী উঠ দয়াময় ক্লান্ত কেন ও আয়ত আঁখি
ঘুমালে কেন এ অসময়ে তুমি করিতে যে কাজ এখনও বাকি—
গিয়াছ চলিয়া ছাড়ি জগতেরে তবুও অমর মানব বুকে
অযুত নয়নে ঝরিছে অশ্রু তোমারে হারায়ে গভীর দুখে।

শ্রীমহেন্দ্র আচার্য্য। (নোয়াখালি)

নূতনগঞ্জ—বাঁকুড়া

শ্রীচরণেষু

আজিকের অমৃতবাজার পত্রিকা বাঁকুড়াবাসীর কাছে এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে। আজ আবার নূতন করে পিতৃশোক পেলাম। তিনি যে আমাদের কী স্নেহ করতেন এবং বাঁকুড়ার এই উন্নয়ন সমিতির ও নানা সদ অনুষ্ঠানের অস্তিত্বটুকুও যে তাঁর কাছে কি পরিমাণে ঋণী সেকথা লেখার ভাষা আমাদের নেই। প্রার্থনা করি তাঁর অমর আত্মা যেন আমাদের আশীর্ব্বাদ করে এবং চোখের জলেই যেন শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা আমরা পাই। সঙ্গে সঙ্গেই বাঁকুড়া দর্পণে তাঁর জীবনীসহ এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ ছাপানো হয়েছে।

কাল বিকেলে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে মেমোরিয়াল হোলো। বাঁকুড়ার প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত কর্ম্ম পরিষদের এক সভায় এ সংবাদ পৌছনমাত্র সমস্ত কাজ স্থগিত রেখে শ্রীভগবানের নিকট তাঁর অমর আত্মার জন্যে প্রার্থনা ক'রে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাজ্ঞাপক এক প্রস্তাব নেওয়া হয়। জেলা বোর্ড ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ আজ বন্ধ থাকে। আগামী শুক্রবার জেলা উন্নয়ন সমিতির শোকসভা আহ্বান করা হয়েছে। ভগবান করুন শোকসন্তপ্ত বাঁকুড়াবাসীকে তাঁর আদর্শ ও আশীর্ব্বাদ যেন এ দুর্যোগ মুহূর্ত্তে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

ওঁর কোনো ফটো থাকলে ওঁর কর্ম্মজীবনের প্রসঙ্গে ওঁর ছবি বাঁকুড়াবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যুতে ওঁর সম্বন্ধে কিছু পাঠানো হয়েছে কিনা জানাবেন, না আমিই এখান থেকে পাঠিয়ে দেব ?

তাঁর শেষ দিনগুলোর কথা বড়ো জানতে ইচ্ছে করে। যখন হোক যবে হোক একটু লিখে দিলে বড় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে? আজ রাত্রেই আমার তাঁর জন্যে কলকাতা যাবার কথা ছিল কিন্তু সেখানে এমন কেউ নেই যার কাছে ও-পিতৃহারা আবার পিতৃস্নেহ ফিরে পায়। শেষ সময় কাছে ছিলেন কে কে? প্রণাম।

(এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতি) আপনাদের—

নন্দদুলাল

———

শান্তিনিকেতন

সবিনয় নিবেদন

শ্রদ্ধেয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক গমনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার মত উদার হৃদয় পরদুঃখশীল মহানুভব দেশকর্ম্মীর দেশে একান্তই অভাব। তাঁর বিয়োগে এ ক্ষতি অপূরণীয়। তাঁর পরলোক গমনে আমি আমার অতি নিকট আত্মীয়র বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। আপনাদের এই অভাবনীয় শোকে আমার ঐকান্তিক সমবেদনা গ্রহণ করিবেন।

(ম্যানেজার পায়ওনিয়ার ব্যাঙ্ক—)

ধীরানন্দ রায়।

শ্রীনিকেতন

প্রিয় অক্ষয় বাবু

আপনার পিতৃদেবের লোকান্তরে আমরা যাহা হারাইলাম তাহার অভাব আর কোনদিনই পূরণ হবে না। আমি তাঁর অধীনে নগণ্য একজন কেরাণী মাত্র ছিলাম কিন্তু তাঁর কাছে পেয়েছিলাম পিতৃস্নেহ। সেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ বর্ত্তমান জগতে বড়ই দুর্লভ। তাঁর কর্ম্মনিষ্ঠা তাঁর আদর্শের ভিতর দিয়ে তিনি যা রেখে গেছেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যেন তার কিছুও পাই।

তাঁর আদর্শ জয়যুক্ত হক, তাঁর কর্ম্মনিষ্ঠা দেশের লোক পাক তাহলেই তিনি শান্তি পাবেন।

ইতি ভাগ্যহীন—

অমর নাথ ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পুষ্পদি! আপনাদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। কাগজে আপনার দেবপ্রতিম পিতার পরলোক গমনের খবর পাইয়া মনের অবস্থা যে কি রকম হইয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারিনা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

আপনার মনের অবস্থা অনুভব করিতে পারি কিন্তু প্রকাশের ভাষা পাইনা। এই পুণ্যাত্মার মৃত্যুতে দেশের ও দশের যে কি ক্ষতি হইল তাহা যাঁহারা

তাঁর সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন সেই ক্ষতির পরিমাণ। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার চোখে ভাসে, মনে হয় পূর্ব্বজন্মের কি সুকৃতির ফলে এই মহাপুরুষের দর্শন আমরা পাইয়াছিলাম আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া কিছুতেই অশ্রুরোধ কবিতে পারিতেছি না। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ লোক পরম্পরায় পাইয়াছিলাম। কিছুদিন খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাইয়াছি তারপর ভাবিয়াছিলাম এতদিনে নিশ্চয়ই সুস্থ হইয়াছেন।

শ্রীনিকেতনের পথে কত লোককেই দেখিতে পাই কিন্তু কই সেরূপ দীপ্তি-পূর্ণ চেহারাতো আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়িল না। যখন তিনি এখানে ছিলেন তখনও ভাবিয়াছি কি করিয়া এমন আদর্শপূর্ণ জীবন তৈয়ারী হয়। কবিগুরুর প্রসাদে এখানে বহু গুণী জ্ঞানীর সমাগমই তো দেখিয়াছি—কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। তাঁর সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিভা বিভাসিত মুরতি আজ বারে বারে মনে পড়ছে। পুষ্পদি আপনার জীবন ধন্য, অমন মহাপুরুষের কোলে জন্ম নিয়া। তিনি যে এত শীঘ্র সকলকে ছেড়ে চলে যাবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমরা যে তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্ম্মজীবনী বার বার পড়েছি কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছি না। সেই উদার সত্যনির্ম্মল একনিষ্ঠ মহাত্মার প্রতি আজ অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাই।

আপনি আমার সমবেদনা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীনিকেতন। আপনার নিলীমা

জামালপুর

প্রিয় অক্ষয় বাবু!

আপনার পরমারাধ্য পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণে দেশ একজন প্রকৃত মানুষ হারাইল। সেই মহাপুরুষের অশেষ স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছি। তাঁর কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর আদর্শ চিরদিন প্রত্যেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করুক। অজাত শত্রু এই মহাপুরুষের অভাবে দেশবাসীর ক্ষতি অপূরণীয়। আপনারা আমার সমবেদনা গ্রহণ করিবেন।

ইতি—

ভাগ্যহীন—গণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যানীয়াসু বোন পুষ্প!

আজ কথা খুঁজে পাচ্ছিনা যে কি বলে তোমায় সান্ত্বনা দেব। কেবল তুমিই পিতৃহীন হও নাই। তোমার সহিত আজ সমস্ত বাঁকুড়াবাসীই পিতৃহীন হয়েছে। শুধু বাঁকুড়াব কেন সমস্ত বাঙ্গালাদেশের পক্ষেই এক্ষতি অপূরণীয়। তবে আমি বিশ্বাস বাখি তোমার সহ্যশক্তিব। কাজেই ধরিত্রীর মত এ দুঃসহ বেদনা তুমি নীরবে বহন কবতে পাববে।

গতকাল আমার কলকাতা যাবার কথা ছিল কিন্তু তোমার পত্র পেয়ে ঠিক করলুম আগামীকাল যাব এবং শ্রাদ্ধাদি শেষ কবে ফিরবো। আশীষ লও—।

Dr. Ram Rabi Mukherjee. ইতি—
Editor Bankura Darpan. রামরবি দা

S. K. Halder. I. C. S.

৩৩৪ ডায়মণ্ড হার্ব্বাব বোড
বেহালা

পরম স্নেহের পুষ্প।

তোমার বাবাব কর্ম্ম বিববণী পেলাম। তোমাব মনে যে কত বড আঘাত লেগেছে তা আমি খুব ভালো কবেই বুঝি। তোমার জীবনের মাঝে তোমাব স্নেহময় পিতা যে কতখানি জুড়ে ছিলেন তা আমি জানি। এখনো আছেন চিবদিনই থাকবেন। কেউই হাবায় না সব বিরহেব অন্তে চির মিলন বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর শেষ জীবনে তুমি তাঁব মা হয়েছিলে তিনি হয়েছিলেন তোমার পুত্র। সুতবাং তোমাব প্রাণে এ বেদনা পুত্রশোক হয়েই বেজেছে সে আমি ভালো কবেই জানি। তবু তোমাকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা কর্ব্বনা কেননা এ শোকের সান্ত্বনা নেই যে। তথাপি এও জানি তোমাব নিজেব অন্তরই তোমাকে আলো জালিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। যাঁর রক্ত তোমার গায়ে আছে সেই সদা হাস্যময় দুঃখবিজয়ী বলিষ্ঠ পুরুষ তোমাকে নিয়ত আশীর্ব্বাদ করছেন।

এমন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তাঁব বাইবেটা দেখলে কারো বোঝবাব সাধ্য ছিল না কত বড় দুঃখের অগ্নিতে তিনি জলেছিলেন দিবারাত্র। এক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁব তুলনা হয। আর কী মর্ম্মস্পর্শী তাঁর দৃষ্টি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় বরিশালের জজকুঠীতে। তিনি সেদিন আমার এক বেলার অতিথি। প্রবল হাঁসি তামাসা গল্প গানের মধ্যে যখন মনে করেছি

তাঁকে ভুলিয়ে রেখেছি তখন হঠাৎ আমায় বললেন আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন জীবনে না? তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কতটুকুই বা আমি জানি? তাঁর সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলুম পাঠালুম। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা সহজ নয়। সেখানে প্রগলভতা প্রমত্ততার উচ্ছ্বাস একান্ত অপ্রোয়জন। সেটা অসুন্দর ও শালীনতা বোধের অভাব ঘোষনা করে।

আমাদের শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলির সরল অনাড়ম্বর ঔদার্য এবং নিরুচ্ছ্বাস ভক্তি তুলনা বিহীন। আমার মনের মধ্যে তাঁর অনেক কথাই ভিড় করে আসতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের সকলের স্থান ছোট কবিতায় নেই। তাই তাদের মুখ্যে থেকে এমন একটি ভাবকে প্রকাশ করতে প্রয়াস করেছি, যা গতানুগতিক নয়, যা স্বভাবতঃ সরল এবং যা অন্তরের শ্রদ্ধা হতে উৎসারিত বলে অনাড়ম্বরী সুন্দর। উচু সুরে মন বেঁধে লিখতে বসেছিলাম। যদি মনে কর কিছু সাফল্য পেয়ে থাকি তাহলে সে তাঁরি আশীর্ব্বাদে যাঁর উদ্দেশ্যে এ প্রয়াশ। আমার নিজের কোনো কৃতিত্বের দাবী নেই। আমার এ শ্রদ্ধা নিবেদন একান্তই অন্তরের জিনিষ।

———

প্রণাম

সুন্দর দেহ, সবল উদার, ভালোবাসা ভরা প্রাণ
নয়নেতে ক্ষমা হাস্যে করুণা বাক্যে নিরভিমান
প্রশস্ত বুকে উদ্যমতেজ প্রদীপ্ত-উৎসাহ
প্রশান্ত মুখে ছায়া ফেলে নাই অন্তর-দ্রুব-দাহ
এই ছবিখানি বঙ্গ জননী ধরিয়া রাখিবে কোলে
আরব্ধ কাজ সাঙ্গ না হতে কর্ম্মী গিয়াছে চলে।
রাজ পথ পরে ফিরিছে মানুষ দেবতার বেশ ধরি
কতনা ছলনা আড়ম্বরের মিথ্যা মুখোস পরি
আমিতো দেখেছি ক্ষণে ক্ষণে সেই ছদ্ম প্রলেপ-টুটি
দেব বেশীদের ঘৃণ্য নীচতা অবাধে উঠিছে ফুটি
কিন্তু তোমারে দেখেছি বন্ধু চির মানুষের সাজে
তুমিই কেবল ম্লান হও নাই আর সকলের মাঝে।
দেববেশীদের করুণ বচন সমস্ত ভণ্ডামি
নর-বেশী তব, দেবত্ব স্মরি প্রণাম পাঠাই আমি।

সুধাংশুকুমার হালদার

———

শ্রীরামঃ

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়স্য মহাপ্রয়াণে

শোকোচ্ছ্বাসঃ

১

আসীদ্ বঙ্গাবনিসুতবরঃ কর্ম্মবীরো বরেণ্যো
ধন্যো ধীরো য ইহ সুকুমারাভিধানোঽধুনাসৌ।
হাহা! যাতঃ সপদি জনতালোচনাগোচরত্বং
চন্দ্রোঽস্তপ্রক্রিয় ইব চলন্ পশ্চিমাশাং নিশান্তে॥

২

শালপ্রাংশুঃ সুঘটিতবপুর্লম্ববাহুর্বিশালং
বক্ষোভালং নয়নযুগলং সুপ্রশস্তং চ বিভ্রৎ।
মূর্ত্তঃ কর্ম্মোদ্যমইব চমৎকৃত্য লোকান্ বিরাজন্
বর্ষীয়ানপ্যভিনবযুবা হা গতোঽস্তং চিরায়॥

৩

সংসারস্যাভ্যুদয়জননং বেতনং রাজকীয়ং
ভূয়ঃ কাম্যং পদমপি জহদ্ যোঽগমদ্ গ্রামবৃদ্ধ্যৈ।
হাহা! ত্যাগব্রতিনমধুনা বিশ্বকল্যাণকামং
তং স্মর্ত্তব্যাং গতমিহদশাং কেন শোচন্তি সন্তঃ॥

৪

সঙ্কল্পোগ্রস্থিরতরমনাঃ কল্পবৃক্ষায়মানঃ
কারুণ্যৈকপ্রবণহৃদয়ঃ সৌকুমার্য্যং দধানঃ।
তেজোদৃপ্তো বচসি মনসি প্রেমনম্রোঽপিচিত্রং
নিত্যং ভাবদ্বয়মনুসরন্ স প্রিয়োঽভূদ্ বুধানাম্॥

৫

যো দীনানাং পরমশরণং চাতুরাণাং সহায়ো
বিদ্বদ্বৃন্দ-প্রিয়-কৃতি-বিধৌ জাগরূকস্বরূপঃ।
ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রতিদিনমহো সাধুসম্ভাবধানো
রাজর্ষিশ্রীর্জনকসদৃশো হন্ত সোঽপ্যস্তমাপ॥

সেবাধর্ম্মং হৃদি পরিচরন্ কর্ম্মযোগং বিভজন্
হে দেব ত্বং জগতি নিপুনং পুণ্যমাপ্তোঽসি নূনম্।
অন্ত প্রীত্যা দিবি তু রমসে দেবতাভির্বয়ঞ্চ।
ত্বাদৃগ্‌বন্ধোশ্চিরবিরহজং দুঃখজাতং ভজামঃ॥

ভট্টপল্লীবাস্তব্যানাম্—শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ
শ্রীশ্রীজীব ন্যায় তীর্থ
শ্রীমন্মথনাথ তর্কতীর্থ
শ্রীজানকীজীবন কাব্যব্যাকরণ তীর্থ
দেবশর্ম্মণাম্

বঙ্গানুবাদ

বাঙ্গলার যে বরণীয় ধীর কর্ম্মবীর সুসন্তান সুকুমার নামে ইহজগতে পরিচিত ছিলেন তিনি রাত্রি শেষে পশ্চিমাভিমুখী অনলসকর্ম্মী চন্দ্রের ন্যায় সহসা লোকচক্ষুর অন্তরালে গত হইয়াছেন।

২

শালবৃক্ষের ন্যায় সুগঠিত দেহধারী সুদীর্ঘ বাহু যুক্ত ও সুবিস্তৃত বক্ষ ও ললাট ও নয়নদ্বয় বিশিষ্ট, বার্দ্ধক্যেও যৌবনসম্পন্ন, মূর্ত্তিমান কর্ম্মের ন্যায় যিনি জগৎকে বিস্মিত করিয়া বিরাজিত ছিলেন, আজ তিনি চিরকালের মত অস্তমিত হইয়াছেন।

৩

পল্লীর মঙ্গল সাধনে যিনি নিজ সংসারের শ্রীবৃদ্ধিকর উচ্চ বেতন এবং কাম্য রাজপদ ও ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই ত্যাগী, ব্রতী, বিশ্বের কল্যাণ কামীর এই দশা স্মরণ করিয়া সজ্জন মাত্রেই শোকগ্রস্ত হইবেন।

৪

সংকল্পে স্থিরচিত্ত করুণায় আর্দ্রহৃদয়, দাক্ষিণ্যে কল্পবৃক্ষতুল্য এবং বাক্যে অপূর্ব্ব তেজস্বীতা, ও হৃদয়ে প্রেম ও নম্রতা এই ভাবযুগলের নিয়ত অনুসরণ করিয়া তিনি পণ্ডিতদের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

দীনের আশ্রয় স্থল, আর্ত্তের সহায়, সুধীগণের প্রিয়কার্য্য সাধনে চিরজাগ্রত,

নিয়ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ শ্রবণে আগ্রহশীল, যিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় ছিলেন, তিনি আত্ম-সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬

অন্তরে সেবাধর্মের অনুশীলন ও কর্মযোগকে আশ্রয় করিয়া হে দেব, আপনি জগতে নিশ্চিত পুণ্য অর্জন করিয়াছেন। অধুনা স্বর্গধামে দেবগণের সহিত একত্রিত হইয়া, আনন্দে কালহরণ করুন এবং মর্ত্তধামে আমরা আপনার ন্যায় বন্ধু বিশেষের চির বিরহ জনিত দুঃখের বিষয় চিন্তা করি।

অনুবাদক
শ্রীসত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম, এ, বি, এল,

Major General
A. C. Chatterjee I. M. S.

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ
স্বাস্থ্য বিভাগ

৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলার একজন সুসন্তান ছিলেন। তিনি কো-অপারেটিভ বিভাগে কাজ করিয়া বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অনেক কো অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল।

তিনি শুধু সরকারি কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না বাইরের অনেক কাজও করিতেন। যেমন বড়দের শিক্ষা (এডাল্ট এডুকেশান) ইহাতে তিনি অনেক গবেষণা ও অনেক পরিকল্পনা করিয়াছেন।

সরকারী উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীনিকেতনে সচিবের পদে গিয়াছিলেন এবং তথায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

৺চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত মিষ্টভাষী বিনয়ী অথচ স্পষ্টবক্তা ছিলেন। তাঁহার সহিত কাজ করিয়া আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

শ্রীঅনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—::*::—

A. B. Chatterjee I.C.S.

Tippara State
Agartala

সুচরিতাসু

আপনার পরমারাধ্য পিতৃদেবের স্বর্গীয় হওয়ার সংবাদে অতীব মর্মাহত হইলাম। আপনার পিতৃদেব আমাদের পরম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তাঁহার

নিকট হইতে নিয়ত অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করিয়াছি বলিয়াই তাঁহার অভাব অপূরণীয় মনে করি।

আদ্যকৃত্যের নিমন্ত্রণলিপি ও কর্ম্মজীবনীও পাইলাম। তাঁহার পূর্ণজীবনী লেখায় আয়োজনের সংবাদে আনন্দিত হইলাম। আপনার স্বর্গগত পিতার সহিত কর্মক্ষেত্রে আমার যথেষ্ট সংযোগ ছিল। তাঁহাকে কখনোও শুধু রায় বাহাদুর বা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে দেখিবার কথা মনে হয়নি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল স্বচ্ছ কারো ভুল করবার উপায় ছিল না।

আমি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি পরিবর্ত্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিতর। আপনাদেরও সময় কম তবুও সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব্ব সংক্ষিপ্তভাবে আপনার পুণ্যাত্মা পিতৃদেবের সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠাবার।

তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তি লাভ হউক সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা করিতেছি।

শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

—*—

B. Chatterjee L.L.B. হোসেঙ্গাবাদ সি পি

সাবিত্রীসমানাসু

মা পুণ্যরাণী তোমার পত্রখানি পেয়ে মন হর্ষ ও বিষাদে ভরে গেল। হর্ষের কারণ যে কি তা আর কি লিখবো? তুমি যে মা আমার সুকুমারের কত আদরের ভালবাসার ও স্নেহের পাত্রী—আমায় মনে করে চিঠি লিখেছ এতে মন গর্ব্বে ভরে গেল। তোমার কত ছোট বেলায় কৃষ্ণনগরে দেখেছি তখন তোমার বয়েস ৩।৪ বছর। সে সুন্দর ছবিটি কখনও মন থেকে মুছে যায়নি। সুকুমার রাজার মত ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল তবু সংসারে কত আঘাতই না পেয়ে গেল। সুকুমারের মত পিতা পতি ভ্রাতা বা সন্তান অনেক ভাগ্য করলে তবে হয়। আমি যে কত বিষয়ে তার কাছে ঋণী আজ মনে পড়ে চোখে জল আসে। সে যে এমন অকালে আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া যাইবে স্বপ্নেও ভাবি নাই। সকলই ভগবানের ইচ্ছা! এই সেদিন আমরা একসঙ্গে খেলা করিয়াছি পঠদ্দশায় কলেজে তাহার সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি আর আজ সে নাই ভাবিতেও পারি না। এত প্রতিভা এত চরিত্র এত সহৃদয়তা এত অমূল্য গুণরাশি আজ ভস্মে পরিণত হইল এ দুঃখভার বহন করা কঠিন। মা তুমি তাঁহার জীবনী লিখছ জেনে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তোমার পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী তুমি, তোমার এ চেষ্টা সফল হবেই। আমি শীঘ্রই সুকুমারের বিষয় কিছু লিখে পাঠাচ্ছি।

আশীর্ব্বাদ

জ্যাঠামশাই

শ্রদ্ধাস্পদেষু বেহাই মশাই !

বড় বেহাই মহাশয়ের দেহান্ত সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। শ্রীমতী রেণু মুহ্যমান হইয়া আছে। তিনি রেণুকে বড়ই স্নেহ করিতেন। সেজন্য সে বড়ই কাতর হইয়াছে এ শোক আপনার খুবই তীব্রভাবে লাগিবে জানি। আপনি গত শীতকালে তাঁহার মিহিজামে থাকার সময় কত ব্যস্ত হইয়াছিলেন দেখিয়াছিলাম। অন্যান্য সময়ও দেখিয়াছি আপনাদের ভিতর স্নেহবন্ধন কত সুনিবিড় ছিল।

পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণীর বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার এই কঠিন শোক কি তীব্রভাবে লাগিবে সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছি। এই নিদারুণ শোকে একমাত্র শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ও করুণা ভিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন ভরসা নাই। তাঁহার কথাই বিশেষ করিয়া মনে করিয়া আমরা সকলে অত্যন্ত বেদনা পাইতেছি।

বর্দ্ধমানে কয়েকবার তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার কাছে আসিয়া আমাদের অনেক সুখী করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার নির্ম্মল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও হৃদয়ের অনেক মহৎ গুণরাশির পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কুলের ভিতর তিনি উজ্জল রত্নবিশেষ ছিলেন। অতীব দুঃখের বিষয় সর্ব্বই গুথাইয়া গেল। আপনি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত আপনাকে সান্ত্বনা দিবার মত ক্ষমতা আমার নাই। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি তিনি আপনাদের এই দুঃসহ শোক সহ্য করিবার ক্ষমতা দিন। ইতি

ম্যানেজার মার্টিন কোং এষ্টেট
বার্ণপুর

সমব্যাথী
শ্যামানন্দ বন্দোপাধ্যায়

রাজেন্দ্রভবন উত্তরপাড়া

স্নেহাস্পদেষু অক্ষয় !

তোমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পরলোক গমনের সংবাদে যারপরনাই ব্যথিত হইলাম। তাঁহার মত অক্লান্তকর্ম্মীর অভাবে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। পরম করুণাময় শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার স্বর্গগত পুণ্যময় পবিত্র আত্মার পূর্ণ শান্তি ও কল্যাণ কামনা করিতেছি।

ইতি শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়

হরিভবন তেলিনীপাড়া

শ্রীচরণেষু বৌদি !

এই দুঃসংবাদে অতীব মর্মাহত হয়েছি। মিহিজামে কয়েকদিন তাঁর সংস্পর্শে এসে সম্যক উপলব্ধি করেছিলাম তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও কতখানি শক্তিমান পুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর তিরোধানে দেশ ও দশ উভয়েই যে ক্ষতিগ্রস্ত হল তাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নিকট তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং প্রার্থনা করি এ দুঃসহ শোক সহ্য করার শক্তি ভগবান আপনাদের দিন।

প্রণাম জানবেন। ইতি

স্নেহার্থী প্রভাত

My dear sister

I feel proud to record my very deep appreciation for this great man and thank his daughter for giving me this opportunity.

I met him first in the Survey Buildings, Alipur in October 1942 when he was Deputy Commissioner of Development, Bengal. I was summoned by him from Shahjadpur to take up exclusively Adult Education work of which he was a pioneer in Bengal. My interview with him lasted for a few minutes and in those few minutes I had a glimpse of his great mind. I remember his remarks. "We are all selfish people, Aziz we look to our own interests and not to that of the poor villagers who have a hard lot......I have called you to this job and would entrust you with this noble work of village uplift and of removing not only their illiteracy but also their poverty, want and unnecessary suffering. May it be a call from God and dedicate yourself to Him..."

I saw the tall man, careless of his bearing, indifferent about his dress but quite alive to his duties and responsibilities. He was a hard task-master but it was a pleasure to work under him and with him, and during the year-and-a-half that I was in the job I admired the nobility of his

character, his broad humanity and his absolute impartiality in matters communal. I think, he had more admirers among Muslims than among Hindus, and I know a very large number of Muslim friends who served under him, speak of him in the highest terms.

He has gone before us but has left a heritage behind, worthy of imitation. May his soul be blest.

To Puspa Devi
193 Lansdowne Road

Abdul Aziz,
Inspector, Agriculture

১১২নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীট
কলিকাতা

কল্যাণীয়া পুষ্প !

তোমার স্বর্গীয় পিতার সহপাঠি হিসাবে আমি যাহা জানি লিখিতে বসিয়াছি কিন্তু সব ঘটনা সাধারণের পাঠ্য নহে। শাস্তুকে বাছিয়া প্রকাশ করিতে বলিবে ? * * * .

৪৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা তখন তোমার বাবার সহপাঠি ছিলাম। কলেজে তিনি বরাবরই আমা অপেক্ষা অনেক মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরে সরকারি উচ্চপদ নিয়ে তিনি বাইরে চলে গেলেন। আমি তখনও কলিকাতায় থাকিয়া এ্যাটর্নী পড়িতেছি।

আমার পূর্ব্বেই বিবাহ হয়েছিল। হঠাৎ একদিন আমার বড় মামাশ্বশুর এসে তোমার বাবার সম্বন্ধে খোঁজ নিলেন বলিলেন তাঁহার কন্যার ঐ পাত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে। ছেলেটি কেমন আমার মতামত জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম এ পাত্র ছাড়বেন না। বিবাহ হইল। বিবাহ সভায় আমি সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলাম। * * *

আমার প্রতিবেশী রায়বাহাদুর অতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় তোমার বাবার ও আমার ঘনিষ্ট সমসাময়িক বন্ধু। তাঁহার বাড়ীতে প্রায় দেখা হইত। ইহার কিছুদিন পরে পুনঃ সাক্ষাৎ হইল উত্তরপাড়ায় লোকনাথের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তোমার বাবার মটোরে আমায় নিয়ে গিছলেন মনে পড়ে। ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল * * * সান্ত্বনা দিতে পারিলাম না এক বৎসর ও মাসের ভিতর তোমার বাবার একি মর্মান্তিক দুঃখ ! বিধির বিড়ম্বনা। * **

কান্তিলাল চট্টোপাধ্যায়

৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (রায় বাহাদুর, এম্, বি, ই)

মহাশয়ের বংশপরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

লেখক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। আমাদের পিতামহর নাম গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য। আমাদের পিতৃদেবের নামে ভট্টাচার্য্য উপাধি সংযুক্ত থাকিত। তিনি আমাদিগকে যখন স্কুলে ভর্ত্তি করেন তখন আমাদের নামে চট্টোপাধ্যায় সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য এই উপাধি হইতে শ্রেণী বা গোত্র বোঝা যায় না। রাঢ়, বারেন্দ্র ও বৈদিক সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য হইতে পারেন। এবং যে কোনও গোত্রের ব্রাহ্মণও ভট্টাচার্য্য হইতে পারেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় উপাধি থাকিলে বোঝা যায় যে কাশ্যপ গোত্র এবং রাঢ় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পিতামহের কনিষ্ঠ সহোদরের পুত্র ছিলেন। আমি অনুমান করি যে রামানন্দ বাবুর পিতার নামে ভট্টাচার্য্য সংযুক্ত থাকিত, কিন্তু তিনি পুত্রদের নামে বোধ হয় ঐ কারণে চট্টোপাধ্যায় উপাধি লেখাইয়াছিলেন। আমাদের পিতৃদেব এ বিষয়ে তাঁহার খুল্লতাতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না।

আমাদের পিতামহ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোল ছিল। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল বাঁকুড়া সহরের পাঠকপাড়া নামক পল্লী। কোনও ধনী ব্যক্তির সন্তান জন্মিয়াই মারা যাইত, আমাদের পিতামহ তাঁহার জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বংশরক্ষা হয়। এজন্য তিনি পিতামহকে বাঁকুড়ার অন্য একটি পল্লী ঘটকপাড়ায় এক খণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন, অতঃপর পিতামহ পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ঘটকপাড়ায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া টোল স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। পিতামহের ঊর্দ্ধতম ১২।১৩ পুরুষের যাহা সন্ধান পাওয়া যায়, সকলেই অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। পিতামহরা চারি সহোদর ছিলেন। প্রথম তিনজন অধ্যাপক ছিলেন, কনিষ্ঠ (রামানন্দ বাবুর পিতা) জেলে চাকুরি করিতেন।

আমাদের পিতার যখন বয়স আট বৎসর তখন তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। প্রথমে পিতামহী মারা যান, তাহার অল্পদিন পরে পিতামহ মারা যান। পিতামহীর মৃত্যু সম্বন্ধে পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি পিতামহীকে সুস্থ দেখিয়াই স্কুলে গিয়াছিলেন, সেখানে সংবাদ পাঠান হইল যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বাটী আসিয়া শুনিলেন যে পিতামহী হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করেন এবং পিতামহের চরণপ্রান্তে শয়ন করিয়া তাঁহার মৃত্যু

হয়। পিতৃদেব অনুমান করেন যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে পিতামহের কঠিন অসুখ হয়। তাঁহার অর্থাগম বন্ধ হওয়াতে সংসার চলা কঠিন হয়। পিতৃদেব অনুমান করেন যে পিতামহের জীবনের আশা ক্ষীণ হইতে দেখিয়া এবং তিনটি নাবালক পুত্রের তিনি কিরূপে ভরণপোষণ করিবেন তাহার উপায় না দেখিয়া দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া হৃদ্‌রোগের উৎপত্তি হয়। ইহার কিছুদিন পরে পিতামহেরও মৃত্যু হয়।

আমাদের দুইজন পিতৃষসা ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম পিতৃষসার বিবাহ হয় রামানন্দ বাবুর মাতুল মহাশয়ের সহিত। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। দ্বিতীয় পিতৃষসার বিবাহ হয় কার্ত্তিক চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত। তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতাতে মোক্তারি করিতেন। তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল। পিতামহের মৃত্যুর পর কার্ত্তিক বাবু আমার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত রামশরণ বাবুর শিক্ষার ভারগ্রহণ করেন। প্রথম জ্যেষ্ঠতাত রামতারণ যাজনক্রিয়া করিয়া কোনোওরূপে সংসার প্রতিপালন করেন। পিতৃদেবের নিকট এই সময়কার দারিদ্র্যের কথা শুনিয়াছি। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, বাটীতে খাইবার কিছু নাই, গাছ হইতে কাঁচা পেয়ারা পাড়িয়া তাহাই খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। অর্থাভাবে রাত্রে পড়িবার জন্য আলো জ্বালিতে পারিতেন না। পাশে নাপিতদের বাটীতে প্রদীপ জ্বলিত, তিনি সন্ধ্যায় সেখানে পুস্তক লইয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন। পিতৃদেব ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ইংরাজি স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার একটি শিক্ষক দেখিলেন যে ভবিষ্যতে অর্থাভাবে পিতৃদেবের পাঠ বন্ধ হইতে পারে, এজন্য তিনি ডাকঘরে একটি পাশ বহি খোলাইয়া পিতৃদেবের বৃত্তির টাকা পাশ বহিতে জমা করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

পিতৃদেব এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতে গেলেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন, কিন্তু অর্থাভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়িয়া General Assembly Institution এ প্রবেশ করেন। (ইহার নাম পরে Scottish Church's College হয়) এই সময় সকালেও সন্ধ্যায় ছাত্র পড়াইয়া তাঁহার পড়িবার খরচ সংগ্রহ করিতে হয়। First Arts পরীক্ষায় (বর্ত্তমান I. A. পরীক্ষায়) পিতৃদেব বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। B. A. পড়িবার সময় তাঁহার বিলাত যাইবার ইচ্ছা হয় এবং তিনি এই উদ্দেশ্যে Gilchrist পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে Latin ভাষা পড়িতে হয়। পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, বলিয়া বৃত্তি পান নাই। Gilchrist পরীক্ষার জন্য তিনি B. A. পরীক্ষার পাঠে বেশী সময় দিতে পারেন নাই, এজন্য দ্বিতীয় বিভাগে

B. A. পাস করেন। ইংরাজীতে M. A পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, স্বয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী দ্বিতীয় হন। M. A. পাস করিয়া পিতৃদেব কিছুদিন Accountant General Bengal অফিসে কর্ম্ম করেন। এই সময় পিতৃদেব বিবাহ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর, মাতাঠাকুরাণীর বয়স ৮ বৎসর। বাঁকুড়া সহর হইতে এক ক্রোশ দূরে ভূতেশ্বর নামক গ্রামে আমার মাতামহের নিবাস ছিল। আমার মাতামহ পুরুলিয়ায় এক ব্রাহ্মণের গৃহে কর্ম্ম করিতে করিতে নিজ চেষ্টায় ইংরাজি শিক্ষা করিয়া পোষ্ট অফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং পোষ্ট-মাষ্টার হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। আমাদের মাতুলালয়ের নিকটে দারুকেশ্বর এবং গন্ধেশ্বরী নামক দুইটি ক্ষুদ্র নদীর সংযোগস্থল। এখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমনীয়। এই দুই নদী হইতে সুবৃহৎ রূপনারায়ণ নদীর উৎপত্তি।

পিতৃদেব পূর্ব্বোক্ত অফিসে কর্ম্ম করিতে করিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি যখন যশোরে কার্য্য করেন তখন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুকুমার বাবুর জন্ম হয়। তখন আমার মাতাঠাকুরাণীর বয়স ১৩ বৎসর মাত্র। মাণিকগঞ্জ স্কুলে সুকুমার বাবু প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে অল্পদিন পড়িয়া পিতৃদেবের কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হওয়ায় সুকুমার বাবু মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখান হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ১৫৲ বৃত্তি পাইয়া মেদিনীপুর কলেজে এফ, এ, পড়েন। এফ, এ পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এবং Physics ও Chemistryতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়াতে Scienceএ Duff Scholarship পান। তিনি কলিকাতায় গিয়া Presidency College এ প্রবিষ্ট হন এবং Eden Hindu Hostelএ বাস করেন। এই সময় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুকুমার বাবু এই আন্দোলনে ছাত্রদের অন্যতম নেতা হইয়া কলিকাতায় এবং বাহিরে নানাস্থানে, সভাসমিতি করা স্বদেশী প্রচার করা Boycott Picketting প্রভৃতি কার্য্যে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার ফলে B. A. ও M. A. পরীক্ষায় তিনি আমাদের আশানুরূপ ফললাভ করেন নাই। তিনি ইংরাজিতে এম্, এ, পাশ করিয়া কিছুদিন Physics এ এম্, এ, পড়েন। ভারতীয় হিসাব বিভাগে একটি উচ্চ পদের জন্য তিনি প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় দুইবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ঐ পদ প্রাপ্ত হন নাই। যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন (T. S. Sankera Iyer C. I. E.) Financial Commissioner of Railways হইয়া অবসর গ্রহন করিয়াছিলেন। পরে সুকুমার বাবু Deputy Magistrate এর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সহকর্ম্মীদের মধ্যে প্রতিভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী বলিয়া

পরিচিত হন এবং Assistant Secretary হইয়া Bengal Government-এ কিছুদিন কার্য্য করেন। তাঁহার প্রতিভা এবং কিপ্রকারিতায় সকলেই বিস্মিত হইত। কিন্তু ইহাই তাঁহার উন্নতির অন্তরায় হইল। I. C. S. কর্মচারিগণ, একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় শ্রেষ্ঠ দেখিয়া, তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইত এবং তাঁহার উন্নতির প্রতিকূল হইল। একবার একজন কর্মে অকুশল কিন্তু চাটুবাদে সুদক্ষ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনেক দক্ষ কর্মচারীকে উপেক্ষা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দেওয়া হইল। তেজস্বী সুকুমার বাবু ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। I. C. S. Clique সুকুমার বাবুর এই অপরাধ মার্জ্জনা করে নাই এবং বহু মিথ্যা মন্তব্য লিখিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

উপরিওয়ালাদের মনস্তুষ্টি করিতে অক্ষম হইলেও সুকুমার বাবু তাঁহার বিবিধ সদগুণের প্রভাবে অসাধারণ লোকপ্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে কার্য্য করিয়াছেন সর্বত্র জনসাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। তিনি সকলপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের সেবা করা অগ্নিদাহে অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। বাঁকুড়া ও বীরভূমে জলাভাবে কৃষিকার্য্যে অসুবিধা হয়, প্রাচীন বাঁধ ও পুষ্করিণী সংস্কারের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সমবায় নীতিতে সেগুলির সংস্কার কিভাবে হইতে পারে তিনি কর্মজীবনে এই বিষয়ে যারপরনাই আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি যখন Inspector General of Ragistration ছিলেন তখন সমগ্র বঙ্গদেশের যাবতীয় সবরেজেষ্ট্রারগণ অবসর সময়ে কিরূপভাবে Adult Education এ (অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার কার্য্যে) সাহায্য করিতে পারে তদ্বিষয়ে একটি কর্মপদ্ধতি রচনা করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সরকারী নিয়ম অনুসারে সকলেই ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু তিনি তাহার তিন বৎসর পূর্বেই কার্য্যত্যাগ করেন। উর্দ্ধতন কর্মচারিগণ এবং প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত তিনি যাহাতে অসময়ে অবসর গ্রহণ না করেন তজ্জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সুকুমার বাবুর সংকল্প পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন নাই। রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনে তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত স্বদেশসেবার উপযুক্ত সুযোগ পাইবেন এই আশায় তিনি শ্রীনিকেতনের সচিবের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র অবস্থা হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও সুকুমার বাবুর গুণাবলীর সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেকের কাছে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীনিকেতন পরিত্যাগ করিবার

পর সুকুমার বাবু কিছুদিন ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধিনায়ক ছিলেন এবং কিছুদিন বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেচ বিভাগের বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বয়স যত বেশী হইতে লাগিল ততই স্বদেশের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগের আকাংখা তাঁহার প্রবল হইতে লাগিল। দিবারাত্র অন্য চিন্তা নাই। কতরকমের উপায়ে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করা যায় তাহারই আলোচনা এবং চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। নিজের সুখ সুবিধা লাভের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া থাকিতেন। শরীরকে উপযুক্ত বিশ্রামও দিতেন না। তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভাপতিরূপে সম্মিলনীর সকলপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি ঐ জেলার সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যাহাতে আরও বেশী কার্য্য করা যায় এজন্য Bankura District Developement Committee নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহার প্রথম সভাপতি মনোনীত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়ায় বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি এ বিষয়ে বার বার আকৃষ্ট করিলেন এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত দিয়া, বারবার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থান সকল পরিদর্শন করিয়া, সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলিয়া, সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যে রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল তিনি সেই রোগশয্যায় শয়ন করিয়াও দেশের কল্যাণ চিন্তা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রোগকষ্ট একটু কম হইলেই তিনি আলোচনা করিতেন—তিনি বাঁকুড়াতে একটি ছোট্ট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিবেন এবং বাঁকুড়া সহরের Medical College, জিলার জলসেচের ব্যবস্থা এই সকল কার্য্যে কিভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন। সাহিত্যপ্রিয়তাও শেষপর্য্যন্ত তাঁহার অটুট ছিল। আমাকে বলিতেন, রঘুবংশের ঐ ঐ স্থান পড়। সে সকল অংশ তাঁহার প্রায় সবই মুখস্থ ছিল। যেখানে আমার পড়িবার অসুবিধা হইত তিনি আমাকে সাহায্য করিতেন এবং অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার পুত্রবধূদ্বয় এবং দৌহিত্রীগণ Chorus এ রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতেন ইহা তাঁহার রোগশয্যার চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায় ছিল। তাঁহার বন্ধুবৎসলতা অসাধারণ ছিল। তাঁহার সদয় ব্যবহারে তিনি অল্পসময়ের মধ্যে কত অকৃত্রিম ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গীতা ও কঠ উপনিষদ তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। এই দুই গ্রন্থই তাঁহার প্রায় মুখস্থ ছিল। প্রতিভা ও পরোপকার তাঁহার জীবনে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহা ম্লান হয় নাই। তিনি আজীবন যে সকল পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার ফলে তিনি স্বর্গলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার দেশহিতসাধনের প্রবল আকাংখা স্বর্গেও তাঁহাকে

নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না, এবং অচিরে কোনও ভাগ্যবান বংশে উপযুক্ত আত্মীয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

পিতৃপ্রাণ সুকুমার

(মাতৃকুলের পরিচয়)

পুষ্প দিদিমণি,

তোমার বাবা সুকুমারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমার যাহা জানা আছে তাহা লিখিয়া দিতে বলিয়াছ। সুকুমারের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ১৯০৪ সালে। তখন তিনি ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন অথবা তখনও এম, এ পড়িতেছেন ঠিক মনে নাই। তোমার পিতামহ রামসদন বাবু তখন বহরমপুরের সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে গোয়াবাজারে, আমরা একটা ক্লাব খুলিয়াছিলাম। বহরমপুরের ডিষ্ট্রিক্টইঞ্জিনিয়ার খাস্তগীর মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে তাহার অধিবেশন বসিত। এই ক্লাবের কর্ম্মধারা ছিল বহুমুখ। সাহিত্যচর্চ্চা সমাজ সংস্কার গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার খেলাধুলা আরও কত কি। প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একজন সম্পাদক ছিলেন। আমি সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, কিন্তু সুকুমার বিভাগীয় সম্পাদক হইলেও তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আমাদের সকলকেই পরিচালিত করিতেন। তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত আমাদের কোনও কাজই চলিত না। ক্লাবের সভ্য সংখ্যাও কম ছিল না। সকলেই কলেজের ছাত্র—কয়েকজনের কথা মনে আছে—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়—ইনি এখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক। শ্রীবিনয়কুমার সেন—ইনি কলিকাতায় অধ্যাপকতা করিতেন। অসুস্থ হইয়া বোধ হয় অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদাস সরকার—ইনি মফস্বলে সাবডিভিসানাল অফিসার হইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন—প্রাচীন মন্দিরের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মিত্র—ইনি বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, ইনি এখন ইহলোকে নাই। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আর একজন সভ্য ছিলেন। ইনি বহরমপুর পাগলা গারদের তদানীন্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পুত্র—। পরে ভবানীপুর সাউথ সুবারবাণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ঐ স্কুলে আমি ও রাজেন বাবু পড়িয়াছি। একত্র কিছুদিন কাজও করিয়াছি। একজন মুসলমান সভ্যও ছিলেন আলিভাই, পুরা নাম মনে নাই। একবার গঙ্গাপারে চড়ুইভাতি করিতে গিয়া শ্মশানের কাছে এক মড়ার খুলিতে পা লাগাইয়াছিলেন। পরে আসিয়া অসুস্থ হইয়া লেখাপড়া ছাড়িয়াছিলেন। বায়ুরোগে তাহার স্বাভাবিক কর্ম্মঠতা নষ্ট করিয়াছিল। ক্লাবে তোমার দুজন কাকা বিজয়ও বসন্তও ছিলেন। ফুটবল

খেলার ইহাদের খুব ঝোঁক ছিল। পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষবাবু এই ফুটবল দলের ক্যাপ্‌টেন ছিলেন। সকলেই আদর্শবাদী ছিলেন। স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতায় তখন দেশে পূর্ণ চেতনা জাগিয়াছে। আদর্শকে কর্ম্মে পরিণত করিতে না পারিয়া তখন সকলেই অস্বস্তি অনুভব করিতেছেন। সুকুমারও খুব আদর্শবাদী ছিলেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় সভ্যদের মধ্যে অনেকে গ্রামে গ্রামে ছুটির সময়ে শিক্ষা দিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িতেন। সুকুমারের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সময়ানুবর্ত্তিতা আমাদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হইত। ক্লাবে কোনও কোনও দিন তাস খেলা হইত—সময় নির্দিষ্ট ছিল একঘণ্টা। সুকুমার কখনও এক মিনিটের জন্যও ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় লঙ্ঘন করেন নাই। ইহাতে কখনও কখনও বন্ধুবান্ধবরা বিরক্ত হইতেন কিন্তু সুকুমারের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সেই অল্প বয়সেই সংসারে থাকিয়াও তিনি নিজের বিষয় উদাসীন থাকিতেন। বেশভূষায় পারিপাট্য ছিল না অথচ কখনোও অপরিচ্ছন্ন থাকিতেন না।

"শাস্ত্রের মধ্যে গীতা ও উপাস্যের মধ্যে পিতা" এই তিনি জানিতেন। সারাজীবনে ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। তাহার আদর্শবাদ তখন হইতেই তাঁহাকে রবীন্দ্র সাহিত্যে অনুরাগী করিয়াছিল। পরে বাংলার মহামণি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া তদানীন্তন বহু মনীষীর মত তাঁহাকেই গুরুদেব বলিয়া মানিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁহাকে দেশ সেবা ব্রতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল ও বড চাকুরীর মোহ কাটাইয়া তাঁহাকে শ্রীনিকেতনে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চ্চা করিয়া কাটাইলেন।

সুকুমারের সহিষ্ণুতা, মহাপ্রাণতা, সরলতা ও নীরব কর্ম্মনিষ্ঠা তোমার পিতামহী নিকুঞ্জদিদির কাছ হইতে পাওয়া। নিকুঞ্জদিদি আবার এসব গুণ তাঁহার পিতা আমার জ্যেঠা মশাই ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে পাইয়াছিলেন। নীলমাধব জ্যেঠামশাই একজন অসাধারণ কর্ম্মী ও সহৃদয় পুরুষ ছিলেন। পরকে আন্তরিক আপন করিবার এত বড শক্তি কোথাও বড় দেখি নাই। বাল্যকালে পুরুলিয়ায় স্কুলে পঠদ্দশায়ই অতি সহজেই আমার পিতামহ ৺অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ইনি প্রথম সন্তানরূপে গণ্য হইতে পারিয়াছিলেন। আমার পিতামহ পিতামহী তখনও অনপত্য ছিলেন। এই পিতৃমাতৃহীন বালকটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের অপত্য স্নেহ উথলিয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়াছি অদ্ভুত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল এই নীলমাধব জ্যেঠামশাই-এর। স্কুলে পড়াশোনায় তাঁহার তীক্ষ্ণ ধীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সামান্য উপার্জ্জন করিতেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে রাখিয়া হঠাৎ অল্প বয়সেই মারা যান। নীলমাধববাবু তখনই স্কুল ছাড়িয়া

চাকুরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং পোষ্টাপিসের একটি সামান্য বেতনের চাকুরী পাইয়া জ্যেষ্ঠের পরিবারকে সাহায্য করিতে লাগিলেন স্কুল ছাড়িলেন বটে তবে পড়া ছাড়িলেন না। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর পড়াশোনা করিতেন। আমার পিতামহ পিতামহীকেও ছাড়িয়া গেলেন না। তাঁহাদের বাড়ীতেই সন্তানের মতই রহিয়া গেলেন। তাহার পর কত বড় পদে উন্নীত হইলেন পুরুলিয়ার পোষ্টমাষ্টার হইলেন ডিভিসানাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইলেন কত সুনাম অর্জ্জন করিলেন বিবাহ করিলেন সন্তানাদি হইল আমার পিতামহ পিতামহীকে চিরদিনই নিজের পিতামাতা জ্ঞান করিয়া গেলেন। পিতামাতার মত জ্ঞান করিয়া গেলেন বলিয়া তাঁহার আন্তরিকতার অবমাননা করিব না। আমার অতি শৈশবেই ইনি মারা গিয়াছেন। তাই ইহার কথা আমার মনে নাই। ইহার কনিষ্ঠ রামদয়ালবাবুকে আমার মনে আছে। ইনিও জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়া আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের মতই জ্ঞান করিতেন। শুনিয়াছি আমার পিতামহের মৃত্যুতে নীলমাধব জ্যেঠামশাইও আমার জ্যেঠামশাই বাবা ও কাকার সঙ্গে সমস্ত পুত্রকৃত্য পালন করিয়াছিলেন। তখন এরূপ আন্তরিকতা বিরল ছিল না। এখন স্বাতন্ত্র্যের যুগ এখন এরূপ আর হয় না। এখন কন্যা বধূরূপে শ্বশুর কুলে আসিয়া সকল ক্ষেত্রে একাত্মীভূত হইতে পারে না। পরের জন্য এখন আমরা ভাবিতে পারি না। ইহাতে আমাদের হৃদয়ের কত বড় সম্পদ যে আমরা হারাইয়া বসিয়াছি তাহা এখনো আমাদের উপলব্ধি হয় নাই। জানিনা স্বাধীনতার সঙ্গে হৃদয়ের এ সম্পদ আবার আমরা ফিরিয়া পাইব কি না?

প্রণাম করি নীলমাধব জ্যাঠামহাশয়কে—যাঁহার জন্য নিকুঞ্জদিদিকে আমরা জ্যেষ্ঠতাতজা ভগিনী বলিতে পারিতেছি এবং সুকুমার, বিজয় বসন্তকে আমরা ভাগিনেয় বলিয়া দাবী করিতে পারিতেছি। এ দাবী তোমার বাবা কাকারা অগ্রাহ্য করেন নাই। রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষা এ সম্পর্ক অনেক বেশী সত্য। কারণ এ সম্পর্ক আত্মার, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলের। তোমার বাবা, সুকুমারের অসীম ক্লেশ সহিষ্ণুতা, পরকে আপন করিবার ক্ষমতা, আত্মবিসর্জ্জন দিয়াও দেশ ও দশের জন্য ভাবিতে পারা সমস্তই তাঁহার এই মাতামহ নীলমাধব জ্যাঠামশাই-এর চরিত্র হইতে সংক্রামিত হইয়াছিল।

যে পিতাকে সুকুমার প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া মানিতেন তোমার সেই পিতামহ রামসদন বাবুর অনাবিল চরিত্র প্রভাবও সুকুমারকে অনেকখানি প্রভাবিত করিয়াছিল অল্পবয়সেই সুকুমারের আদর্শমন্ত্র হইয়াছিল

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।

রামসদন বাবুর মত সরল অমায়িক আত্মসুখসাচ্ছন্দ্যে উদাসীন বিলাসহীন লোক সেকালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে অল্পই দেখা যাইত। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার চরিত্রে যাহা সকলকে মুগ্ধ করিত তাহা তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। তাঁহার সহোদরের মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্রদের সকলভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাছে কোন কারণে তিনি ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হন এই আশঙ্কায় দলিল রেজিষ্টি করিয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সুকুমার পিতার নিকট হইতে এই আত্মসুখে ঔদাসীন্য ও অবিচল কর্ত্তব্য নিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। অন্যের কি করা উচিৎ ছিল বা কি করিল না সুকুমার কোন্ দিনই তাহা ভাবিয়া দেখিতেন না। নিজের কর্ত্তব্যের শেষ কড়া ক্রান্তি অবধি পালন করিতেন।

বহরমপুরেই সুকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রথম নিযুক্ত হন। পরে বহু রাজ সম্মান ও লাভ করিয়াছিলেন—পদোন্নতিও অনেক হইয়াছিল কিন্তু তিনি সেই আত্মভোলা সাহিত্যামোদী ভাবুক অথচ নীরব কর্ম্মীই রহিয়া গেলেন। সুখে বা দুঃখে হৈ চৈ করিলেন না। বহরমপুরেই তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার মত আত্মভোলা লোকের বিবাহ করা উচিৎ ছিল কিনা এতর্ক এখন বৃথা। নিয়তির চক্র যেমন ঘুরিতেছে তাহার অন্যথা করার সাধ্য কাহারও নাই। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া না গেলে সুকুমারের পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতাম না।

শ্রীভগবান সুকুমারের অমর আত্মাকে জয় যুক্ত করুণ ধন্য করুণ।

শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী

আড্ডাধারী সুকুমার

(১৯০৩-০৭)

১৯০৩ সালের জুন মাসের শেষাশেষি। ইডেন-হিন্দু হস্টেলের নয়া বাড়ীর দোতলায় সিঁড়ির সাম্‌নের বারান্দা। বনোআরি খাবারওয়ালার চাঙারিতে লুচি তরকারি, মাংস, সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি মাল সাজানো। সম্মুখে খেলার মাঠ।

জিতেন বাগচির সঙ্গে একটা ছোকরা দাঁড়াইয়া রসগোল্লা খাইতেছে। পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কীরে তুই আবার কে?" বলিল:—"সুকুমার চ্যাটার্জি।" "কোথ্‌থেকে?" "মেদিনীপুর।"

"তুই কে?" "বিনয় সরকার।" কোথ্‌থেকে? "মালদা।"

ব্যস্। এই সুরু।

জিতেন অঙ্ক কষে। বাড়ী তার বহরমপুরে। অঙ্ক কষিয়েদের দলে ছিল মৈমনসিংহের নরেশ ঘোষ। সে অবশ্য হস্টেলে থাকিত না। আর একজন, সারদা মাইতি। বাড়ী বীরভূম। ওর ঘর ছিল পুরনো বাড়ীর দোতলায়। স্কুমার ইত্যাদির সঙ্গে তার দহরম-মহরম ছিল বেশ। একালে নরেশ ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। সারদা পাটনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জিতেন ও অঙ্কের প্রোফেসর। অল্প বয়সে মারা যায়।

আমাদের এই আড্ডার "খুড়ো" ছিল মনোরঞ্জন মৈত্র। নয়া বাড়ীর নীচের তলায়,—নাইবার কলের কাছে ছিল তার ঘর। কাজেই তেল মাখবার সময় গুলতান জমিত তার ঘরে দস্তুরমতন। ফরিদপুরের ছোঁড়া। একটু-একটু "বাঙাল"-"বাঙাল" আওয়াজ। তবে নরেশের মত নয়। নরেশের "চ-টা" আর "জ-টা" কোন দিনই মেরামত হইল না। মনোরঞ্জন ছিল সংস্কৃত'য় পণ্ডিত। যখন-তখন স্কুমার আসিয়া বলিত—"চ, খুড়োর ঘরে গিয়ে সংস্কৃত শ্লোক শুনে আসি।" নরেশ আর সারদা ও অনেক সময় হাজির থাকিত। রীতিমত পণ্ডিতী পাঠ। লোক জুটিত ঢের। কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ ইত্যাদি বইয়ের কথা মনে পড়িতেছে। কিছুদিন প্রোফেসরি করার পর মনোরঞ্জন ডেপুটি হইয়াছিল।

রংপুরের অতুলগুপ্ত হস্টেলে থাকিত না। প্রেসিডেন্সী কলেজের বারান্দায় সে ছিল এই আড্ডারই অন্যতম ধুরন্ধর। স্কুমার ফাঁকে-ফাঁকে অতুলের তর্কাতর্কি শুনিতে আসিত। অতুলের কথার ঢঙ ছিল টানা-টানা। এখনো প্রায় সেই রকমই আছে। হাইকোর্টের আওয়াজ শুনি নাই। ঘরোআ বৈঠকের বলা-কওয়ার টানই বলিতেছি। হস্টেলে তার বড় বেশী আনাগোনা ছিল না। গম্ভীর গোছের দার্শনিক। একালেও প্রায় তাই। বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীর ("বীরবলের") সঙ্গে গা-ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া কিঞ্চিৎ কিছু সামাজিক মানুষ হইয়াছে।

হস্টেলের বাসিন্দা ছিল নলিন চক্রবর্ত্তী। পুরানো বাড়ীর দোতালায়। দর্শন-পড়ুআ। আড্ডাধারী ছিল মন্দ নয়। স্কুমারের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা চালাইত। দেশ তার বগুড়ায়। একালে উকিল। স্কুমার একদিন নলিনকে বলিল—"বিনয়টা বাংলা সাহিত্যে আনাড়ি দেতো একবাব রবি বাবুর কিছু শুনিয়ে।" মোহিত সেনের সম্পাদিত একটা বই হইতে নলিন পড়িতে আরম্ভ করিল—"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত" ইত্যাদি। যতই পড়িতেছে ততই আমি মাত্ হইতেছি। মুখে আর রা বাহির হইতেছে না। যাকে বলে অবাক্। শেষ পর্য্যন্ত শুনিলাম :—"আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।" যেই থামিল আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, আনন্দে আর বিস্ময়ে। ভাবিলাম আরও বোধ হয় খানিকটা আছে। দেখিলাম আর নাই। আমি ত হতভম্ব। আমার ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা দেখিয়া নলিন ও স্কুমার একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—

"কীরে, বাংলা সাহিত্য কিছু নয়? না"? জবাব দিলাম:—"হাঁ কবিতা বটে। "আর্ট" (শিল্প) বটে। ঐরকম ভাবে হঠাৎ এসে থেমে গেল? উঃ কী বাহাদুরি!" তখন সুকুমারের সঙ্গে আমরা সকলে প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিকে (১৯০৩-০৪)।

১৯০৪ সালের কথা। হস্টেলের ফটকের সামনে দাড়াইয়া সুকুমার, মনোরঞ্জন, নলিন আর অন্যান্য সকলকে লম্বা গলায় বলিতেছে:—"সারদা মাইতি কী ব'লেছে শুনেছিস?" আমি ওখানে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম:—"কৈ? অনেকদিন তো তার টিকি দেখা যায় না?" "শোন্। বল্ছে:—'ভাই, বিবেকানন্দ হস্টেলে বিবেকের আনন্দ হ'লো কিনা জানি না। কিন্তু উদরানন্দ তো হয় নি। তাই আবার অধম-তারণ হিন্দু হস্টেলেই পুনর্মূষিকো ভব'।" সেই সময় মেছুআবাজার স্ট্রীট আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে একটা ছাত্রাবাস কায়েম হয় বিবেকানন্দর নামে। বিবেকানন্দের মৃত্যু ১৯০২ সালে।

জলপাইগুড়ির শান্তি নিধান রায় একদিন সুকুমারের সঙ্গে হাত-পা নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেছে। বকাবকিব মুদ্দা:—"বোলপুরেব শান্তিনিকেতনে রবিঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।" সুকুমার বলিল:—"চল একবার গিয়ে দেখে আসি।" শান্তি হস্টেলেই থাকিত। আজকাল চায়ের বেপারী। রবিবার ব্রাহ্মসমাজের গান শুনিয়া আসিত আর বলিত:—"সমাজে গেলে আমি বেশ-কিছু ইম্পেটাস (উদ্দীপনা) পাই।"

দর্শন-পড়ুআ মনোমোহন বসুর সঙ্গে সুকুমার বকাবকি করিতেছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের বারান্দায়। সেখানে হাজির ছিল রাখাল ব্যানার্জি (একালের মহেঞ্জোদড়োর উদ্ধার কর্ত্তা) আর বিজয় বসু (একালের মেঅর)। সকলেই বলিল:—"আরে বিনয়, আমাদেরকে একদিন তোর ডন সোসাইটির তীর্থে নিয়ে চল্। শুনে আসি সতীশ মুখার্জির বক্তৃতা। দেখি কার পাল্লায় পড়েছিস্।" পরের দিন হস্টেলের কল-তলায় বিশ-পচিশ জনের হৈ-হৈ-রৈ-রৈ'র ভিতর সুকুমার সকলকে বলিতেছে:—"জানিস্ ডন সোসাইটীতে বিনয় কী পড়তে যায়? সুখও কিছু নয়, দুঃখও কিছু নয়। বাঃ, মানুষগুলা গাছ-পাথর নাকি রে?" সুকুমার পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামীর গীতা ব্যাখ্যা শুনিয়া আসিয়াছিল। ছাপরার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মনোমোহন ইত্যাদি অনেকেই ছিল। "রাজেন্দর" আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়িত। হস্টেলে থাকিত নয়া-বাড়ীর নীচের তলায়। রাধাকুমুদের তদ্বিরে সে ডন সোসাইটিতে আমাদের গুরু-ভাই। আজকাল রাজেন্দর ডমিনিয়ান-ভারতের খাদ্য-সচিব। রাধাকুমুদ মুখার্জি বয়সে ও ক্লাসে আমাদের অনেক বড়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভা হইতে একদিন সুকুমার, মনোরঞ্জন, নরেশ

শান্তি ইত্যাদির সঙ্গে ফিরিতেছি। সন্ধ্যার পর। শীতকাল। ১৯০৩ কিম্বা ১৯০৪। আপার সারকুলার রোডে তেল কল, সুড়কির কল, ময়দার কল ইত্যাদি কলের আবহাওয়া। ধোঁআয় আর ধূলার সকলেরই চোখ কট্-কট্ করিতেছে। অস্থির হইয়া সুকুমার বলিল :—"এই জন্যই তো গবর্মেণ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজটাকে কলিকাতা হইতে সরাইতে চায়। খুব ভাল প্রস্তাব নয় কি? ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র কলিকাতা, রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র কলিকাতা। এইখানে কি লেখাপড়ার কেন্দ্র রাখা উচিত? লেখাপড়ার জন্য চাই রাঁচি ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর নির্জন জায়গা।" ইত্যাদি। আমি বলিলাম উল্টা :—"হট্টগোলের আর ধূলাময়লার ভিতরই ব্যবস্থা করা উচিত লেখাপড়ার জন্য। পোষাকি আবহাওয়ায় মানুষ তৈয়ারী হয় না। মানুষ গড়িবার জন্য বনে জঙ্গলে, লোক জনের বাহিরে যাওয়া ঠিক নয়।"

তখনকার দিনে দেশের ভিতর চলিতেছিল বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের তদন্ত-সংক্রান্ত তর্কাতর্কি। সতীশ মুখার্জি, গুরুদাস ব্যানার্জি, সুরেন ব্যানার্জি ("বেঙ্গলী"), মতি ঘোষ (অমৃত বাজার পত্রিকা) ইত্যাদি সকলেই কমিশনের বিরুদ্ধে।

রবি বাবু "স্বদেশী সমাজ" পড়িলেন দু-দুবার। কলিকাতার ছেলে ছোকরা মহলে হুলুস্থুল। জিতেন, সুকুমার, শান্তি, নলিন ইত্যাদি সকলেই বহুমুখে তারিফ করিতেছে। সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল :—"কীরে; বিনয়, তুই যে কিছু বলছিস না?" "ভাই, দুটোর কোনোটাতেই যাই নি।" "কেন? ডন সোসাইটির বারণ না কি রে?" "তা কেন হবে? সতীশবাবু নিজেইতো হাজির ছিলেন, দুবারই। হারাণ চাকলাদার, রাধাকুমুদ, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রাজেন্দর ইত্যাদি ডন সোসাইটির অনেকেই দু-দুবার শুনে এসেছে।"

১৯০৪ সালের বর্ষাকালে চৌরঙ্গীর মাঠ থেকে ফিরিয়া আসিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সুকুমার বলিতেছে :—"ধর্ম্মতলার খবরের কাগজের আফিসের দেওয়ালে কী ছাপা দেখলাম জানিস্? ওয়ার ইমিনেণ্ট। লড়াই বাধো-বাধো।" "সে আবার কী?" মনোরঞ্জনকে সুকুমার বলিল :—"বিনয়টা আদার বেপারী জাহাজের খবর রাখেনা।" খুব গল্প-গুজব চলিতে লাগিল। ১৯০৪ সালের কথা। রুশ ভাল্লুক জাপানী ছাগলকে গিলিতে আসিতেছে।

বাংলাদেশকে দু-টুকরা করিবে ইংরেজ জাত। বাঙালীর বাচ্চা তা সইবে না। টাউন হলে বিলাতী মাল বয়কটের জন্য সভা হইল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য। বঙ্গ-বিপ্লবের সূত্রপাত। ঠিক যেন লড়াই। পরের দিন কলেজে সুকুমার, শান্তি ইত্যাদি সকলে জিজ্ঞাসা করিল :—"তোকে তো টাউন হলে দেখলাম না। তুই আবার বিলাতী

মালের ভক্ত হলি কবে? ডন সোসাইটিতে তো সতীশ বাবু স্বদেশী জিনিষের দোকান ও খুলেছেন। সেখানে তোরা কেনা-বেচার কারবার ও তো শিখ্‌ছিস্?"

আমি তখন হিন্দু হস্টেল ছাড়িয়া দিয়াছি। সতীশ বাবু, রাধাকুমুদ মুখার্জি, রবি ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আর পণ্ডিত মোক্ষদা সামাধ্যায়ীর সঙ্গে থাকি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপরকার একটা মাঠওয়ালা বাড়ীতে। মাঠটা পান্তের মাঠ নামে পরিচিত। বাড়ীটার নীচের তলায় ফিল্ড অ্যাণ্ড আকাডেমী ক্লাব। সেই ক্লাব ছিল বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিষ্ণু চ্যাটার্জি (ব্যারিস্টার), রজত রায় (ব্যারিস্টার), সুবোধ মল্লিক (জমিদার) ইত্যাদি জননায়কদের আড্ডা। দোতলায় ছিল সতীশ-ব্রহ্মবান্ধবের "মেস্"। সুকুমার, মনোমোহন, শান্তি ইত্যাদি দুএকবার আমাদের এ মেসে ঢু মারিয়া গিয়াছিল। আমার হস্টেল ছাড়াটা সুকুমার, মনোরঞ্জন ইত্যাদির পছন্দ-সই ছিল না। বলিয়াছিল:—"হস্টেলে থেকে গেলেই ভাল করতি।" যাহা হউক সতীশ বাবুর "বাথানে" ব্রজেন শীল, বিপিন পাল, রবি ঠাকুর, হীরেন দত্ত, গুরুদাস ব্যানার্জি, আশু চৌধুরী (ব্যারিস্টার), মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার) ইত্যাদি সেকালের ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ-যমের 'আসা' যাওয়া ছিল। এই অধমের চৌকিতে ও অনেকেই বসিয়া গিয়াছেন।

কলেজ স্কোয়ারে ছেলেদের "স্বদেশী" সভা। বক্তৃতা করিল সুকুমার। জিজ্ঞাসা করিলাম:—"কী বল্‌লি?" সুকুমারের জবাব:—"কাল কলেজে অতুল বল্‌ছিল, 'দেশটা বড় হ'য়ে গেছে। যেখানেই যাই সকলেই কিছু-না-কিছু নতুন বল্লে। আমার পক্ষে বিশেষ কিছু বল্‌বার দরকার হয় না।' ঠিক সেই সুরেই আমি ও গেয়ে এলাম।"

প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে "স্টুডেন্টস ম্যাগাজিন" বাহির হইল (১৯০৫)। সুকুমার খুড়োকে, অতুলকে, নলিনকে, আমাকে, যাকে পায় তাকে ডাকিয়া বলিতেছে—"আরে তোদের কাছে এই মাসের স্টুডেন্টস্ ম্যাগাজিনটা আছে? থাকে তো দে। বড্ড জরুরি। না থাকে তো এই একটা দিচ্ছি। নিয়ে যা। ঘরে বসে এটাকে দুম্‌ড়ে-মুচড়ে কালী পেন্সিলের দাগ লাগিয়ে কালই ফেরৎ দিবি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাণ্ড কী রে সুকুমার? কী হয়েছে?" "আরে ভাই, পুলিশ নাকি প্রেসিডেন্সী কলেজের উপর চটেছে। প্রিন্সিপাল এই কাগজ আর বের করতে দেবে না।" "তাহলে কাগজটাকে দুম্‌ড়ে-মুচড়ে কালী-পেন্সিলের দাগ লাগিয়ে ফেরৎ দিতে বলছিস কেন?" "প্রিন্সিপ্যালকে শ' দেড়-দুই কপি ফেরৎ দিতে হবে। দেখাবো যে, আমরা কাগজটা এখনো বেশী বিলি করিনি। যেগুলো বিলি হয়েছিল সে-সবই

ফেরৎ নিয়েছি। তাহলে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পুলিশের কর্ত্তাদেরকে ঠাণ্ডা রাখতে পারবে।" এই সংখ্যাতে সরকারী শাসন সম্বন্ধে নরেশ সেনগুপ্তর কড়া সমালোচনা ছিল এক প্রবন্ধে। নরেশ সেনগুপ্ত আমাদের চেয়ে বয়সে ও ক্লাসে বেশ-বড়। বোধ হয় রাধাকুমুদের সহপাঠী। একালে উকিল ও গাল্পিক।

সেই বৎসরই পূজাব ছুটির পর বিশ্ব-বিদ্যালয় বয়কটের ধূম। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কায়েম হইতেছে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের জন্য তোড়জোড় চলিতেছে। পার্সিভ্যাল সাহেব এম-এ ক্লাসে ইংরেজি পড়াইতে-পড়াইতে কালো-মুখ লাল করিযা দেশের লোকগুলাকে বেশ-কশে দুঘা জুতা লাগাইলেন। পার্সিভ্যালের গালগুলা আমবা খুবই ভালবাসিতাম। এই গালাগালিগুলিও বেশ লাগিল। ক্লাসেব পর সুকুমার বলিতেছে—"দেখলি, তোর দিকে তাকানো আব চোখ রাঙানো? প্রেসিডেন্সী বয়কট করতে চাস্। তাব মানে, পার্সিভ্যাল-বয়কট? পার্সিভ্যাল সাহেবের চেযে বড় মাষ্টার পেয়েছিস আর কাউকে? এ কি পার্সিভ্যালের সহ্য হয়? দেশের লীডারগুলা ছেলে-গুলাকে প্রেসিডেন্সী হ'তে ভাগিযে নিযে পরকাল নষ্ট করাতে চায়? কাজেই পার্সিভ্যালের জুতো।"

হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। ডন সোসাইটিতেও সতীশবাবু তাঁকে ডাকিযা লইয়া বক্তৃতা দেওয়াইয়াছিলেন। একদিন পণ্ডিত মশায ডাকিয়া পাঠাইলেন তাঁহার ঘবে। মনোরঞ্জন আব সুকুমার সঙ্গে গেল। ঘরে গিয়া দেখিলাম—শীতল গাঙ্গুলি (একালের ডেপুটী) ও অন্যান্য দু একজনকে। একটা সরকারী চিঠি হাতে দিয়া পণ্ডিত মহাশয বলিলেন—"এই নেও স্টেট-স্কলার্শিপেব পরোয়ানা। আই হোপ ইউ উইল কাম ব্যাক্ অ্যাজ সিবিলিয়ান।" সুকুমার আর মনোরঞ্জন পণ্ডিত মহাশযকে বলিল—"ওটা দিযে আর কী হবে? বিনয স্টেট স্কলার্শিপ নেবেনা ঠিক ক'রেছে।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"এ আবার কী কথা? কে এমন পরামর্শ দিল?" সুকুমাব বলিল—"ও কারু পরামর্শ শুনে না। এমন কি ল-কলেজ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমরা ওকে কতবার বলেছি—'অন্ততঃ বি-এলটা পাশ ক'রে রাখ্। ভবিষ্যতে কখন কী হয় বলা যায় না। তোর নিজেরই হয়ত খেয়াল বদলে যাবে। উকিলিটা তো স্বাধীন ব্যবসা।" সুকুমার আইন পাশ করিবার জন্য আমাকে অনেক উস্কাইয়াছে। বলিত—"পরে পস্তাবি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলা বয়কট করার প্রস্তাব জননায়কগণের সভায় মঞ্জুর হইল না। গুরুদাস বাবু ছোকরাদেরকে ডাকিয়া বলিলেন—"বিশ্ব-বিদ্যালয় বয়কট করার দরকার নাই। আমরা একটা নয়া বেসরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ গড়িয়া তুলিতেছি।" সুকুমার বলিল—

"দেখলি? গুরুদাস বাবুর মাথা? সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাড়িবেন না। অথচ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎও খাড়া করাইবেন। তোদের ডন সোসাইটির প্রেসিডেণ্টই তো তিনি। সতীশবাবুর মেজাজ এখন কোন্‌দিকে রে? তোদের চালগুলা ভেস্তে যাচ্ছে দেখছি!"

হস্টেলে সুকুমারের ঘরে মহা হট্টগোল। কোঁদলের বিষয়—ন্যাশন্যাল কলেজ। বলিতেছে—"ন্যাশন্যাল কলেজ, ন্যাশন্যাল কলেজ শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল। তোদের ঐ কলেজে কে যাবে পড়তে? ইতিহাসও পড়াবে অরবিন্দ ঘোষ, ইংরেজিও পড়াবে অরবিন্দ ঘোষ। এক অরবিন্দর নামে কলেজ চলবে কদিন রে, গাধা? ব্রজেন শীল ও মাষ্টার হচ্ছেন না, রামেন্দ্র ত্রিবেদী ও মাষ্টার হচ্ছেন না, মোহিত সেনও মাষ্টার হচ্ছেন না, প্রফুল্ল রায় বা জগদীশ বোসও মাষ্টার হচ্ছেন না। কলেজের নাম হবে কিসে? মোক্ষদা সামাধ্যায়ীকেই বা কে চেনে? রাধাকুমুদ আর রবী ঘোষ তো ছোক্‌রা মাত্র। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সবে ধন নীলমণি অরবিন্দ ঘোষ!"

১৯০৬ সালে হস্টেলের পুরানো বাড়ীর নীচের তলায় থাকে বঙ্গেন্দু মুখার্জী। বাড়ী কৃষ্ণনগর। তাকে আমরা ডাকিতাম বাংলার চাঁদ বলিয়া। তখন আমাদের এম-এ চলিতেছে। সুকুমার মনোরঞ্জনকে বলিল—"মজার কথা শুনেছিস? বাংলার চাঁদের কাণ্ড? সেদিন টিপিং সাহেব (প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপক) এসেছিল হস্টেল দেখতে। যেই বঙ্গেন্দুর ঘরে ঢোকা আর যাবে কোথায়? অমনি বঙ্গেন্দু জলের কুজোটা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে খেলার মাঠের ভিতর ধুপ ক'রে ফেলে দিলে। টিপিং তো অবাক্! ব্যাপার কী? খৃষ্টিয়ান ঢুকবে হিন্দুর ঘরে? যে ঘরে খাবার জল থাকে?" খুড়োর ঘর ছিল তখন আড্ডাধারীতে ভরপুর। হো-হো হাসিতে গুলজার হইল।

বঙ্গেন্দু, খুড়ো আর আমি সুকুমারের ঘরে গুলতান করিতে-করিতে একসঙ্গে পড়া মুখস্থ করিতাম। কার্লাইলের "সার্টার রেসার্টাস", শেক্স-পীয়ারের 'সিম্বেলিন' অথবা পোপের 'এসে অন্ ম্যান' ইত্যাদি মাল পেটে ঢুকিত। ১৯০৬ সাল। পাড়ার ছোঁড়ারা আমাদের চেঁচামেচি আর হাতা-হাতিতে অস্থির। "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে। বলাবলি করিতেছে—"সুকুমারটাকে এই ঘর ছাড়াতে হবে।" সুকুমার কী করে? বাধ্য হইয়া বলিতেছে—"ন্যাখ্ তোর দার্শনিক ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা আর চলবে না। দে ওসব বাদ। দেখবি আর গণ্ডগোল হবে না। তুই যেখানে-সেখানে ফিলজফি ঢুকাবি। এইজন্যই ত হাতাহাতি। ওসব আমারও বরদাস্ত হবে না, বঙ্গেন্দুরও বরদাস্ত হবে না। মনোরঞ্জন একটু-আধটু তোর দিকে যায় বটে।

কিন্তু ফিলজফি নিয়ে ঢলাঢলি করে না। তোকে ডন সোসাইটি বড্ড বেশী পেয়ে বসেছে।"

একদিন মনোরঞ্জনকে সুকুমার বলিল—"বিনয়ের বাতিক দেখেছিস? গবর্মেণ্ট পার্সিভ্যালকে দিয়ে সন্ধ্যার সময় কমার্সের ক্লাস খুলেছে। ও গিয়ে সেই ক্লাসেও ভর্ত্তি হ'লো। ফিরে ফির্ত্তি ইকনমিক্‌স্ মুখস্থ করচে নতুন করে। যেখানে পার্সিভ্যাল সেইখানেই বিনয়। যায় ফিলজফির ক্লাসেও যায় পার্সিভ্যালের প্লেটো পড়ানো শুনতে।" সুকুমার, মনোরঞ্জন, অতুল, নলিন, সকলেই অবশ্য পার্সিভ্যাল-ভক্ত। পার্সিভ্যালের নামে আমাদের সকলেরই জিভে জল পড়িত। তবে এই সম্বন্ধে হাসিঠাট্টার সামগ্রী ছিল এই অধম।

১৯০৭ সালের মাঝামাঝি। কেহ গেল উকিলির দিকে, কেহ মাস্টার হইল কলেজে, কেহ হাকিমি করিতে চলিল। সুকুমারের সঙ্গে একদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা। তখন থাকি ৩৮।২ শিব নারায়ণ দাসের গলিতে—আবার সতীশ বাবু, রাধাকুমুদ, রবী ঘোষ ইত্যাদির দলে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর সুকুমারকে পাকড়াও করিলাম। বলিলাম—"ভাই, ন্যাশন্যাল কলেজের একটা ছোকরা এসে আমাকে ধরেছে তাকে টাকা সাহায্য করতে হবে। টাকার জন্য ধরে আমাকে? আমি করবো টাকা সাহায্য? বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। ত্যাখ্ তো তোর পকেটে কী আছে?" এই বলিয়াই আমি সুকুমারের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিলাম। যা-কিছু পাওয়া গেল লইয়া বলিলাম—"আচ্ছা এইটাই হউক মাসিক।" উচ্চবাচ্য না করিয়া সুকুমার বলিল—"তাই হবে, কিন্তু কোনোদিন আমার বাড়ীতে আস্‌তে পারবি না। আর ডাকে আমি কিছু পাঠাতে পারব না। রাস্তায়-ঘাটে যদি দেখা হয় কিছু পাবি।" ব্যাস। ও তখন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। এই অধম ন্যাশন্যাল কলেজে ঢুকিয়াছে মামুলি সেবক হিসাবে। খালি পা আর খালি গা। জামাও নাই, জুতাও নাই। বিলকুল কপর্দ্দকহীন।

বিনয় সরকার

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বকসী ৪ লালবিহারী ঠাকুর লেন

স্নেহাস্পদেষু মা পুষ্প!

সুকুমারের মৃত্যুতে আমি যে কত বড় মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। তোমাকে বলিয়াছিলাম সুকুমারকে হারাইলে আমার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা কঠিন। সে আর ইহজগতে নাই একথা ভাবিলেই আমি হৃৎপিণ্ডে অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করি এবং তাহা হইতেই তাহারই রোগে আজ আমিও শয্যাগত। সুকুমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাকেও যে অচিরে যাইতে হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ মাসাধিক

কাল শয্যায় আবদ্ধ। শুইবার ক্ষমতাও নাই। তবুও মা তোমার কোন ইচ্ছা পূরণ না করা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়, তাই এই অবস্থায় আমার নিজের স্কুমারের বিষয় যা বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইলাম।

ইতি তোমার বকসী কাকা

অজাতশত্রু স্কুমার

স্কুমারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে, যখন এই সুদর্শন বালকটি ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে গ্রীষ্মাবকাশের পর মেদিনীপুর কলেজ হইতে গুণানুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রেসীডেন্সী কলেজে বি এ পড়িতে আসিয়া এই হোষ্টেলে নতুন বাড়ীর দোতলায় স্থান লয়। সে থাকিত ৫৯ নম্বর ঘরে আমি থাকিতাম ৫৭ নম্বরে। আমরা উভয়েই প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী অনার্স লইয়া বি কোর্সে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম একই ক্লাশে পড়া একই ব্লকে থাকায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়। এই আলাপই ক্রমে তাহার স্বভাবের গুণে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই অমায়িক অকপট সরল হৃদয় নিরহঙ্কার বালকটি যাহার সহিতই মিশিত অল্পদিনেই তাহাকে অত্যন্ত আপনার করিয়া লইত। বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া স্কুমার হিন্দু হোষ্টেলে বন্ধু ও সহপাঠি মহলে বেবী নামে অভিহিত হইত। বন্ধুবান্ধবরা সকলেই তাহাকে বেবী বলিয়া ডাকিত, স্বনামে ডাকিবার লোক খুব কমই ছিল। এই অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি অত্যল্প কালমধ্যে নিজের পাঠ্য আয়ত্ত করিয়া গৃহান্তরে অন্য সহপাঠী বন্ধুদের ঘরে আড্ডা জমাইতে যাইয়া প্রায়ই বিতাড়িত হইত। এইটি তাহার দৈনন্দিন কার্য্যতালিকার অঙ্গ বলিয়া ধরিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হইবে না। পাঠ্যাবস্থায় স্কুমার ছিল বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন। মেদিনীপুর তখন ছিল বিপ্লবী দলের একটি কেন্দ্র। আলাপ আলোচনায় তাহার যে বিপ্লবী দলের সহিত কমবেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা বুঝিতে খুব বেশী চেষ্টা করিবার দরকার হইত না।

দেশাত্মবোধ তাহার রক্তে মিশিয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া দেশ স্বাধীন হইবে কেমন করিয়া দেশবাসীর উন্নতি হইবে সেই চিন্তা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। শেষদিন পর্য্যন্ত সে কখনও তাহার দেশ ও দেশবাসীকে ভুলিতে পারে নাই। স্কুমার ছিল আমার প্রিয়তম ও অকৃত্তিম বন্ধু কোনদিনই তাহার সহিত আমার মতান্তর হয় নাই। ঐ সময় আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যায় গোলদিঘীতে বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে দেশের কথা লইয়াই বেশী আলোচনা হইত। দেশকে স্বাধীন ও উন্নত করিতে হইলে আমাদের কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ তাহাই হইত আলোচ্য বিষয়। তাহার মতে পাঠ্যাবস্থা হইতে প্রত্যেক ছাত্রের মনে দেশাত্মবোধ জাগাইতে

চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক ছাত্রকে অশ্বারোহণ বন্দুক ছোঁড়া বিদেশী বর্জ্জন ও সর্ব্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। সে ছিল অমায়িক, অকপট বন্ধুভাবে সে আমাকে এমন অনেক কথাই বলিয়াছে যাহা আমার পক্ষে বাহিরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু তাহার অতুলনীয় ক্ষমার উদারতায় আশ্চর্য্য হইযাছি। ১৯০৫ সালে আমি হোষ্টেল ছাড়িয়া মেসে যাই ও মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হই। নানা কারণে এই সময় হইতেই আমাদের মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইলেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার অবকাশ খুব কমিয়া যায়। বোধ হয় ১৯১১ সালের শেষ ভাগে তাহার ছোট ভাই বসন্ত মদন মিত্রের লেনের বাসায় টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। তখন কলিকাতাতে অর্থের বিনিময়ে নার্স সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। সুকুমারের অনুরোধে আমাকে সেই সময় কয়েকদিন নাইট ডিউটি করিতে হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে, ঐ সময আমার পিতার গুরুতর পীড়ার টেলীগ্রাফ পাইয়া আমায় রাজসাহী যাইতে হয়। বাবাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম বসন্ত নিরাময় হইয়াছে। বসন্তর ঐ অসুখের সময় সুকুমারের আহার নিদ্রা ভুলিয়া একদিক্রমে দীর্ঘদিন শুশ্রূষার কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।

চাকুরী উপলক্ষ্যে উভযে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের ফলে ১৯১৬ সালের পূর্ব্বে আবার কিছুদিন আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম। সুকুমার যখন জলপাইগুড়িতে কমিশনারের P. A. ছিল আমি তখন শিলিগুড়িতে। সুযোগ পাইলেই—সে সদলবলে আমার বাসাতে আসিযা গল্পগুজব ও আনন্দে কাটাইয়া যাইত। সে ছিল আনন্দের প্রতীক। সাংসারিক পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক কোনও অশান্তি বা দুর্ঘটনাই তাহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে নাই। কোনও কিছুতেই তাহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। তাহার অভাবে আজ কত নিঃস্ব কত দুস্থ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও তাহাদের পরিবারবর্গ যে নিঃসহায় হইয়াছে তাহা সঠিক না জানিলেও তাহাদের সংখ্যা যে অল্প নহে সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তাহার দান ও সাহায্য ছিল অনন্যসাধারণ। মাসিক সাহায্য বা এককালীন দান কত যে ছিল তার ইয়ত্তা নাই। এসব সে গোপন রাখিত কারণ প্রকাশ পাইলে হয়তো গ্রহীতার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে পারে এইরূপ একটি সাহায্যের কথা এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুকুমারের অনুরোধে কিছুদিন আমাকে জগন্নাথঘাটে একটি দুস্থ পরিবারের চিকিৎসার ভার লইতে হইয়াছিল। একটি ডিপুটি বন্ধুর অকাল মৃত্যুর ফলে ইহারা নিতান্ত বিপন্ন ও নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হয়। অর্থাভাবে তাহাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এই সংবাদ পাইয়া সুকুমার তাহাদের ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ ভার নিজে গ্রহণ করে এবং চিকিৎসার ভার আমাকে লইতে অনুরোধ করে। পরোপকার ছিল তার সহজাত ধর্ম্ম। যে কোনও

প্রকারে কাহারও সাহায্য করিতে সে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। একটি ছেলে বেকার অবস্থায় কয়েক বৎসর আমার বাসাতে ছিল—সুকুমার তাহা জানিতে পারিয়াই তাহাকে একস্থানে কেরাণীর পদে বাহাল করিয়া দেয়। এখনও সে ঐখানে কার্য্য করিতেছে। দেশসেবা ছিল তার অস্থি মজ্জাগত—তাই, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে আই, সি, এস, দিগের কাম্য অতবড় সম্মানজনক আই, জি, আর, পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া ১২০০৲ টাকার পরিবর্তে ১০০৲ টাকায় শ্রীনিকেতনে অধ্যক্ষের কার্য্যভার গ্রহণ করে। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আমি তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া শ্রীনিকেতনে যাইতে পারি নাই। কবিগুরুর মৃত্যুর পর সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ সুকুমারের পক্ষে শ্রীনিকেতনে কার্য্য করা সম্ভব হইল না। ইহার পর সে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার হইয়া কিছুদিন নৈহাটিতে থাকে। ঐ সময় মেথর বস্তিতে কলেরা হওয়ায় সে নিজে সেখানের তত্ত্বাবধান করার ফলে নিজেও কলেরায় আক্রান্ত হয়। শুনিলাম ব্যাধির প্রকোপে জ্ঞান হারাণর পর সে নিজেই আমার নাম করে। আমি সংবাদ পাইয়াই নৈহাটীতে যাই এবং সে সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া অবধি নিজের তত্ত্বাবধানে তাহার চিকিৎসা করাই। রোগমুক্ত হইবার পর অন্নপথ্য দেওয়ার সময় তাহাকে বলিয়াছিলাম ভাই এবার তো ভাল হয়ে উঠলে কিন্তু তোমার অদৃষ্টে বহু দুঃখ আছে। এই কথা কেন যে আমার মুখ থেকে বাহির হইয়াছিল তাহা এখন বলিতে পারি না।

সুকুমার কোনদিনই লৌকিকতার ধার ধারে নাই। পূর্ব্বাহ্ণে খবর না দিয়া বিনা দ্বিধায় বন্ধুর বাড়ীতে উঠিয়া তাহার অনুপস্থিতেও নিজের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া লইতে সে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। কার্য্যান্তরে কলিকাতার বাহিরে থাকায় ১৯৪৪ সালের শ্রাবণ মাসে আমার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহে উপস্থিত হইতে পারে নাই। চিঠিতে আশীর্ব্বাদসহ ২০০ টাকার একখানি চেক পাঠাইয়া কন্যার ইচ্ছামত গহনা গড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল। এই সামান্য ঘটনাটিতেই তাহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী হইলেও গীতাই ছিল তাহার ধর্ম্মের একমাত্র উৎস। গীতোক্ত ধর্ম্মেই ছিল তাহার অগাধ ও অবিচলিত বিশ্বাস গীতার শিক্ষাকে সে আদর্শ ধর্ম্ম বলিয়া মানিত এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত এবং সেই পথেই নিজেকে সর্ব্বদা পরিচালিত করিত। তাই সে ছিল নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত সে গীতা অধ্যয়ন ও বহু বিজ্ঞ জ্ঞানীলোকের সহিত এই বিষয় আলাপ আলোচনা করিত। সফলকাম না হইলেও গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার নিজের বিশ্বাস ধারণা ও অভিজ্ঞতা সম্বলিত একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছাও একবার আমার কাছে প্রকাশ

করিয়াছিল। গীতার শিক্ষায় সুকুমারের অগাধ অবিচলিত বিশ্বাস থাকিলেও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি তাহার অন্তরে ভক্তির অভাব ছিল না। এই প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। সেবার কলেরার পর নিরাময় হইয়া উঠিলে আমি শেষ যেদিন নৈহাটী হইতে ফিরি সেদিন সুকুমারের অনুরোধে আমায় মূলাজোড়ে শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আসিতে হইয়াছিল!

ঐ সময় ঐ অঞ্চলে মহামারীরূপে কলেরার আবির্ভাব হইয়াছিল অশিক্ষিত ধাঙ্গড় মেথরদের রক্ষার জন্য সুকুমার অবিশ্রান্ত এইখানে ঘুরিত এবং মাছির প্রকোপে বিষ সহজে স্থানান্তরিত হওয়ার আশঙ্কায় সেই অনাচ্ছাদিত মায়ের প্রসাদ সে খায় নাই, ঘৃণা বা অবজ্ঞার লেশমাত্র তাহাতে ছিল না। আমায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠাবার মধ্যে ঐ ঘটনা যে তাহার মনে গভীর রেখাপাত করে নাই তাহা বলা যায় না।

শেষবার কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হইবার সংবাদ পাইয়া আমি যখন তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম, তখন তাহার প্রথম সম্ভাষণই হইল "ভাই তুই যা বলেছিলি তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।" আমি প্রথমে অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিল তুই হয়তো ভুলে গেছিস কলেরা সারার পর যেদিন প্রথম ভাত খেতে বসলাম তখন তুই বলেছিলি "এবারতো ভাল হলে কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার অদৃষ্টে বহু কষ্ট আছে।" এবং তাহার পর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধুর যা ব্যবহার শুনিলাম তাহাতে আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। তখনও তাহার আশা ছিল তাহারা ভুল বুঝিবে অনুতপ্ত হইবেই। অত্যন্ত পিতৃভক্ত সে, পিতার ইচ্ছায় নিজের আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সরকারি চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে রাজদত্ত নানা প্রকার সম্মানে ও খেতাবে বিভুষিত হইয়াছিল। কিন্তু নিজে ছিল সম্পূর্ণ মোহমুক্ত নিরাসক্ত। সুকুমারের পিতা রামসদন বাবু ছিলেন সেকালের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও রায়বাহাদুর উপাধিধারী। তখনকার দিনে এই পদবী ও খেতাবের মূল্য ও গৌরব যে কত বেশী ছিল তাহা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কত ধনী রাজা মহারাজা জমিদার প্রভৃতি এইরূপ উপাধি লাভের জন্য অকাতরে কত যে অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

সুকুমার ছিল পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং অসাধারণ পিতৃভক্ত। তাই পিতাকে সুখী করার নিমিত্ত বিনাদ্বিধায় সে সরকারী চাকুরী ও সরকারি খেতাব গ্রহণ করিয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুর পর এক কথায় আই, জি, আর, পদত্যাগ ও সর্ব্ববিধ খেতাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। নিজে অত পিতৃভক্ত ছিল বলিয়াই পুত্র ও পুত্রবধূর নির্ম্মম ব্যবহার তাহার পক্ষে মৃত্যুদায়ক রোগের উৎপত্তি

করিল। অনেকের ধারণা যে সরকারের থয়ের খাঁ না হইলে সরকারি কর্ম্মচারীর পক্ষে রাজসম্মান লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ ধারণার সত্য-মিথ্যা জানি না। তবে সুকুমারের সম্বন্ধে ওকথা একেবারেই খাটে না। সে ছিল অন্য ধাতের লোক চরিত্রের দৃঢ়তায় সে ছিল অতুলনীয়। উপরওলা, তিনি যত উচ্চপদস্থ হউন না কেন কোন আদেশ করিলে নির্ব্বিচারে তাহা পালন করিতে সে পারিত না। সে ছিল স্বাধীনচেতা, অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্য পরায়ণ। এবং চালিত হইত নিজের বিবেক বুদ্ধির দ্বারা—এমন কি তাহার প্রতি কে কি ব্যবহার করিল তাহাতে তাহার তাহাদের প্রতি ব্যবহারের কোন বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইত না। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাহার উইলে পাওয়া যায়। বালিগঞ্জ প্লেসের সেই দুর্ঘটনার পর সে উইল করিয়াছে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে সুশীলকে সকলের অধিক দিয়াছে। অথচ যে কন্যা তাহার প্রাণের অধিক ছিল সেই কন্যাকে সে এক কপর্দ্দকও দিয়া যায় নাই। তাহার চরিত্রের এইটেই ছিল বিশেষত্ব। অর্থকে সে কোনদিন বড় করিয়া ভাবে নাই। তাই শেষে তার মৃত্যু শয্যায় বারে বারে বসন্তকে দিয়া বলা সত্ত্বেও যখন সুশীল সুকুমারের ইচ্ছামত তাহার পিতৃদত্ত সম্পত্তিতে মায়ের জীবনসত্ত্ব স্বীকার করিল না তখন শুধু তাহাকে শ্রদ্ধাহীন পুত্রকৃত্য করিতেই বারণ করিয়া লেখাইয়াছিল, কিন্তু বিষয়ে বঞ্চিত করে নাই। সুকুমার জানিত তাহার হৃদয়ের যে উপাদান দিয়া তাহার কন্যা গঠিত ভাইকে বঞ্চিত করিয়া তাহা পুষ্পকে দিলে পুষ্প তাহা গ্রহণ করিবে না। সুকুমারের শেষ দান পত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নেহভাজন শ্রীমান সুশীলকুমার ও তাহার সহধর্ম্মিনী স্মৃতির ভাগে পড়িলেও সুকুমারের অন্তিমশয্যা পার্শ্বে ইহাদের অনুপস্থিতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত না হইয়া পারি নাই।

শেষের দিকে প্রত্যহই তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছি এবং চিকিৎসক ও বন্ধু হিসাবে সে সব দিনের কথাও কিছু বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি।

সুকুমারের অসুখে তাহার একমাত্র কন্যা পুষ্প ও জামাতা শ্রীমান শান্তনুর, অনন্য সাধারণ কর্ত্তব্য জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠা আমায় বিহ্বল করিয়াছে। রোগীর চিকিৎসা ও সেবা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। যে অপূর্ব্ব ও অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তাহা অতুলনীয় ও আদর্শস্থানীয় বলিয়া গণ্য হওয়া উচিৎ। মাহিনা করা শুশ্রূষাকারি থাকা সত্ত্বেও নিজেদের শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া কি অসীম ধৈর্য্যে ও অবর্ণনীয় স্থৈর্য্যে যে ইহারা সুকুমারের সেবা করিয়াছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।

এই কঠোর কার্য্যে তাহাদের সহায় হইয়াছিল তাহার কনিষ্ঠ পুত্র সুধীর ও তাহার বালিকা বধূ সীমা। বিলাতে থাকার দরুণ অক্ষয় নিজে সেবা করিতে

পারে নাই সত্য কিন্তু তাহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণার সেবা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং প্রসঙ্গে তাহার দৌহিত্রীদ্বয় শ্রীমতী উর্ম্মিলা ও পার্ব্বতীর কথা উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। এই বালিকাদ্বয়ের অক্লান্ত সেবা ও প্রাণপাত করিয়া শুশ্রূষার কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। সুকুমারের শেষ চিকিৎসার বিষয়ও কিছু লেখা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাই আমার জ্ঞাতসারে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সুকুমারের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বিশেষ বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাওড়ার সুবিখ্যাত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা চিকিৎসা করান হইলেও আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ ও উপদেশে বিভিন্ন সময়ে কবিরাজী ও এ্যালোপাথিক চিকিৎসাও করান হইয়াছিল।

সুকুমারের ব্যাধির সূচনা হইতেই অক্লান্ত কর্ম্মী পরহিতব্রতী সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের এবং অন্যান্য হিতাকাঙ্খী বন্ধু বান্ধবদের ইচ্ছায় এবং উপদেশে ডাঃ এডমণ্ড রোনাণ্ড চিকিৎসা করেন। পূর্ব্বে যোগেশ ব্যানার্জ্জী, নলিনী সেনগুপ্ত মহাশয়রাও দেখিয়াছিলেন। সহকারী হিসাবে প্রত্যহ শ্রীমান কুলচন্দ্র ভৌমিক ও শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ দে ও শেষ দিন পর্য্যন্ত যে অতুলনীয় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে তাহা দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না এত চেষ্টা পরিশ্রম সবই বৃথা হইল সুকুমারের অমূল্য প্রাণ রক্ষা হইল না।

এই মহাপ্রাণ অক্লান্ত কর্ম্মী পরোপকারী নিরহঙ্কার অমায়িক, অকপট সরল হৃদয়, বন্ধু বৎসল দেশ সেবকের এই অকাল মৃত্যু শুধু বাঁকুড়া জেলার নয় সমগ্র বাংলা দেশের পক্ষে মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা। বাংলার এই সুসন্তানের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবার আশা সুদূর পরাহত। এই অজাতশত্রু প্রিয়তম বন্ধুটির ন্যায় পরায়ণতা ও অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতার কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

ইতি—

হেমেন্দ্রনাথ বক্সী

ঋষীপ্রতীম সুকুমার

আমার দুর্ভাগা বাঁকুড়ার পরম দরদী বন্ধু ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পূত স্মৃতি স্মরণার্থে আজ একথাই বলব যে—তাঁর অবর্ত্তমানে বাঁকুড়ার ক্ষতি সত্যই অপূরণীয়। যখন যে অবস্থায়—যেখানেই তিনি থাকতেন, তাঁর অন্তরের

ব্যাকুল চিন্তা ও অপার ভালবাসা বাংলার এই দরিদ্রতম ক্ষয়িষ্ণু জেলায় জন্যই থাকত সদাজাগ্রত। বাঁকুড়া যার ধ্যান, বাঁকুড়া যাঁর জ্ঞান, প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুতে বাঁকুড়া যাঁর ঐকান্তিক অনুভূতি—এমন একজন 'বাঁকড়ীর' আবির্ভাব—বাঁকুড়ার ইতিহাসে খুব বেশী·বার হয়নি, ভবিষ্যতে আর হবে কিনা জানি না।

আমার প্রথম পরিচয় তাঁর সাথে আমার ছাত্রজীবনে। সুকুমারবাবু তখন বাঁকুড়া সদরের এস্-ডি-ও, আর আমি বাঁকুড়ার প্রথম স্কাউট-মাষ্টার। বাঁকুড়া সহরের রাস্তার আসে পাশে পড়া আবর্জ্জনাকে নিজের হাতে সরিয়ে দিতে তাঁকে দেখেছি,—প্রত্যক্ষ করেছি আবর্জ্জনা স্তূপ পরিষ্কার করে কোন কিছুকে সুন্দর করে দেখবার চেষ্টা মানুষকে ছোট করে দেয় না, শিখেছি যে চিরসুন্দরের প্রকাশ মানুষের মধ্য দিয়ে তাঁরই সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। মানুষের চেষ্টা ও কাজে, যে হাতে সে নোংরার স্তূপ পরিষ্কার করে সেই হাতেই তাঁর পূজা দেয় সে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের প্রকাশে। কোন কাজই মানুষকে ছোট করে না—কাজই মানুষকে বড় করে—এটা শিখেছিলাম সুকুমার বাবুরই কাছে—আমার জীবনে তাঁর সান্নিধ্যে প্রথম আসার সুযোগে।

আমার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তাঁর সাথে আবার দেখা হয় এর প্রায় বছর দুই পরে ১৯২৭ সালে। আমি তখন College Branch Y. M. C. A. এর সহ-সম্পাদক, বস্তী উন্নয়নের কাজে খুব করে লেগে পড়েছি পুরো উদ্যমে, আর সুকুমার বাবু Writer's Buildingএর সমবায় বিভাগের অন্যতম কর্ণধার। আমার বস্তী উন্নয়ন কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল প্রচুর এবং আমার কাজ আমি যাতে সুশৃঙ্খলে করে যেতে পারি তারজন্য তিনি আমায় সদা সর্ব্বদা নির্দ্দেশও দিতেন। একদিন বলেছিলেন—"ওই ঝাড়ুয়ালা, মেথর ও ডোমেদের ছেলেদের শুধু খেলাধুলো এবং সাধারণ আনন্দের মধ্য দিয়েই সত্যিকারের মানুষ করে তোলা যায় না, তারজন্য দরকার ব্যাপকতর শিক্ষা-ব্যবস্থা। অধ্যাপক বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তিনি এ বিষয়ে কতদূর চেষ্টা করেছিলেন তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন বাংলা সরকারের গণ-শিক্ষা আন্দোলনের জন্য আপেক্ষিক সক্রিয়তায়।

এরপর ১৯৪২ সালে যখন আমি বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরি-চালক হিসাবে নিযুক্ত, তখন হঠাৎ একদিন সকালে ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এসে ডাক দিয়ে আমায় বললেন, "সন্থ, বাঁকুড়ায় এ বৎসর খুবই দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, এই জেলাব্যাপী অনেক প্রতিষ্ঠানেরই বাঁকুড়ার দুঃস্থ ও আর্ত্তের সেবাকার্যে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন—কিন্তু এইসব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে যাতে সমস্ত জেলার একটীও লোক অনাহারে না মরে তার জন্যে Relief Coordination কমিটি আমি গঠন করছি, এর উদ্দেশ্য—যেন এই

কমিটির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক বিপন্ন অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য সুচারুরূপে বিতরণের ব্যবস্থা হয়। আমি শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রভূষণ সিংহ মশায়কে এই Co-ordination Committeর সভাপতিত্ব নেবার জন্য রাজী করিয়াছি এবং আমি চাই—যেন তুমি অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদকরূপে এই কমিটির ভার গ্রহণ কর।" বলা বাহুল্য তাঁর কথা এড়াবার ধৃষ্টতা আমার কোনকালেই নেই,—তাই তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে এই Relief Co-ordinationeএর কাজে নিযুক্ত হই। এই কমিটি বহু সহস্র টাকা '৪২-৪৩ সালে ব্যয় করে জেলার রিলিফ কার্য্যে, কিন্তু এই সমস্ত টাকার অধিকাংশই তাঁরই চেষ্টায় সংগৃহীত। এই সময় তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভাপতি—পরে অবশ্য তিনি এ হ'তে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। সেই সময়ের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এই ব্যাপারে সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের এই জেলার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে শোচনীয় অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য পদে পদে আমাদের কাজকে ব্যাহত করলেও আমরা এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম—একমাত্র সুকুমার বাবুরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুনিপুণ নেতৃত্ব পরিচালনায়।

বাঁকুড়া ব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যখন অপেক্ষাকৃত স্তিমিত হয়ে এলো—সুকুমার বাবুর প্রাণে তখন সাড়া দিলো সমগ্র জেলার উন্নয়নের চিন্তা। তাঁর এই চিন্তা ও চেষ্টার ফলেই গড়ে উঠলো বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন সমিতি। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় বাঁকুড়া জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বয়প্রাপ্তদের শিক্ষাদান আন্দোলনে সুকুমার বাবুরই সহযোগী কর্মী শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় আই, সি, এস। এই উন্নয়ন সমিতি ও তার শাখা সমিতিগুলির কার্য্যাবলী বাঁকুড়া দর্পন ও প্রবাসীর পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সময় আলোচিত হয়েছে। সুকুমার বাবুরই চেষ্টায় উন্নয়ন সমিতির পরিকল্পনাগুলি পশ্চিমবাংলার স্বাধীন সরকারের উন্নয়ন প্রয়াসকে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য ক'রে এসেছে বিভিন্ন দিক দিয়ে। সেচ বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদারের তৎপরতা এ বিষয়ে সত্যই প্রশংসনীয়। একদিন এই অঞ্চলের নাম ছিল—জঙ্গল ম্হিলা—। বৃষ্টির তখন ছিল প্রাচুর্য্য আজ এই জেলা মরুভূমিতে পরিণত হতে বসেছে। দিক হতে দিগন্ত ব্যাপী শূন্য প্রান্তর হাহাকার করছে এক ফোটা বৃষ্টির জন্য ফলন গেছে কমে দুর্ভিক্ষ তাই এর নিত্য সহচর। সুকুমার বাবুর প্রাণ কেঁদেছিল আবার এই জেলাকে সবুজ সতৃণ করে গড়ে তোলার জন্যে। সরকারকে সুস্পষ্ট করে তিনি বারবার জানিয়ে এসেছেন এই ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত ও তৎপর হতে। স্তরের পর স্তর মৃত্তিকার প্রলেপ বাঁকুড়ার বুক হতে যতোই ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরক্লিষ্ট বাঁকুড়ার কঙ্করময় কঙ্কাল—নগ্ন বীভৎসতায় বাঁকুড়ার ভবিষ্যৎকে ততই করে তুলছে শিহরিত।

সুকুমার বাবুর নির্দ্দেশে জেলার বুক চিরে জ্বালানি কাঠ চালান বন্ধ করার প্রয়াস পেল সরকার, মাটি নিয়ে চললো পরীক্ষা। শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন সচীব সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতায় বৃক্ষরোপন সপ্তাহ প্রতিপালন হল অপরিহার্য্য। জেলা উন্নয়ন সমিতির পরিকল্পনা অনুসারে আজ বাঁকুড়ায় খোলা হয়েছে ডেপুটি ডিরেক্টার অব ফরেষ্টের দপ্তর। জেলাব্যাপী রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার পুনঃ প্রবর্ত্তন ও নতুন করে রাস্তা খোলার আয়োজনে সুকুমার বাবুরই প্রচেষ্টাতে জেলা উন্নয়ন সমিতির প্রদত্ত পরিকল্পনা সরকার গ্রাহ্য করেন। বাঁকুড়া জেলার অস্তিত্বের সঙ্গে জেলা উন্নয়নের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, আর সুকুমার বাবুর সঙ্গে জেলা উন্নয়নের সম্পর্ক পিতাপুত্রের। কী গভীর চিন্তায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত তিনি উৎকণ্ঠ ছিলেন এই জেলার জন্যে। তাঁর জীবনের প্রান্ত রেখাতেও নতুনভাবে তা উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই স্বদেশ বন্ধুকে দেখতে এসেছিলেন তাঁর মৃত্যুশয্যায়। সেদিনের আর একটি কথা আমার মনে পড়ে, যার প্রসঙ্গে সুকুমার বাবুর ধর্ম্ম জীবন আমার চির নমস্য। মণ্ডলীর উপাসক আমি, জীবনকে কোনদিন ধর্ম্ম হতে স্বতন্ত্র করে ভাবতে পারিনি। তাই আমার চোখে জীবনের যেখানে প্রান্ত পরিণতি, ধর্ম্মাচরণে ঈশ্বরপদে পরিপূর্ণ প্রণিপাত সেইখানেই, সারাজীবন সেই পরম পুরুষের জ্যোতিতে শুচিস্নাত হয়ে "তাঁর" শক্তিরই সুকুমার বাবু দিয়ে গেছেন শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই কর্ম্মবীর ভাগবতের নির্ব্বাণের প্রাক্কালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্বতঃই আমি তাঁর জন্য প্রার্থনায় রত হই। তাতে কী পর্য্যন্ত শান্তি যে তিনি পেয়েছিলেন সেই সময় মর্মান্তিক রোগ যন্ত্রণা সত্ত্বেও তা তখন তাঁর মুখে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে! শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সকল কর্ম্মে ও সকল ধর্ম্মে পরম প্রেয় ও শ্রেয়কে তিনি সন্ধান করে এসেছেন আজীবন। সকল ধর্ম্মে ও সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়ে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস, হিন্দু ধর্ম্মে তাঁর ছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা। কোনো ধর্ম্মেরই কোনো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে মানুষ হতে পৃথক করে দেখতেন না। সকল মানুষেরই প্রতি তাঁর ছিল সাম্যভাব। মানুষ যে ধর্ম্মাশ্রয়ীই হোক না কেন তাকে তিনি বিচার করতেন তার চরিত্র ও ব্যবহার থেকে। আর মানুষকে চেনবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল অসীম। কী যেন এক অন্তর্দৃষ্টি তাঁর বিচারকে করতো ন্যায়নিষ্ঠ। বাঁকুড়া সহরের পশ্চিম প্রান্তে কলেজ কম্পাউণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে, অহল্যাবাই আর রিকেট রোডের মোড়ে সরকারী কৃষিবিভাগ আর গবাদি পশুর চিকিৎসালয়ের পাশে জেলাবোর্ডের একটা ছোট বাংলোর মত আছে। শেষ কয়বার তিনি ওখানেই এসে থাকতেন। কি জানি জায়গাটার নির্লিপ্ত ও নিরালা তাঁর মনে কোনো শান্তির প্রলেপ এনে দিয়েছিল কিনা। কিন্তু ঋষিপ্রতিম সুকুমারকে প্রায়ই

সেখানে দেখেছি দিনের কাজ আরম্ভের পূর্ব্বে অসীমের শক্তির সন্ধান করতে প্রাতঃকালীন গীতারাধনার মধ্য দিয়ে। এই ধ্যান নিমগ্ন অবস্থায় বহুবার তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই অবস্থার পর প্রত্যেক আলাপনের মধ্যে পেয়েছি তাঁর অন্তঃস্থিত সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত্তি, বুঝেছি ধর্ম্মই মানুষকে মানুষ করে তোলে সকল জীবের কল্যাণ কামনায় মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসায়।

দেবতার দীপ হাতে অন্ধকার বাঁকুড়ার বুকে যিনি নেমে এসেছিলেন স্বর্গ হতে আজ স্বর্গে তাঁর ফিরে যাবার বেদনাময় স্মরণে স্বতঃই সেই পরমপুরুষের পায়ে মাথা লুটিয়ে পড়তে চায়। প্রার্থনা করি যেন তাঁর আশীর্ব্বাদে বাঁকুড়া' বাসীর চোখের জল সার্থক হয়।

Rev. C. C. Pande. Bankura — শ্রীখৃষ্টচরণ পাণ্ডে
Secy. Bankura Development Committee

দুঃখেস্বনুদ্বিগ্নমনা

৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯২৪ সালে। সে সময়ে তিনি বাঁকুড়ার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি তখন কলকাতায় পড়ি। তাহার পর বহুদিন তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। পরে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়।

কার্য্যক্ষেত্রে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন ও অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে ইনস্পেক্টার জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতার তুলনায় এ উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

অবসর গ্রহণের নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবা ও পল্লী সংগঠনের কার্য্যে যোগদান করেন।

রাজকার্য্যের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দেশসেবার যথেষ্ট সুযোগ না থাকায় তিনি আর্থিক ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়া বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের অন্বেষণে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার চরিত্রে যে গুণটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম সেটি হইতেছে তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম। বাঁকুড়ার মেডিকেল স্কুলের উন্নতি, বাঁকুড়ার কৃষির উন্নতি পুষ্করিণীসংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এ সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা কি করিয়া হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার বিরাম ছিল না।

দেশের পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ছিল গভীর। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি সাহিত্য চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নাই। ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার বহুবার আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে।

সংসারে ও কর্ম্মক্ষেত্রে বহু ঘাত প্রতিঘাত ও অশান্তি তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অভিভূত না হইয়া অবিচলিত চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান ছিলেন। "দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা" এই নীতি অনুসারেই তিনি নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

২৪৫ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

শ্রীকরুণাকুমার হাজরা

—*—

আনন্দময় সুকুমার।

কল্যানীয়া পুষ্প!

তোমার চিঠি ঠিক সময়েই পেয়েছি। এ চিঠির কি যে উত্তর দেব তা স্থির করতে না পেরে উত্তর দেওয়া হচ্ছিল না। চিঠিখানির প্রতি পংক্তি ব্যথায় ভরা এর সান্ত্বনা কোথায়? বাপ চিরদিন কারুর থাকে না। বাঙ্গালীর পরমায়ু মনে করলে তোমার পিতার অকাল মৃত্যু হয়েছে তাও হয়তো অনেকে বলবে না। কিন্তু তুমি জানো এ মৃত্যু তাঁর স্বাভাবিক নয়। তোমার এ দুঃখের সান্ত্বনা বাইরে থেকে আসবে না। ভেতর থেকেই তা আহরণ করতে হবে। তুমি যথাশক্তি তাঁর সেবা করতে পেয়েছিলে এও এক সৌভাগ্য। মেয়ের এ সৌভাগ্য প্রায় হয় না। বড় ছেলের কাছে তিনি কি ব্যথা পেয়েছিলেন তা আমাকে বলেছিলেন। যেটুকু জেনেছিলাম তার বেশী জানবার ইচ্ছাও বড় আমার হয়নি। তার পর থেকে মাঝে মাঝে ভাবতুম ভাইবোনের প্রকৃতির মধ্যে এত পার্থক্য কেমন করে সম্ভব হল? আমাকে তোমার বাবার জীবনের কথা কিছু লিখতে বলেছ—তিনি যখন বহরমপুরে ছিলেন শৈশবে কৈশরে ও প্রথম যৌবনে—তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সুতরাং তাঁর বাল্যজীবনের কথা আমি প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জানিনে। তাঁর সে সময়কার বিশিষ্ট বন্ধু জ্যোতিষবাবু (বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ) দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে সম্প্রতি মারা গেছেন। আর এক বাল্যবন্ধু গুরুদাস সরকার কিছুদিন হল কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন। তিনিই সুকুমার বাবুর সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন এবং সেকথা লেখার যোগ্যতাও তাঁর আছে।

আমি সুকুমার বাবুকে প্রথম দেখি ১৯১৩ সালে কৃষ্ণনগরে। ১৯১৩ সালে আমি ওভারশিয়াররূপে চাকরিতে প্রথম প্রবেশ করেছি তিনি তখনই লব্ধ

প্রতিষ্ঠ ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।- খড়ে নদীর ধারে দ্বিতল বাসায় তিনি সপরিবারে থাকেন। ঠিক সামনে অতি ক্ষুদ্র ছুটি ঘরে আমি একরকম একাই বাস করি। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোন পরিচয় হয়নি। তখন আমার গান গাওয়া অভ্যাস ছিল। অফিসের কাজ সেরে হারমনিয়ম সহযোগে মাঝে মাঝে একাই গান করতাম। বলা বাহুল্য রবীন্দ্র সঙ্গীতই (তখনকার দিনের) বেশী গাইতুম। বহু বড় বড় অফিসার ও বন্ধু পরিবৃত সুদর্শন সতত আনন্দমুখর নবীন ডেপুটীকে আমার উচ্চস্তরের মানুষ বলেই মনে হত। তখনও তাঁর অন্তরেব পরিচয় পাইনি।

একদিন আমি গান গাচ্ছি সহসা সুকুমার বাবু আমার ঘরে এসে উপস্থিত। গান হচ্ছিল—"কাব অভিমানে এমন ফাগুনে ঘনাল বরষ আজি!" পুরণো ঢংএর গানও নয় অথচ তিনি শোনেন নি বা জানেন না। এমন গান আমি কোথায় পেলুম সেই কৌতূহল বশেই তিনি আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছিলেন। গানটি আমারই রচিত শুনে তিনি আমার ওপর শ্রদ্ধান্বিত হলেন এবং তাঁর যে অভিমান ছিল—রবীন্দ্রনাথেব এমন কোন গান বা কবিতা নেই যা তাঁর কণ্ঠস্থ নয় সে অভিমানও অক্ষুন্ন রইলো। সেই দিনই বা পরের দিন তিনি আমায় টেনে নিয়ে গেলেন স্থানীয় ক্লাবে বা লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীর তিনি দেখলাম সেক্রেটারী, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে গান গাইয়ে সেখানকার মেম্বার করে দিলেন। তারপর থেকে চলতে লাগলো রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা—অর্থাৎ তিনি আবৃত্তি করে যেতেন আব আমি শুনতাম। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। Excise Dept তখন তাঁর হাতে। ১০।১২ মাইল দূরে মফস্বল যাবেন, আমায় সঙ্গী করতেন। ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে কৃষ্ণনগর থেকে কবিতা আবৃত্তি সুরু করলেন হয়তো উলা বা নবদ্বীপ ঘাটে গিয়ে শেষ হল। মাঝে মাঝে কিছু আলোচনাজনিত বিশ্রাম। তাঁব আবৃত্তির বিশেষত্ব দেখেছি, যা আর কারও দেখিনি, কোন ছত্র ভুলে গেলেও আবৃত্তি কিছুমাত্র থামতো না। অর্থাৎ তারপরের ছত্র থেকে তখনই আরম্ভ হয়ে যেতো।

সুকুমার বাবুর সঙ্গে আমার যে অন্তরঙ্গতা তা সম্পূর্ণ সাহিত্যপ্রীতি থেকে। তাঁর বা আমার পারিবারিক সুখদুঃখ নিয়ে পরস্পর কোন কথাই প্রায় হতনা। পাঁচজনকে নিয়ে আনন্দ করার তাঁর অদ্ভুত শক্তি ছিল। তাঁর সেই উৎসাহের সঙ্গে আমি কোনদিন তাল রাখতে পারতাম না।

একবার আমার গ্রামে গেলেন (হরিপুর নদীয়া) সেখানে স্থানীয় বিলে একটা ভাঙ্গা খোলা নৌকায় চেপে পাড়ার অনেকগুলি যুবক ও ছোকরাকে নিয়ে সে কি উৎসাহ। তখনকার দিনে সাধারণের চোখে ডেপুটিরা

কম লোক ছিল না ; কিন্তু সুকুমার বাবু সে বাঁধ ভেঙে দিয়ে সকলের সঙ্গে মিশে যেতেন।

তারপরে কর্ম্মজীবনে আমরা দূরে দূরে কাটিয়েছি। মাঝে মাঝে যখন পরস্পরের খোঁজ খবর নিয়েছি তখন ঠিক পুর্ব্বের মত ভাবই বজায় ছিল। অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে ট্রেনে রংপুর জেলায় দেখা। তখন তিনি বোধ হয় রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি কাগজে দেখেছেন আমি কুমার সম্ভবের ছোট একটি বাংলা অনুবাদ করেছি। ট্রেনেই আরম্ভ হয়ে গেল কালিদাসের কুমার সম্ভব আবৃত্তি। বললেন আমি ছেলেদের জন্য সংস্কৃত কাব্য আবার পড়ছি আর ছেলেও সংস্কৃতে কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছে। বোধ হয় বড় ছেলেরই সম্পর্কে তিনি সে গৌরব করেছিলেন। আমার প্রথম কবি জীবনে সুকুমার বাবুর উৎসাহই প্রধান আশ্রয় হয়েছিল। ১৯১৩ বা তার পরেও কিছুদিন আমার অপর কোন বিশিষ্ট উৎসাহদাতা ছিল না।

অযাচিতভাবে তিনি বন্ধুর উপকার করতেন। শেষবার বহরমপুরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তখন জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্রবধূর ঐ ব্যবহারের পর অসুস্থ শরীরেও আহতচিত্তে তিনি যোগেশবাবু ইঞ্জিনিয়ারের অতিথি। আমার বাসায় দেখা করতে এসে শুনলেন আমার বড় ছেলের ঢাকায় প্রোফেসারি করা নিরাপদ নয়, কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি তখনকার মুসলমান শিক্ষামন্ত্রীকে সেই সম্পর্কে চিঠি লিখে দিলেন এবং বললেন তিনি এখন বড় হয়েছেন পূর্ব্বের খাতির রাখবেন কিনা জানিনা তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি। আমার ছেলের বদলি মঞ্জুর হয়েছিল। প্রার্থনা করি তোমার মনের বেদনা দূর হোক্। তোমরা সুখে থাক।

জন্ম-মৃত্যু

জীবনে তো দুইজনে ছিনু দূরে দূরে।
তোমার অন্তর শুধু এ অন্তর জুড়ে
ছিল চিরদিন বন্ধু, আজও তাই আছে।
দূরের হইয়া তবু আছ কাছে কাছে।
হয়তো পথের বাঁকে পাব অকস্মাৎ
কলহাস্য মুখরিত প্রসন্ন সাক্ষাৎ,
যেমন পেয়েছি বারে বারে, সে আশায়
মোর শেষ দিনগুলি আসে আর যায়।
মৃত্যু লভি মোর কাছে হলে মৃত্যুহীন
ঐ অন্তরে প্রতিদিনই তব জন্মদিন।

(কবিশেখর যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত)

বহরমপুর মুর্শিদাবাদ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ধনীর দুলাল সুকুমার

তখন প্রেসীডেন্সী কলেজে পড়ি। হিন্দু হোষ্টেলে থাকি। হিন্দু হোষ্টেলে সর্বসময়ই অনেক ভালো ছেলে বাস করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে। আমাদের সময়ে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম মনে আসিতেছে। নবাগত একটি ভালো ছেলে বিশেষভাবে আমায় আকৃষ্ট করিল। ইনি সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার চরিত্রের যে দিকটা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাপ্রণালী ও তাঁহার প্রত্যেকের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার শক্তি।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ধনীর সন্তান পিতৃদত্ত বৈভব তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও চরিত্র-বলকে উদ্দিপিত করিল।

এই পাথেয় লইয়া তিনি যাত্রা করিলেন। নিজের প্রতিভার বলে তিনি সরকারি চাকুরী পাইলেন এবং কর্ম্মশক্তি তাঁহাকে উহার শীর্ষস্থানে উন্নীত করিল। নিশ্চয়ই ইহা একটা বড় কথা।

কিন্তু সুকুমারের জীবন মহীয়ান হইয়া উঠিল তখনই, যখন নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ত্তির বহু পূর্ব্বে তিনি ঐ চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীনিকেতনের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। যে আসন আই, সি, এস দিগেরও কাম্য ছিল কিসের লোভে তাহা তিনি ত্যাগ করিয়া আসিলেন সেইটাই আজ আবার আমরা চিন্তা করি।

সরকারি কার্য্যে সুকুমার বাবু বাংলার বিভিন্ন জেলার সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। শুধু আদালত গৃহের আবেষ্টনের মধ্যে নয়। বাহিরে তাহাদের জীবন যাত্রার ভিতরে। দেশবাসীর দারিদ্র ও অশিক্ষা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিয়াছে। সরকারি কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া ঐই দুঃখ দুর্দ্দশা যতটুকু দূর করা সম্ভব তিনি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মন তাহাতে তৃপ্তি পায় নাই।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শ্রীনিকেতনের কর্ম্ম পরিচালনার জন্য একজন ভালো লোক বড় সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া আসিতে চায়। এ লোক যে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় আমি অনুমান করিলাম। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সুকুমার চলিয়া আসিলেন। টাকার অঙ্কের ক্ষতিটার হিসাব করিলেন না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল লোকটার মাথায় ছিট আছে। নিশ্চয়ই ছিট থাকিবার কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য যে বুদ্ধিমান লোকেরা সংসারকে তাহার চিরন্তন পথে লইয়া যায় মাত্র, উচুতে তোলে ঐ ছিটগ্রস্থ লোকেরা।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিকেতনে যোগদান করিলেন। কয়েক বৎসর

পর নানাকারণে তিনি ঐ কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া আমাকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি গ্রহণ করিলাম।

কিন্তু গিয়া দেখি সুকুমার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন আমার মতো লোকের তাহা বজায় রাখা দুঃসাধ্য।

ধনীর দুলাল সুকুমার অনেক টাকার মালিক সুকুমার দেশের কাজ করিতে যাইয়া সম্পূর্ণ নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। খাওয়া দাওয়ায় বেশ ভূষায় গ্রামবাসীর সরল জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত লইয়া কাজে নামিলেন যে গ্রামবাসীদের সম পর্য্যায়ে না নামিলে তাহাদের সঙ্গে একত্র কাজ করা সম্ভব নয়। দেশসেবার এই উচ্চ আদর্শের নিকট আজ আবার আমার মস্তক অবনত করিতেছি।

কবির কথা অনুসরণ করিয়া বলি আজ তোমার বাঁচিয়া থাকা উচিৎ ছিল। তোমাকে দেশের প্রয়োজন আছে।

শ্রীনিকেতন
বীরভূম.

(অধ্যাপক) শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
(সচীব শ্রীনিকেতন)

নীরব কর্ম্মী সুকুমার

সে আজ অনেকদিনের কথা। আমি তখন কলেজের ছাত্র। দেশের বাড়ী ছেড়ে পাবনা সহরে আমরা বাস করি। আমার দাদা পাবনা সদরে ওকালতী করেন। একদিন তাঁর কাছে শুনলাম এবার যে সদরালা (S.D.O.) এসেছেন তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি নির্ভীক আর তেমনি সত্যনিষ্ঠ। তাঁর কাছে সত্যই সুবিচার পাওয়া যায়। আর তিনি বঙ্কিম বাবুর কি রকম ভাইপো।

আমাদের কাছে তখন আনন্দ মঠের বঙ্কিম, বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম, নবযুগের শ্রষ্টা বঙ্কিম যে কত বড় আকাঙ্খার বস্তু সেকথা বুঝিয়ে বলতে পারবো না, সেই বঙ্কিমের ভাইপো আমাদের সদরালা? তাঁকে দেখতেই হবে। সম্বন্ধ বিচার করার কল্পনাও আমার মনে হয় নাই চট্টোপাধ্যায় আর চট্টোপাধ্যায় তারপর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং নির্ভীকতা।, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট আমার মনে হয়ে ছিল। কাজেই কোর্টে তাঁকে দেখতে গেলাম সেই আমার সুকুমার বাবুকে প্রথম দেখা।

সেই সুদূর অতীতের কথা আর আমার অত পরিষ্কার মনে নেই। তবে এইটুকু বেশ মনে আছে যে সেই প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল যে এর মধ্যে

যথার্থই একটা প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে। তার স্ফুরণ যে কোন দিকদিয়ে কোন পথে হবে তার কল্পনা করার সামর্থ আমার ছিল না!

তাঁরপর দূর থেকে তাঁকে দেখেছি 'তাঁর কথা' শুনেছি আর ভেবেছি তিনি একটা প্রচণ্ড সক্রিয় শক্তির অধিকারী। যার ফলে সব সময় নিজে কিছু না করে এবং যার সংস্পর্শে তিনি আসেন অপরকে কাজের প্রেরণা না দিয়ে শান্তি পান না। সরকারি চাকুরী করতেন তিনি কিন্তু আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে নয়। তিনি যে বাংলা মায়ের সন্তান বাংলার ছেলেমেয়ে জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে তাঁর আপনার লোক, সে কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। বাংলার প্রতি তাঁর দরদী ছিল গভীর, তার দুর্দ্দশা অনুক্ষণ তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাই যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন দেশের উন্নতির জন্য নানা কাজ করেছেন ও নানা কাজের কথা বলতেন। গ্রাম পল্লী উন্নয়নের কথা, বাংলা গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে পুকুর পঙ্কোদ্ধারের কথা, বড়দের বয়স্কশিক্ষার কথা মেয়েদের উন্নতির কথা এমনই আরো অনেক কথা।

তারপর বহুদিন আর তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়ার আমার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আমার কর্ম্মজীবনে তাঁর জামাতা আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্ত্তমানে সহকর্ম্মী শ্রীমান শান্তনুর কাছে তাঁর ক্রমশঃ সরকারি চাকুরীতে পদোন্নতির কথা জেনেছি।

ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁকে দেখার ও তাঁর কথা শুনবার সুযোগ পেলাম কিছুদিন আগে ১।২ কলেজ স্কোয়ারে ষ্টুডেন্ট হলের রেভারেণ্ড বিলাস মুখোপাধ্যায়-এর ওখানে। একদিন বিকেলে ওঁদের ওখানে গিয়েছি। সেখানে দেখি সুকুমার বাবু চায়ের টেবিলে বসে অনর্গল প্রাণের আবেগ দিয়ে দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা, মুসলীম লীগ মিনিষ্ট্রীর কথা বলে চলেছেন। আমার আসা এবং পরিচয় তাঁকে তাঁর বক্তব্য বিষয় থেকে বিচ্যুত করলো না। তারপর আগেও অনেক দিন ওখানে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ তাঁর কথা শোনার ও তাঁকে জানার সুযোগ হয়েছে। যখন তাঁর কথা শুনেছি মনে হয়েছে যা তিনি বলছেন সেইটাই ঠিক।

আশ্চর্য্য হয়েছি দেখে কত প্রগাঢ় তাঁর পাণ্ডিত্য? উপনিষদ মেঘদূত কুমারসম্ভব শকুন্তলার বিশেষ বিশেষ অংশ তিনি অনায়াসে অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। রবীন্দ্র কাব্যের প্রায় সমগ্র কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সেক্সপীয়ার মিলটন থেকে **Appropriate Passage.** মুখস্থ বলতে তাঁর আটকাতো না।

রবীন্দ্র পাঠচক্র এবং বেঙ্গল এডাল্ট এডুকেশন এ্যাসোসিয়েসনএর তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা এবং কর্ম্মী। একবার রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি উদ-যাপনে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে পাঠ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

বাজে কথা বলে গল্প করে সময় নষ্ট করার লোক তিনি ছিলেন না। তিনি বুঝতেন কেবল কাজ, আর কাজের কথা, আর কাজের অনুপ্রেরণা দেয়া। কতবার তিনি বলেছেন—কত কাজ যে পড়ে রয়েছে—একটা জীবনে কতটা করে যেতে পারবো জানি না।

যারা তাঁকে জানবার সুযোগ পায় নি তারা সুকুমার বাবুর কথা শুনে তাঁকে খামখেয়ালী বলে আখ্যাও দিয়েছে এমন কথাও শুনেছি। ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট চাকরীর কষ্টকর অধ্যায় শেষ করে যখন সবে উচ্চপদ ও অধিক বেতনে ইন-স্পেক্টার জেনারল অব রেজিষ্ট্রেশানের পদে আরোহন করেছেন, এমন সময় কবিগুরুর ইচ্ছায় নিজের সম্মান ও আর্থিক প্রচুর ক্ষতি তুচ্ছ করে বোলপুরে শ্রীনিকেতনের ভার গ্রহণ করেন।

কবিগুরু তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন আর সুকুমার বাবুরও কবির প্রতি অকৃত্রিম গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ঐ ষ্টুডেন্টস্ হলেই শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে একটি গল্প তাঁর কাছে শুনেছি। এখানে সেটা বলছি তার থেকেই বোঝা যাবে কি দুরন্ত কাজের লোক তিনি ছিলেন।

শ্রীনিকেতনের ভার পেয়েই কবির কল্পনাকে সার্থক করে তুলতে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হয়ে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। আর তাঁর ইচ্ছা ছিল সহকর্মিরাও প্রত্যেকেই তাঁরই মত উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন। কিন্তু সংসারে সকলেই সুকুমার বাবু নন। তাঁরা গিয়ে গুরুদেবের কাছে নালিশ করেন যে তাঁদের বিশ্রামের সময়টুকু দিতেও সুকুমার বাবু অনিচ্ছুক। তিনি নিজেও যেমন শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন তাঁর ইচ্ছা অন্যরাও তাই করেন।

গুরুদেব সব শুনে একদিন সুকুমার বাবুর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে শ্রীনিকেতনের এত শীঘ্র কত আশাতীত উন্নতি হয়েছে সে কথা বলে তাঁর কাজের বহু প্রশংসা করে বলেন "তবুও আমার বড় সৌভাগ্য সুকুমার যে তোমার অধীনে আমায় চাকুরী করতে হয় না।"

সকল জনহিতকর কাজেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। নোয়াখালি যখন বিধ্বস্ত তখন অশক্ত শরীরেও সুকুমার বাবু স্থির থাকতে পারেন নি, হিন্দু-মহাসভার পক্ষে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়ে তিনি অনেক কাজই করেছিলেন।

সুকুমার বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা চলে, তবে কতটুকুই বা আমি জানি আর কতটুকুই বা তাঁকে আমি চিনতাম। শেষ কথা এই বলতে চাই যে দেশকে উন্নতির পথে, গৌরবের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অক্লান্ত পরিশ্রম জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি করে গিয়েছেন। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন

তাঁকে জানবার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই তাঁর সাক্ষ্য দেবেন। সে-'বন্দে'র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন সুকুমার বাবুর দেশভক্তি তাদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল বলে আমি মনে করি না। দেশের উন্নতি কল্পে গঠনমূলক পরিকল্পনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত ও লক্ষ্য এ বিষয়ে তাঁর দান কতখানি সে বিচার আজ করবো না তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর চরিত্র তাঁর সাধনা, তাঁর কাজের চাইতে অনেক বড

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"

'৭৪ ত্রিকদালিয়া প্লেস (অধ্যাপক) গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৺সপ্তমী পূজা

দেশের দরদী সুকুমার

সুকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কলেজে। সে আমার চেয়ে বয়সে দু তিন বছরের ছোট ছিল ও সেই হিসেবে নীচে পড়তো, কিন্তু সকলের সঙ্গে মেশবার তার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তার মনের ভেতরকার আনন্দ স্ফূর্ত্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো এমনভাবে যে আমরা আকৃষ্ট হতায় তার দিকে। কলেজ ছাড়বার পর অনেকদিন আর আমাদের দেখাশোনা হয় নি। আমি চাকরি পেয়ে পূর্ব বাঙ্গলায় চলে গেলাম, সে তখনো এম্, এ, পাশ করেনি। সে ১৯০৬ সালের কথা। বাংলা দেশকে কার্জন তখন ভেঙ্গে দু টুকরো করেছেন। দেশময় অশান্তি। বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করা অপরাধ। চারিদিকে অত্যাচার দলে দলে দেশের নেতারা ও তাঁদের সঙ্গে তরুণ তরুণীরা জেলে যাচ্ছে। পুলিশের লাঠি ও গুলি, জেলখানার দেওয়ালের অন্তরালে অমানুষিক নির্য্যাতন, বাংলার তরুণ মনকে উন্মত্ত করে তুললো। তারা 'বিদ্রোহের প্রকাশ্য পথ ছেড়ে দিয়ে তাদের কাজ আরম্ভ করলো ষড়যন্ত্রের অন্ধকার গুহায়। কয়েক বছর ধরে চল্‌লো বাঙ্গালীর সঙ্গে ইংরাজের শক্তি পরীক্ষা। এই যুদ্ধে প্রাণ দিল যারা তাদের রক্ততর্পণ সফল হোলো রাজসিংহাসনকে টলিয়ে। বাংলা দেশ আবার এক হ'লো। আমি তখন আসাম থেকে বাংলায় ফিরে এলাম। সুকুমারও সেই সময় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তারপরও অনেক বছর দূর থেকেই পরস্পরের খবর পেতাম আমরা বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে। আমাদের যাযাবর জীবনে আমরা আবার একত্র হলাম যশোহর জেলায়। সুকুমার বনগাঁয়ে মহকুমার ভার পেয়ে এল, আমি সদরে সাব-ডিভিসনাল অফিসার। জেলা বোর্ডের সভায় যখন সুকুমার আসতো তখন সে তার ছোট্টো মেয়ে পুষ্পকে সঙ্গে এনে আমার একমাত্র মেয়ে প্রতিমার সঙ্গে খেলা করবার জন্য

রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে চলে যেতো। আমার স্ত্রী তখন বেঁচে ছিলেন। তিনি এই দুইটি মেয়েকে নিয়ে সারাদিন বড় আনন্দে কাটাতেন। পুষ্প ছিল ফুলের মতোই সুন্দর। তার স্বভাব ছিল বড় মিষ্টি। একটি শাদা বেরাল ছিল তারও প্রতিমার খেলার সাথী। এই মূক প্রাণীটিকে নিয়ে ওদের যে স্নেহবন্ধন গড়ে উঠেছিল আজও তা ছেঁড়ে নি। আরো একটি সুন্দর ছোট মেয়ে আসতো আমাদের বাড়ীতে এই বেরালটিকে নিয়ে খেলা করবার জন্য। সে যশোরের সবজজ জগদীশ বাবুর মেয়ে গৌরী। অনেক বছর পরে গৌরীর সঙ্গে দেখা হল কলকাতায়। সে তখন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সুকুমার সেন মহাশয়ের পত্নী। গৌরী প্রথম দেখার দিনই আমাকে প্রশ্ন করেছিল, "আচ্ছা, প্রতিমার সেই শাদা বেরালটা আছে?"

এই সময়ে সুকুমারের সঙ্গে আমার গভীর আন্তরিক যোগ ও বোঝাপড়া হয়। বিদেশী সরকারের চাকরি করে দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায় কিনা এই সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হ'তো। দেশসেবা কেবল মুখের কথায় নয় কিন্তু বিচার শাসনকার্য্যের মধ্য দিয়ে কি করে সম্ভব করা যায় তাই নিয়ে আমরা কতদিন তর্ক করেছি তা এখনো মনে পড়ে। সুকুমার ছিল আদর্শবাদী; সে যে সব স্বপ্ন দেখতো দেশ সম্বন্ধে তার কতটুকু তার জীবনে সে বাস্তব হতে দেখেছে তা জানি না, কিন্তু একথা আমার জানা আছে যে সে তার সমস্ত আত্মনিয়োগ করতো দেশের কাজে। আমরা দুজনেই স্থির করে ছিলাম যে চাকরিকে দাসত্ব বলে স্বীকার করব না। এজন্য উপরওয়ালারা অসন্তুষ্ট হতেন। কাজের ত্রুটি না হলেও আমাদের ব্যবহারে তাঁরা একান্ত দাসমনোভাবের পরিচয় না পেয়ে ক্ষুন্ন হতেন। এর জন্য আমাদের ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু সুকুমার বলতো, "যতিন, চাকরি জীবনে আমরা যে আত্মপ্রসাদ পেয়েছি তা ক'জন পায়, তাই কি আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার নয়?"

বিচারের কাজে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে কখনো আদেশ কিম্বা অনুরোধ আমরা পাইনি; কেবল একবার একজন বাঙ্গালী আই, সি, এস, কর্ম্মচারী আমাকে বিচার করে অপরাধীকে কি দণ্ড দিতে হবে তা বলেছিলেন। তার উত্তরে আমি তাঁকে বলি, "আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। যখন আপনি আমার মত প্রৌঢ় হবেন তখন বুঝবেন আপনি কতদূর অন্যায় করেছেন। আপনার অনুরোধ রাখতে আমি অসমর্থ।"

বহু বৎসর ছাড়াছাড়ির পরে আবার আমরা বদলি হয়ে যশোরে এলাম ১৯৩৫ সালের শেষে। অনেক বছর আগে আমাদের চেষ্টায় সহরে "পূর্ণিমা সম্মিলন" হোতো। সে বারে দেখলাম এই সাহিত্য বাসরের অবস্থা শোচনীয়। ক্লাবে তাদের আড্ডা জমে কিন্তু বাংলা সাহিত্য চর্চ্চা মাসে একটি দিনের জন্যও করবার সময় নেই কারো। কয়েকটি উৎসাহী তরুণ ও যশোরের খ্যাতনামা

আসরও জমাতেন। সবেরই একটা মাত্রা আছে, আমাদের মধ্যে অনেকেই সেটা ছাড়িয়ে গেছি, তাঁকে কোনদিন সেরকম করতে দেখিনি। হাসিমুখে তর্ক করতে দেখেছি, ঝগড়া সে ত খেলারই একটা অঙ্গ, মতান্তর কখনও মনান্তরে পর্য্যবসিত হয় নি। সব চাইতে চোখে পড়ত তাঁর সততা, সেটা বুদ্ধিবৃত্তিরই হোক্ কিম্বা সাধারণ্ সামাজিক ব্যবহারের দিক দিয়েই হোক্। আমরা তখন বালক ছাড়া আর কি? তিনিও তাই, কিন্তু বালকোচিত কৌতুক মনে করে অন্যায় ব্যবহার করলে তিনি তখনই সেটা শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন সমধর্ম্মী বন্ধুর মত, উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত গুরুমহাশয়ের মত নয়।

তারপর লেখাপড়া শেষ করে আমরা যে যার কর্ম্মক্ষেত্রে চলে যাই, তাঁর সঙ্গে দেখাশুনাও বিশেষ হ'ত না, কার্য্যগতিকে কলিকাতায় কখনও কখনও দেখা হ'ত। তিনি তখন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। সেই একই ভাবে, সেই আগেকারই মত। আমি ত কখনও মনে করতে পারতুম না তাঁর বয়স কিছু মাত্র বেড়েছে। অথচ তাঁর কর্ম্মকুশলতার কথা কত লোকের মুখে শুনেছি তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন সকলেরই মুখে তাঁর প্রশংসা আমাদের কত আনন্দই দিয়েছে।

তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'ত। প্রথম যখন দেখা হয়, তার কয়েক বৎসর আগে থেকে আমি কলিকাতাবাসী হয়ে পড়েছিলাম। তিনি সে সময় কর্ত্তব্যানুরোধে রাজকর্ম্মের সম্মানিত উচ্চপদ ছেড়ে দিয়ে, বিনা বেতনে কেবলমাত্র সামান্যভাবে জীবনযাপনের ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করে শ্রীনিকেতনের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। অর্থের দিক দিয়ে তাঁর প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু কোনদিন একে তিনি স্বার্থত্যাগ বলতে রাজী হননি। দেশের কাজ, তা নিভৃতে হোক্, সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপিত না হোক, সত্য সত্যই ত সে দেশের কাজ। তা ছাড়া তিনি যে মহাপুরুষকে সকলের চাইতে বেশী সম্মান করতেন, তাঁর সেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পন্থা তিনি সশ্রদ্ধভাবে অবলম্বন করতে পেরেছেন, এতে ওসব কথা কি করে ওঠে? এই ছিল তাঁর মনের ভাব, এতেই সত্যকার মানুষটিকে চেনা সহজ হইয়া ওঠে।

নানাকারণে সেখান থেকে কয়েক বৎসর পরে তাঁকে চলে আসতে হয়। কিছুদিন ভাটপাড়ায়, পরে কলিকাতাতেই তিনি থাকতেন। নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ও মানুষের ওরকম হয়ে থাকবার জো কি! এখানে ওখানে নানাস্থানে কার্য্যব্যপদেশে গেছেন, সর্ব্বদাই মনের মধ্যে চিন্তা, দেশের লোকের উপকার কি করে হয়। যারা নিতান্ত গরীব, অক্ষম, যাদের দিকে চাওয়াটাও সকলে বাহুল্য মনে করে, তাদের কথাই তিনি সর্ব্বদা ভাবতেন এবং রোগশয্যা গ্রহণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁর সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাদেরি

সুখ সুবিধা বিধানের জন্ত। যৌবনের উৎসাহ বৃদ্ধবয়সেও তাঁর অটুট ছিল, তিনি যে এত শীঘ্র মহাপ্রয়াণ করবেন আমি ত কখনও ভেবে উঠতে পারতাম না।

তাঁর সম্বন্ধে লিখতে বসে একটি কথা আজ বারম্বার মনে পড়ছে। গীতার একটি শ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই শ্লোক তাঁর মুখে আমি কতবার শুনেছি।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥

আমার মনে হয়, তাঁর জীবনের আদর্শ তিনি ঐ শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যে পেয়েছিলেন। আর পেয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, যার প্রতি রচনায় ঐ ভাবের রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ তাঁর মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হ'ত।

৭, বি মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট শ্রীযতিনাথ ঘোষ

আমাদের সুকুমারদা

সুকুমার দাদাকে আমি খুব ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে এলাহাবাদে দেখেছি মনে পড়ছে। তখন খুবই ছোট ছিলাম, ঠিক কত বড় বলতে পারব না এতকাল পরে। তাঁর খুব উজ্জ্বল চোখ ছিল আর তিনি দেখতে বেশ লম্বা ছিলেন এইটুকু মনে আসছে। আমাদের বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলেন, আমাদের সঙ্গে অনর্গল গল্প করতেন, কিন্তু কিসের গল্প তা আজকাল আর কিছু মনে নেই।

বড় হয়ে কলকাতায় আসবার পর দূর থেকে দুই একবার মাত্র তাঁকে দেখেছি। তবে তিনি যে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এ গল্প প্রায়ই শুনতাম। আমার বিশনদাদা সুকুমার দাদাকে খুব ভালবাসতেন এবং প্রায়ই তাঁর গল্প করতেন। সে সব ছাত্রজীবনের গল্প।

বাবার কাছেও সুকুমারদার উচ্চ প্রশংসা শুনতাম। বাবা বলেছিলেন, "সুকুমার রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাও মুখস্থ বলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত তিনি।" তারপর একদিন শুনলাম গবর্ণমেণ্টের কাজ অকালে ছেড়ে তিনি বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দিয়েছেন। শুনে আনন্দ ও গর্ব্ব হয়েছিল। বাবা ত খুবই খুসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসবে আমরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। সেখানে সুকুমার দাদার সঙ্গে আমাদের পরিচয়

করিয়ে দেওয়া হল। তিনি সজোরে হেসে বললেন, "আমার বোনদের সঙ্গে আমাদেরই পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে ?"

তারপর এল বোমাবর্ষণের যুগ। কলকাতা শুদ্ধ লোক তখন ভয়ে বাইরে পালাচ্ছে। আমি আমার মেয়েদের শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠিয়ে দিলাম। শুনলাম সেখানে মেয়েদের দুধ দেওয়া হয় না। তাই বাবাকে বললাম, "সুকুমার দাদা ত সুরুলে থাকেন। তাঁকে লিখলে আমার মেয়েদের কি একটু দুধের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না ?" লেখবামাত্র তিনি সুরুল থেকে সাইকেলে দুধ পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজে একদিন শ্রীভবনে এসে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা দুধ নিয়মিত পাচ্ছ ত ? দুধে সর পড়ে ত ?" এর অল্পদিন পরেই তিনি শান্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে দেন। তখন বাবা বলেছিলেন আমাকে, "বিশ্বভারতী একজন বড ও ভাল কর্মী হারাল। সুকুমারকে রাখতে পারলে বিশ্বভারতীর মঙ্গল হত।"

বাবা বাঁকুড়া সম্মিলনীর ও মেডিকাল স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে আমার বাড়ীতে ছিলেন তখন মেডিক্যাল স্কুলের কি সব বিশৃঙ্খলার কথা শুনে তাঁর মন চঞ্চল হয়। তিনি আমাকে বললেন, "আমার নাম দিয়ে সুকুমারকে একটা পোষ্টকার্ড লেখ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে।" অপরের হস্তাক্ষরে বাবার চিঠি পেয়ে সুকুমার দাদা পত্র পাঠ বাবাকে দেখতে এলেন এবং বাঁকুডার সব কাজের ভার নিলেন। বাবার মৃত্যুর পরও তিনি বার দুই আমার বাডীতে এসেছিলেন। আমার মেয়েদের বলেছিলেন, "বাঁকুড়া বড় দরিদ্র দেশ। যদি দেশের কাজ করতে চাও, তাহলে বাঁকুড়াতে তোমার দাদামশায়ের দেশে কাজ কোরো। অনেক কাজ করবার আছে।"

মনে হচ্ছে বাবার কাছে শুনেছি সুকুমার দাদা পুরামাত্রায় rationalist ছিলেন। মনের দিকে সংস্কারকও ছিলেন অনেকটা। তিনি নিজের অসুস্থ বোনের জন্য খুব চিন্তা করতেন তার পরিচয়ও তাঁর কথায় পেয়েছি। জীবনে দুঃখকষ্ট তিনি পেয়েছেন, কিন্তু তাতে তিনি দমতেন না। কাজেই তাঁর আনন্দ ছিল।

পি ২৭ রাজা বসন্ত রায় রোড শ্রীশান্তা দেবী

শ্রদ্ধেয় সুকুমার

মনে পড়ে দীর্ঘ সতেজ পদক্ষেপ—সুকুমার বাবুর অসুস্থ চেহারা মনে পড়ে না। এত শীঘ্র তাঁর কর্ম্মবহুল জীবন শেষ করে তিনি চলে যাবেন ভাবিনি। শ্রীনিকেতনের কার্য্যভার তিনি যখন গ্রহণ করেন তখনই প্রথম

তাঁর যথার্থ পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এমন যে অনেকে অবাক হত সে বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে। কিন্তু তাঁর চেয়েও বিস্ময়কর মনে হয়েছে তাঁর যুবজনোচিত উৎসাহ ও বিশ্বাস দেখে। সুকুমার বাবু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন গুরুদেবের সেই বাণী ও সাধনায় যেগুলি আমাদের গ্রামের জীবন নূতন করে গড়ে তুলতে আমাদের মূল প্রেরণা জুগিয়েছে। গ্রামবাসীদের নিরন্ন নিরানন্দ জীবন সচ্ছল ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে সুকুমার বাবুর কী উৎসাহ ও আনন্দ! আহার নিদ্রা ভুলে তিনি সে কাজে ডুবে যেতেন। তাঁর মত কর্ম্মীকে স্বাধীন ভারত বেশীদিন পেল না সে এক দুর্ভাগ্য। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে এ সব বিষয় অনেক আলাপ আলোচনা হতে শুনেছি। নিকট আত্মীয় বলে সুকুমার বাবুর কৃতিত্বর বিষয়ে প্রবাসীতে তিনি কিছু লিখে যান নি। কিন্তু সুকুমার বাবুকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। বাঁকুড়া সম্মিলনীর পক্ষ থেকে রামানন্দ স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে স্থায়ী কিছু করা উচিৎ সেটি সুকুমারবাবু অনুভব করতেন এবং সেজন্য কিছু চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু ক্রমশ শরীর খারাপ হওয়ায় কাজটা এগিয়ে দিতে পারেন নি! সম্মিলনীর পক্ষ থেকে বাঁকুড়াবাসী কেউ সুকুমার বাবুর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করলে আমরা সুখী হব। তাঁর কন্যার চেষ্টায় ছোট একটি শ্রদ্ধাঞ্জলী ছাপার আয়োজন হয়েছে জেনে সুকুমার বাবুর স্মৃতিতে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

পি ২৬ রাজা বসন্ত রায় রোড — শ্রীকালীদাস নাগ

রবীন্দ্রনাথের সুকুমার

শান্তি নিকেতন

কল্যানীয়াসু

তোমার ইচ্ছামত সুকুমার বাবুর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিলাম। চিঠিতে সুকুমার বাবুকে শ্রদ্ধাস্পদেসু লিখিতাম সেজন্য তিনি বিরক্ত হইতেন বলিতেন আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা ফরমালিটির চৌকাঠ পার হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশের মত হইয়াছে কাজেই প্রিয় সুকুমার বাবু লেখাই বাঞ্ছনীয়। তাঁহার এইরূপ অনুরোধ সত্ত্বেও এবং তাঁহার সহিত সমবয়সী বন্ধুর (যদিও তিনি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় ছিলেন) মত বিচিত্র প্রসঙ্গ লইয়া হাস্য পরিহাস করা সত্ত্বেও পত্রে বরাবর শ্রদ্ধাস্পদেসুই লিখিয়াছি কচিৎ প্রীতি ভাজনেসু লিখিয়া থাকিতে পারি কিন্তু তাহা আমার মনে পড়ে না।

সুকুমার বাবু সুশিক্ষিত ছিলেন। বিচিত্র শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এবং জ্ঞান জগতের অন্যান্য বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াও তাঁহার স্বভাববৈশিষ্ট বদলায় নাই। তিনি ছিলেন একাধারে বস্তুতান্ত্রিক রাজ্যে কর্মী হাকিম হিসেবে ছিলেন বিচারক। কিন্তু হাকিমী করা কিম্বা শুষ্ক কর্ত্তব্য পালন করা তাঁহার স্বধর্ম ছিলনা। তিনি ছিলেন সত্যিকার স্কলার এবং সত্যিকার আদর্শবাদী। আদর্শবাদী ছিলেন বলিয়া নিজের ঘাড বাঁচাইযা অর্থাৎ নিজের ব্যবহারিক জগতে স্বার্থ বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেন না। তিনি দীর্ঘদিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু উপরওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেটদের অসঙ্গত হুকুমকে তিনি সহজে পালন করিতেন না। স্বাধীনচেতা ছিলেন তিনি। সে স্বাধীনতা তাঁহার ছিল মর্য্যাদার ও শালীনতার উচ্চধাপের। হালফ্যাশানী উচ্ছৃঙ্খলতাময় নিম্নস্তরের স্বাধীনতার ভাবকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি প্রগতির দুর্গতির পথে চলার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুয়ানীর অগতি মার্কা জড়ত্বকেও ঘৃণা করিতেন। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত মার্জ্জিত রুচির হিন্দু ব্রাহ্মণ। ছিলনা সে হিন্দুত্ব শ্যাওলা ভরা অন্ধ দীর্ঘিকার মতন। তিনি ছিলেন দরদী সরল প্রাণ মানুষ এইজন্য অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি তাঁহাব দরদের ভাণ্ডাব লুঠ করিয়াছে। আর তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন বলিয়াই পরের কাছে শোনা অসত্য সংবাদ শুনিয়া তাহা সাময়িক রূপে বিশ্বাস করিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ বন্ধুর প্রতি বিরুদ্ধতা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তিনি সরল ছিলেন বলিযাই কাহারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা ঝাঁজ মনের মধ্যে বেশিদিনের জন্য পোষণ করিবার ক্ষমতা তাঁগার ছিল না। বহুক্ষেত্রে বহুবার দেখিয়াছি তিনি সরলভাবে নিজের ভুল ত্রুটী স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন তাঁহাদের কাছে যাহাদের প্রতি সাময়িক ভাবে রুষ্ট হইতেন পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া।

হাঁসি পাইত যখন সুকুমার বাবু কাহাকেও উদ্দেশ্য করিরা বলিতেন "ও লোকটা বেজায় খামখেয়ালী থেকে থেকে কাজের প্রোগ্রাম বদলায়।" সুকুমার বাবু নিজে বেশ খামখেয়ালী ছিলেন সেজন্য সহকর্মীদের সহিত তাঁহার মাঝে মাঝে অনৈক্য ঘটিত। কিন্তু তিনি সরল ছিলেন বলিয়াই যাহা তাঁর কানের ভেতর দিয়া মরমে পশিত সে গুলিকে নির্ব্বিচারে শেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। মনের মধ্যে যে ন্যায় পরায়ণ আদর্শবাদী হাকিমটি চিরজাগ্রত ছিল সেই হাকিমের নিঃস্বার্থ বিচারে অনেককেই তিনি মনের অবাঞ্ছনীয় কক্ষের বন্দী শালা হইতে নিষ্কৃতি দিতেন।

বস্তুতান্ত্রিক জগতে সংসারী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সাংসারিকতার অনেক ছোটখাট অবাঞ্ছনীয়তার সহিত সংশ্রব করিতে হইয়া-

ছিল টাকা রোজগারও করিতে হইয়াছিল এবং তাহা স্ত্রীপুত্রকন্যাদের জন্য জমাইতেও হইয়াছিল। কিন্তু এ সবই তিনি করিতেন সমাজ অন্তর্গত গৃহী-রূপে কিন্তু স্বভাবটা ছিল আধা সন্ন্যাসী গোছের। কাজ করিবার, একটা কিছু অর্গানাইজ করিবার ক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল অসাধারণ কিন্তু তাঁর ভিতরে ফলকামনাবিহীন যে আইডিয়াল মানুষটি ধামা চাপা ছিল সেই মানুষটি তাঁহাকে কোনো এক জায়গায় শান্তিতে বেশী দিন থাকিতে দেয় নাই।

সরকারি চাকুরী হইতে দীর্ঘ মেয়াদী ছুটি লইয়া (একেবারে চাকুরী ছাড়িবারই মতলব করিয়াছিলেন) তিনি রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্ব ভারতীর গ্রাম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে (মাত্র মাসিক একশত টাকা পারিশ্রমিকে) যোগ দিলেন সরকারি মোটা বেতনের উচ্চাকাঙ্খাকে একপাশে ঠেলিয়া দিয়া। আর্থিক কারণে বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রীর বিশেষ আপত্তি ছিল। সেজন্য তিনি কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন যাহাতে রবীন্দ্রনাথ সুকুমার বাবুর বিশ্বভারতীতে যোগদানের আগ্রহকে উৎসাহিত না করেন।

সুকুমার বাবুর স্ত্রীর নিকট সব কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যধিক বিচলিত হইয়া উঠিলেন বলিলেন বিশ্ব ভারতীর ক্ষতি হয় হোক এ রকম করে স্ত্রী পুত্র কন্যাদের আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে সুকুমার আমার জন্যে শ্রীনিকেতনে (বিশ্বভারতীর পল্লী উন্নয়ন বিভাগ) আসবে এটা আমি হতে দেব না। তাকে যদি শ্রীনিকেতনে আসার জন্য এরপরও উৎসাহিত করি ওর স্ত্রীপুত্র কন্যাদের প্রতি আমার তরফ থেকে অবিচার করা হবে। তুই সুকুমারকে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য খবর দে।

সুকুমার বাবু রবীন্দ্রনাথকে অনেক বাদানুবাদের পর বলিয়াছিলেন "আপনি বিচলিত হবেন না পরিবারের জন্য কর্ত্তব্য তো করেইছি, নিজের মনের খোরাক যোগাইনি, সেটা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন। যখন স্থির করেছি তখন যোগ দেবই। যদি পরে ভালো না লাগে চলে আসব কিন্তু এখন এ সংকল্পকে বজায় রাখতে দিন।" রবীন্দ্রনাথ দো-মনা হয়ে সুকুমার বাবুর সংকল্পকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

উপরওয়ালা সুকুমার

দেবপ্রতিম সুকুমার বাবুর জীবনীতে আমায় কিছু লেখার জন্য নির্দেশ এসেছে। আমি ছিলুম তাঁর নগণ্য কেরাণীদের মধ্যে একজন। কিন্তু তাঁর কাছে পেয়েছিলুম পিতৃস্নেহ যা জগতে সত্য সত্যই বড় দুর্লভ।

কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। সেজন্য তাঁর কাছে অনেক সময় পেয়েছি অনেক কঠিন শাসন। যে শাসন মায়ে করে সন্তানকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যেগো। যারা তাঁর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন থেকেছে তারাই খবর জানতো তাঁর এই দরদভরা মনের। শুধু তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের নয় তাদের পরিবারবর্গের দায়িত্ব পর্য্যন্ত তিনি সেধে নিতেন। অনেককে তার ঐ দরদ ভরা মনের সুযোগ নিতে দেখেছি। যাতে তাঁর মনে বয়ে যেত করুণার প্লাবন।

একটী ঘটনার কথা বলি তখন সুকুমার বাবু এ্যাসিটেন্ট রেজিষ্ট্রার। হঠাৎ খবর এল তিনি মালদহ ইনস্পেকশনে আসছেন কর্ম্মপরিষদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল যে কাজ কিছু হয়নি এখন কি করা যায়? নানা পরামর্শের শেষে একজন প্রৌঢ় কর্ম্মচারী বললেন কিছু ভাবনা নেই আমি চ্যাটার্জ্জী সাহেবকে সামলাব তোমরা শুধু দাড়িটা দুদিন কামিও না আর মাথায় তেলমাখাটা বন্ধ কর। সবাইতো অবাক এ আবার কি রসিকতা?

এসে পড়লো তাঁর আসার দিন। সবাই ষ্টেশানে যেতে ব্যগ্র সকলকে থামিয়ে সেই উপরোক্ত কর্ম্মচারী একাই যাবেন ষ্টেশানে ঠিক করেছিলেন কি ভেবে শেষে আমায় নিলেন। শীতের ভোর ট্রেণ থামবার আগেই লাফিয়ে নামলেন সুকুমারবাবু। কে বলবে যে বয়স চল্লিশের কোঠায়। পূর্ণ উৎসাহ দীপ্ত চেহারা—ভীষণ খুসী আমাদের দেখে। সেই প্রৌঢ় কর্ম্মচারীটীর কাঁধে হাত দিয়ে গল্প আরম্ভ করলেন যেন পুরনো বন্ধু বা নিকট আত্মীয়।

খানিকক্ষণ অনর্গল চললো নানা প্রশ্ন। চাষের অবস্থা কেমন আরো কি কি ফসল হওয়া উচিৎ। এতো জমি পতিত রয়েছে কেন? ইত্যাদি। তারপর হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে বললেন তোমার শরীর তো ভালো দেখছি না হে? অসুখ-বিসুখ করেনি ত? ভদ্রলোক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হল তাঁর মালদহর ম্যালেরিয়ার কল্পিত কাহিনী—ব্যস কথার মোড় গেল ঘুরে। থমকে দাঁড়িয়ে চ্যাটার্জ্জী সাহেব বললেন তা তোমরা ছুটি নাও না কেন? তার উত্তরে উক্ত কর্ম্মচারীটি সবিনয়ে জানালো নগণ্য কেরাণী জীবনের যা প্রাত্যহিক ঘটনা। সামান্য আয়

প্রকাণ্ড ফ্যামিলী স্যার আধা মাহিনায় ছুটি নোয়া কি করে সম্ভব হবে? বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত গভীর থমথমে হয়ে উঠলো সেই প্রশান্ত মুখ। অত্যন্ত চিন্তাকুল স্বরে বললেন ভয়ানক ম্যালেরিয়ার জায়গা দেখছি এই মালদহ—এর একটা রীতিমত ব্যবস্থা দরকার। এভাবে চলা অসম্ভব।

তখন প্রৌঢ় কর্ম্মচারীটি সবিনয়ে জানালো কাজকর্ম্ম কিছুই রেডি নেই স্যার অথচ আপনি এসে পড়লেন ইত্যাদি। ষ্টেশান থেকে ইনস্পেকসান বাংলোয় যাবার আগেই ঠিক হয়ে গেল যে এবার ইনস্পেকসান হবে না। কিছুদিন বাদে আবার তিনি আসবেন। তবে সেবার ও শুধু শুধু ফিরলেন না। নানা-ভাবে চেষ্টা হল যাতে কর্ম্মচারীদের সুলভে ভালো ব্যবস্থা হয় চিকিৎসার এবং অসুখে তারা পুরো মাইনেয় ছুটি পায়।

ঐ প্রৌঢ় কর্ম্মচারীটি হিন্দু। তাঁর মুখে গল্প শুনলুম সুকুমার বাবুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় বাঁকুড়ায়। তখন সেখানে সুকুমার বাবু সদর সবডিভিসনাল অফিসার। বিশেষ গুরুতর অপরাধে একজন কেরাণীকে তিনি সাসপেণ্ড করেন। ঐ সময় একদিন ডেকে পাঠালেন আমায়। তাঁদের ঘটকপাড়ার বাড়ীর সদর বৈঠকখানায় বসে তিনি কাজ কর্চ্ছেন—পরণে তসরের ধুতি পায়ে খড়ম বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জল অগ্নিশিখার মত চেহারা। আমায় বসতে বলে কাজ করতে লাগলেন পরে সবাই চলে গেলে আমায় বললেন—"তুমি জানো কি? * * বাবুকে আমায় সাসপেণ্ড করতে হয়েছে। বিচারক হিসেবে আমি তা করতে বাধ্য। তিনি কঠিন রোগে পড়েছেন তাঁকে তুমি গোপনে জানিয়ে এস যতদিন তিনি সুস্থ না হবেন আমি তাঁর চিকিৎসার ও সংসারের সকলব্যয়ভার বহন কর্ব্ব। কত আন্দাজ তাঁর লাগবে তুমি মোটামুটি জেনে এস—আচ্ছা এই চেকটা উপস্থিত নিয়েই যাও বলে তখুনি একটা চেক কেটে আমার হাতে দিয়ে বললেন আচ্ছা অলরাইট"। টাকাটা দিতে গিয়ে শুনলুম তার আগেই সুকুমার বাবু নিজে গিয়ে সেই রোগ শয্যায় শায়িত বিপন্ন ভদ্রলোকটিকে দেখে ও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এসেছেন। টাকাটি শুধু আমায় দিয়ে দোয়ালেন নিজে হাতে না দিয়ে।

নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি সদাশয়তার আর দুটি গল্প আমি নিজে জানি—সে তাঁর জীবন সায়াহ্নের ঘটনা তখন বোধহয় তিনি ডেপুটী কমিশনার ডেভেলা-পমেণ্ট বিভাগের। তাঁর বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে তখন থাকেন। আমি ও আর একটি ষ্টেনোগ্রাফার তাঁর কাছে কাজ করতুম। সে লোকটি ছিল খুব দুর্ব্বল অসুস্থ, কাজ যত করতো কাসতো তার চেয়ে বেশী আর রায় বাহাদুরের ধমকে সত্যি সত্যি কেঁপে উঠতো। কাজে সুকুমার বাবুর ছিল গভীর নিষ্ঠা ও অনুরাগ। সেবার তখন রায়বাহাদুরের কদিনধরে চলছে জ্বর ব্রঙ্কাইটিস

অফিস যেতে পারছেন না তত কাজের ঝোঁক চাপছে বেশী আমরা থাকতে থাকতেই এলেন ডাক্তার। অপাঙ্গে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন— "এত পরিশ্রম ঠিক হচ্ছেনা। এ বয়েসে এতটা ব্লাডপ্রেসার, ব্রঙ্কাইটিস জ্বরটাও চলছে,ফুলরেষ্ট চাই আপনার অন্ততঃ দুচারটে দিন।" ডাক্তার চলে গেলেন কাজ চললোই যেমন চলছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে ? আমরা বিদায় নেবার জন্য উঠতেই রায়বাহাদুর বললেন অলরাইট তোমরা সকাল সকাল কাল এসো! তাঁর অসুখের কথা স্মরণ করেই আমি বললুম "কালতো স্যার রবিবার"—তিনি প্রচণ্ড ধমকে বলে উঠলেন "ওসব রবিবার টবিবার আমার কাছে নেই আমিও কাজ কর্ব্ব তোমাদেরও কাজ করতে হবে।" এমন সময় গেটে ঢুকলো প্রকাণ্ড এক মটোর নেমে এলেন দুটি মহিলা একজন আমাদের রায়বাহাদুরের মেয়ে অপর জন নিলীমাদেবী (মিসেস ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জ্জী) আমি অবিশ্যি এটা পরে জেনেছি। আমরা বারান্দায় বেরিয়ে এলুম শুনলুম ঘরের ভেতর কথা হচ্ছে নিলীমাদেবী বললেন কাকে অত বকছেন বাবা আপনি? রায়বাহাদুর বল্লেন রোববার বলে ওরা কাজ করতে চায় না। হেঁসে নিলীমা দেবী বল্লেন তাতো চাইবেইনা ওদের কত কাজ সেদিন ? রায়বাহাদুর আরো যেন বিরক্ত কণ্ঠে বল্লেন কি কাজ ? নিলীমা দেবী বল্লেন বা-রে ওদের তো পাঁচটা চাকর নেই ঐদিনে সব অপিসের জামাকাপড় কেচে পরিষ্কার করবে, বাড়ীতে যার অসুখ তার ওষুধ আনবে। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের জন্যে যাবে উলুবেড়ে ট্রেনে ষ্টীমারে ওদের তো আর মটোর নেই ? হঠাৎ যেন আগুণে জল পড়লো খুব অপ্রতিভ স্বরে রায় বাহাদুর বল্লেন আচ্ছা তোমরা ভেতরে যাও আমি যাচ্ছি। ওঁরা অন্দরে চলে গেলেন। রায়বাহাদুর বাইরে এসে বল্লেন—একি ? তোমরা এখনও ঠাণ্ডায় বসে আছ ? যাও যাও, আচ্ছা কাল তোমাদের আসতে হবেনা পারলে সন্ধ্যে বেলা একবার ঘুরে যেও, অলরাইট। মনে মনে ভদ্র মহিলাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমরা তো ফিরলুম।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার গেছি তাঁর কাছে। শুনলুম তাঁর মেয়ে ও নাতজামাই, যিনি ডাক্তার, তাঁরা এসেছেন তাঁকে দেখতে। বাইরে থেকেই রায়বাহাদুরের গলা শুনলুম মেয়েকে বকছেন। কি এমন হয়েছে আমার যে রোজ তোমায় দেখতে আসতে হবে। আমার গরম কোটটা তুমি আটকে রেখেছ কেন ? দেবে ? না, দেবেনা ? আমার দু দুটো গরম কোট থাকবে অথচ আর একজন কষ্ট পাবে শীতে একি ব্যবস্থা তোমার ? ওটা তুমি না দিলে আমায় এই সুটের কোটটাই দিয়ে দিতে হবে। দেখব তখন তুমি আমায় কোট দাও কিনা ? কোটটা আলমারিতে তোলা থাকবে আর ও বেচারার নিমোনিয়া হবে ? এর উত্তরে তাঁর মেয়ে কি বললেন শুনতে পেলুম না। ওঁর মেয়ে ও নাতজামাই চলে গেলেন। তাদের মটোর বোধহয় তখনও গেট

থেকে বেরোয়নি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রায় বাহাদুর. বারন্দায় সেই রোগা ষ্টেনোগ্রাফারটির হাতে নিজের সেই বহুমূল্য সুটের কোটটি দিয়ে বললেন আচ্ছা তোমরা যাও এখন এই কোটটা তুমি ব্যবহার করো যখন দরকার থাকবে না আমায় দিয়ে যেও। আমিতো স্তম্ভিত। বলা বাহুল্য অপরের ব্যবহার করা কোট তিনি আর পরবেনও না এবং সেই দরিদ্র ষ্টেনোগ্রাফার এর পক্ষেও ও গরম কোটটি কখনো অপ্রয়োজনীয় হবেনা। তাঁর দান ছিল এমনি। দানের মধ্যে ছিলনা অহঙ্কারের স্পর্শ।

সেই পুন্যময় মহাত্মাকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

এস, আহম্মদ

পিতৃ প্রতিম সুকুমার

ছোট কাজে বাবার* আশ্চর্য্য রকম উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে আমার ভয়ানক ভাললা লাগতো। ওইটে দেখেই অনেক লোক বলাবলি করতো ওঁর একটু মাথা খারাপ আছে। এখন বুঝি যে কোন ছোট কাজ হোক মাথা খারাপের মতন করে পাগলের মত করে সবের সত্তা ভুলে সেই কাজটা নিয়ে পড়ে না থাকলে কোন কাজই সাধিত হয় না। অনেক নামকরা বড় বড় লোক দেখি যাঁরা বিখ্যাত কর্ম্মী বলেই এত কাজে হাত দিয়েছেন (ঠিক করে বলতে হলে নাম দিয়েছেন) যে ফলে কোন কাজই তাঁদের হয় না। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে তাতে তাদেব কিছু আসে যায় ও না।

কিন্তু এইখানেই বাবা ছিলেন অন্য রকম। কারণ উনি যে কাজটা হাতে নিতেন পৃথিবী ভুলে, চান খাওয়া ছুটির বার সব উড়িয়ে সেই কাজটার একটা হেস্ত নেস্ত না করে ছাড়তেন না। জগত ওলট পালট হয়ে গেলেও ওঁকে ওঁর লক্ষ্য থেকে কেউ তিল মাত্র সরাতে পারতো না।

আমি মনে মনে খুব তৃপ্তি লাভ করতুম যখন উনি আমার কাছে আসতেন বা যখনই কোথাও দেখা হোত, কারণ জানতুম যে বেশ অকপটে এবার উনি আমার সঙ্গে ওঁর কোন একটা কাজ নিয়ে আলোচনা কোরবেন। ওঁর মতন খাঁটি মানুষ যার মধ্যে তিলমাত্র খাদ নেই, সেই মানুষ যে আমার মত সামান্য একজন সাধারণ মেয়ের কাছে কোন পরামর্শর জন্য আসবেন এই কথাটাই আমায়

---

* রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও কতটা ভালোবাসলে যে মানুষ অনাত্মীয়কে বাবা বলে ডাকতে পারে নীলার বাবা ডাক তার আন্তরিকতার একটা প্রকৃষ্ট প্রমান।

যথেষ্ট গর্ব্ব আর তৃপ্তি মনে এনে দিত। একদিন সকালে হঠাৎ আমাদের ধাত্রী এলেন মুখ শুকনো উস্কখুস্কো চুল (চুল ওঁর সব সময়ই এলো মেলো থাকতো ঠিক যেন মনের ভেতরকার চিন্তার ঝোড়ো হাওয়া ওঁর মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে) বল্লেন দেখোতো বাঁকুড়ার এই হাঁসপাতালের ব্যাপারটায় কি করা যায়? আমি মনে মনে ভাবলুম বাঁকুড়াতো অনেকদিন ছেড়ে এসেছেন। এত কাজের মধ্যেও সেখানকার কথানিয়ে আবার ঝঞ্ঝাট বাড়ানো কেন? কিন্তু বাবার তো সে প্রকৃতি ছিলনা, যে যেখান থেকে চলে এসেছেন সেখানকার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলবেন? উনি যেখানে গেছেন বা যার সঙ্গে মিশতেন তাদেরকে নিজের অস্থি মজ্জায় গেঁথে ফেলতেন চিরকালের মতন। সেই হাঁসপাতালের জন্যে দিন কতক খুব উঠে পড়ে লাগলুম আমরা।

বাবার মনে দুঃস্থদের জন্যে খুব বড় একটা অংশ রিজার্ভ ছিল। শীতের সময় ওঁর মনে হল কি করে গরীব দুঃখীদের জন্য সস্তা সোয়েটার করা যায়। আমায় বল্লেন পাট রঙ্গিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নরম করে সোযেটার বোনালে আড়াই টাকা কি তিনটাকা করে বেশ ভাল জিনিষ তৈরী হবে। জুট রিসার্চ্চ ইনস্টিটিউট থেকে নডার সায়েবের কাছ থেকে খোঁজ নেওয়া হোল রঙ্গীন সরু সরু পাটের দড়ী এলো। উলের জামার বোনাইর চেয়ে অনেক বেশী খরচ বাবার পড়লো বখশীশ দিতে যারা পাটের জামা বুনলো তাদের। তাতেও বাবা দমবার লোক নয়।

উনি মহা উৎসাহে সেই জামা ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দিলেন। যে এতে যদি গভর্ণমেণ্ট এই ধরণের জামা তৈরীর সাহায্য করেন। কিন্তু আমাদের গভর্ণমেণ্ট সময় অভাবে এবং পাছে নতুন কাজে হাত দিলে টাকা লোকসান হয় সেকারণে বাবার মতন উৎসাহ দেখাতে পারলেন না। বাবার মতন ওঁরা নিজেদের শক্তিতে যেন আস্থা রাখেন না বলে মনে হোল।

আজ স্বাধীন ভারতে বাবার মতন উৎসাহী শক্তিমান ও নিজের কাজে বিশ্বাসী লোক যে কত দরকার তা যে কোন কাজে হাত দিলেই বুঝতে পারি। তাঁর পরোলোকগত আত্মাকে আমার মনের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আজ আসি—।

The Hooghly Bank Ltd
42 Chowranghee Road

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

খেতাবধারী সুকুমার

শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় অনেক আগে থেকে থাকলেও প্রকৃত অন্তরঙ্গতা আসে বোধহয় আঠারো বৎসর আগে। পাবনায়। সমবায়ের ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর জন্য কিছু করতে পার্ব্ব এ আশা তখনও আমার ছিল। তাই সুকুমারবাবুকে অবলম্বন করে ধরেছিলাম। বাঁকুড়ায় গুরুজী (স্বর্গত শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত) পল্লীউন্নয়নের কাজ যেটুকু করতে পেরেছিলেন সুকুমার বাবুর সহকারিতা তার জন্য কতখানি দায়ী তার কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম। বয়সের অনেকখানি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমার আহ্বানে সুকুমারবাবু সানন্দে আমাকেও সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। নানা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ আমাকে নিতে হয়েছে ও তা থেকে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বহু উপকার পেয়েছি। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, মনের স্থিতি স্থাপকতা, দেশবাসীর উপর বিশ্বাস, নির্ভীক ভাবে নিজ মতামত প্রকাশ—ইত্যাদি গুণের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠলেন। তাঁকে কেবল সরকারী কর্ম্মচারী বা ডবল খেতাব ধারী দববারী বলে কখনও মনে করতে পারিনি। তবে অনেক সময়েই মনে হয়েছে তিনি পাওয়াতে বা নেওয়াতে সরকারী খেতাবই সম্মানিত হয়েছে ও সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত থেকে তিনি সেই চাকরিকেই লোকের চোখে সম্মানিত করেছেন। তাঁকে মনে হত নিছক দেশসেবক যেমন শ্রীনিকেতনে কালীবাবু বা আমাদের গুরুজী ছিলেন। তাই যখন তিনি সরকারের বহু সম্মান ও দায়িত্বপূর্ণ চাকরি ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শ্রীনিকেতনের কর্ম্ম-সচিব হয়ে যোগ দিলেন তখন আমি একটুও বিস্মিত হইনি। ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। শ্রীনিকতনে গিয়ে তিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কাজ করার সুযোগ অনেক অবশ্য বেশীই পেয়েছিলেন যা তখন সরকারি চাকুরীতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা খানিকটা এখানে ফলপ্রসূ হতে পারলো।

নয় বৎসর আগে আমি যখন নিজ জন্মস্থান হুগলীতে সরকারি কাজে ছিলাম তখন আবার সুকুমার বাবুর শরণাপন্ন হই প্রাপ্ত বয়স্কদের অক্ষর পরিচয় থেকে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে। তিনিও তৎক্ষণাৎ তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ ও সাহায্য অকুণ্ঠ হয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। আশা আবার হল যে এবার হয়ত আমার পল্লীবাসী নিরক্ষর ভাইদের মানুষ করবার কাজ কতকটা অগ্রসর হবে। কিন্তু বিধাতা বাম। তাহল না। প্রথম জার্মানি ও তারপর জাপান ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন—এবং স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক ভারতবর্ষকেও সেই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ

অবলম্বন করতে হল! যুদ্ধের ঢেউএর পর ঢেউ ক্রমে আমাদের উপর পড়তে আরম্ভ করলো। তার সঙ্গে এল পঞ্চাশের মন্বন্তর।

সুকুমার বাবু সে সময় ভাটপাড়ায় পৌর কর্তৃপক্ষের স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর সহানুভূতি ও সাহায্যে ভাটপাড়ার অনেকগুলি নিরন্ন সেবার বেঁচে গেছলেন। কিন্তু ভাট পাড়ার কাজ তাঁর ভালো লাগছিল না। নানা ব্যাপারে তাঁর হাত পা বাঁধা ছিল। আমি বহুবার চেষ্টা করি তাঁর প্রতিভা ও কর্মশক্তির উপযুক্ত কোনও কাজে লাগিয়ে দিতে। কিন্তু প্রতিবারই বিফল হতে হয়। কারণ শাসন ক্ষমতা তখন একটি সম্প্রদায় বিশেষের মুষ্টিমেয় জন কয়েক তথাকথিত নেতার হাতে। যারা নিজেরা দেশের ভালমন্দের প্রতি সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ। কোনও মতে নিজেদেব প্রভুত্ব বজায় রাখতেই তাঁদের সব প্রচেষ্টা ফুরিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া বিদেশী শাসনের যুদ্ধকালীন নাগপাশ তখন আমাদের ধীরে ধীরে শ্বাসরোধ ক'রে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু তাতেও সুকুমার বাবুর অদম্য কর্মোৎসাহ কিছু মাত্র ব্যাহত হয়নি। সেই অবস্থারই মধ্যে তিনি তদানীন্তন রাজস্ব বিভাগে সেচের পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধারেব কাজের ভাব নিয়ে অস্থাযী উপসচিব রূপে যোগ দিলেন। সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেখানে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। উপর থেকে সহানুভূতি বা উৎসাহ আর নিচের থেকে সহকারিতা তিনি কিছুই পেলেন না। নানা কারণে তাঁর জীবনের সায়াহ্নকাল অশান্তি ও হতাশার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। যাই হোক এখন তিনি অনন্ত পথের যাত্রী হয়ে চলে গেছেন। যদি তিনি কখনও ফিরে আসেন তাহলে আবার তাঁব এই সাধের বাঙ্গালা মাব কোলেই তিনি আসবেন। স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবেন।

তিনি ফিরে আসুন আর নাই আসুন, প্রার্থনা করি তাঁর দেশ সেবার আদর্শ, তাঁর অদম্য কর্মোৎসাহ, তাঁর নির্ভীক জীবন যাপন, তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, যেন আমাদের মধ্যে চির জাগরূক থাকে। তাতেই হবে তাঁর জীবনের সার্থকতা।

এস, এম, ব্যানার্জী, আই, সি, এস, — শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
মেম্বার বোর্ড অফ রেভিনিউ

দুঃখে মহত্তর সুকুমার

প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৯০১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত সুকুমার আর আমি একসঙ্গে পড়েছি। বরাবরই ছাত্র হিসাবে সে খুব ভালো, এবং তার মিষ্টি

স্বভাব ও অন্তরঙ্গ ব্যবহারের দরুণ সকলের কাছে সে ছিল প্রিয়। তার সঙ্গে আমার আলাপ অল্পদিনের মধ্যেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সবরকম অবস্থার মধ্যেই তাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। কর্মী হিসেবে সে কখনো হার মানতে জানতো না। চাকুরে হিসেবে তার বিবেক ছিল অত্যন্ত সজাগ। চাকরি সংক্রান্ত কাজের চাপ খুব বেশী হওয়া সত্বেও আমরা যাকে মানবতার সেবা বলি তার জন্যে সুকুমার অন্তত কিছুটা সময় বরাবরই বাঁচাতে পারতো।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসামান্য এবং শেষের দিকে রবীন্দ্র নাথের কবিতার প্রতি এই অনুরাগ রীতিমত আসক্তিতে পরিণত হয়। সব রকম বিষয় সম্বন্ধেই সুকুমার আলোচনা করতে পারতো—তার আলোচনা অত্যন্ত সহজ তবু হালকা ধরণের নয়। এবং যে কোন বিষয় সম্বন্ধেই সে কথা বলুকনা কেন বিষয়টির ওপর নূতন আলোক পাত হত। তার স্বভাব ছিল গুরুত্বভাব পূর্ণ এবং সব কিছুই সে গ্রহণ করতো অকপট ব্যগ্রভাবে। সুখের সময় সুকুমার ছিল মহৎ কিন্তু দুঃখের সময় মহত্তর।

অত্যন্ত বেশী বিপদের বোঝাও তাকে সহজ ও নিস্পৃহভাবে বহন করতে দেখেছি। কোনো অবস্থার মধ্যেই তার মনের সাম্য বিচ্যুত হত না এবং জীবনের যেসব দুর্যোগের মুখোমুখী সে হয়েছিল সেই সব দুর্যোগের দরুণ একবারও সে তার উপস্থিত বুদ্ধি হারায়নি বা তার বিচার শক্তি অবশ হয়নি। বিপদ একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য মনে হলেও হার মানেনি সে। তার নিষ্ঠা, আদর্শের প্রতি অটুট উৎসাহ, অনিবার্য্যর সামনে তার নিস্পৃহতা—এই সব গুণের দরুণ যারই সংস্পর্শে সে এসেছে তাকেই মুগ্ধ করেছে।

তার মতো মহৎ লোকের সম্পর্কে আসা জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা নয়। তার মৃত্যুতে বাংলা দেশ একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান হারালো।

১৪ পার্শিবাগান। **গিরিন্দ্র শেখর বসু**

নিষ্কামকর্ম্মী সুকুমার

ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'Victorian age'—অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়া যুগ—তাহারই মধ্যে আমাদের বাংলা দেশে নব জীবনের সাড়া আসে। আমাদের দেশের জাগরণের যে সকল পথপ্রদর্শক এই প্রদেশকে এবং তাহার পর সমস্ত ভারতকে, প্রগতির অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলেই এই যুগের লোক। বস্তুতঃ পক্ষে ঐ সময়েই এদেশে বিদেশী

শিক্ষার সারাংশ গৃহীত হওয়ার ফলে স্বদেশী ও বিদেশী সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অপরূপ মিশ্রণ হয়। দেশ প্রেম দেশের প্রগতির চেষ্টা এবং মানবত্বের মূলনীতির অনুযায়ী জাতিকে উন্নতির প্রেরণা দান এ সবই ঐযুগের লোকেই করিয়াছেন। এবং যদিও আজ আমরা রাষ্ট্রনীতির মাদকের নেশায় বিভোর হইয়া সে সকল লোকের প্রয়াস ও কীর্ত্তির কথা ভুলিতে বসিয়াছি. এমন কি দলাদলির মোহে ও নিজের স্বার্থের চিন্তায় তাঁহাদের হেয়জ্ঞান করিতেও কুণ্ঠিত হই না, তবুও একথা সকলেরই জানা প্রয়োজন যে আজ আমরা যে স্বাতন্ত্র লাভ করিয়া জগতের সভায় স্থান লাভ করিয়াছি তাহার উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন ঐসকল আদর্শবাদি, খ্যাত ও অখ্যাত ও অজ্ঞাত, মনিষী বর্গের দ্বারাই হইয়াছিল। তাঁহাদের আদর্শবাদ হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও মানবত্বে নিষ্ঠা আমাদের নাই বলিয়াই দেশের প্রগতির পথে এতো বাধা দেখা যাইতেছে। জাতীয়তাবাদ বা দেশসেবা তাঁদের পেশা ছিল না। তাহা ছিল ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই অসংখ্য বাধা বিপত্তি ও হতাশার কারণের মধ্য দিয়াও তাঁহারা আদর্শের পথে দেশবাসীকে লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রযত্নে দেশ যতটা দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল তাহার পর দেশের অগ্রগতি আর সেরূপ হয় নাই ইহা এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতেছেন। আজ দেশে আদর্শবাদ সঙ্কুচিত, ন্যায়নিষ্ঠা অবহেলিত, ভোগ লালসায় ও স্বার্থ চিন্তায় জাতীয় জীবন কলুষিত, ইহার প্রধান কারণ দেশে স্বার্থশূন্য কর্ম্মীর অভাব। নেতৃত্বের লোভে রাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সহজ পথের পথিক চতুর্দ্দিকেই দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাদের দৃষ্টান্তে কর্ম্মীদল উৎসাহিত হইতেছে না বা প্রেরণা পাইতেছে না। তাহার কারণ ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই প্রকৃত ত্যাগের নিদর্শন ও দেশের মঙ্গলসাধনে অক্লান্ত প্রয়াসের পরিচয় অল্পই পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব যুগের আদর্শের স্বরূপ এখন লুপ্তপ্রায় নূতন যুগের আদর্শের প্রকাশ এখনো দেশে হয় নাই।

সুকুমার দাদা ছিলেন ঐ পূর্ব্ব যুগের আদর্শবাদী—তাঁহাদের সময় ছাত্র-জীবনের আদর্শে উদ্দামভাবের বা উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান ছিল অতি নীচে সুতরাং তখনই তাঁহার জীবনে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের স্থাপনা সুদৃঢ় হয়। স্কুল কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দান করে তাহা মেধাবী ছাত্র রূপে তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সে শিক্ষায় তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা মিটে নাই বা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সঙ্কুচিত হয় নাই। জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত রূপে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে প্রবেশ করেন তাঁহাদের অধিকাংশই, অন্ততঃ আমাদের দেশে, সেই উপার্জ্জনের পথ নির্দ্দিষ্ট হইলেই কেবলমাত্র তাহার উপরেই লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের অন্য সকল চিন্তার বা

বিচারের বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া 'থাকেন; যাহার' ফলে তাঁহাদের ছাত্রজীবনের অর্জিত সকল শিক্ষাই অচিরে লোপ পায়। সুকুমার দাদার ছাত্রজীবন ব্যর্থ হয় নাই কেননা তিনি শিক্ষার পথে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বিচার বুদ্ধি এবং জ্ঞানচক্ষুর জ্যোতি প্রসার লাভ করে। সেই জন্যই কর্ম্মজীবনে তিনি আয়াস সাধ্য কর্ত্তব্যের পথ ছাড়িয়া চাটুকার বৃত্তিতে সহজ লভ্য উন্নতির চেষ্টায় ফিরেন নাই। তাঁহার আদর্শবাদে ঘটিরাম ডিপুটীর স্থান ছিল না বলিয়াই তাঁহার কর্ম্মজীবন চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্গে শেষ হয় নাই। বরঞ্চ দেশের উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতির কার্য্যে সম্যক্ ভাবে নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে নিয়োগ করিবার জন্য তিনি, নিজের বিশেষ আথিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া, যথা সময়ের পূর্ব্বেই চাকুরী হইতে বিদায় লইয়া দেশের উন্নয়ন কার্য্যে দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়া গেলেন। তাঁহাব আশা ছিল যে চাকুরীর বাঁধাধরা কার্যের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলে তিনি তাঁহার আদর্শের অনুযায়ী সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবেন। ছাত্রজীবনের পরিণতির সময় রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভার জ্যোতিতে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রকরণের সংবাদ রাখিতেন। সুতরাং চাকুরী জীবনের শ্রান্তি ক্লান্তি, সংসারের অশেষ বাধা বিঘ্ন—যাহা তাঁহাকে নিয়তই বিব্রত করিত—এইসকল হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টায় অবসব গ্রহণ না করিয়া তিনি পরিণত বয়সে কর্ম্মজীবনের এক নূতন অধ্যায খুলিতে অতি আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইলেন:

দুঃখেব বিষয় তিনি নিজে অতিশয় কর্ত্তব্যপরায়া ছিলেন বলিয়াই অন্যের কর্ত্তব্যচ্যুতি দেখিলে জ্বলিয়া উঠিতেন। নিজে কর্ম্মতৎপর ছিলেন বলিয়াই অন্যের আলস্য দেখিতে পারিতেন না। তাহার পর নিজে স্পষ্টবক্তা ও সরল পথের যাত্রী ছিলেন বলিয়া অন্যের চক্রান্ত বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার মত উৎসাহী কর্ম্মী কার্য্যাধ্যক্ষ হওয়ায় শ্রীনিকেতনের অকর্ম্মণ্য ও অলস বলীবর্দ্দ সমাজে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাহারা কাতর ভাবে, সত্য মিথ্যা মিশাইয়া, যথাস্থানে করুণ প্রার্থনা নিবেদন করিয়া জয়লাভ করিল। সুকুমার দাদাকেও, পূর্ব্বের অনেক উৎসাহী কর্ম্মীর ন্যায়, শ্রীনিকেতন হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপ ঘটনার কারণ তিনি শেষ পর্য্যন্ত জানিতেন না; কেন না রবীন্দ্রনাথ রূপ বিশাল মহীরুহের ছায়ায় যে কিরূপ আগাছা ও পরগাছা জন্মিয়াছে এবং কি প্রকার অপদার্থ জীব সকল আশ্রয় লইয়াছে তাহা তাঁহার জ্ঞাত ছিল না।

এইরূপ বিফল প্রয়াস হওয়া সত্ত্বেও যে সুকুমার দাদার মনে কোন গ্লানি আসে নাই, বা তাঁহার আদর্শবাদ ক্ষুন্ন হয় নাই, ইহাই তাঁহার মনোবৃত্তির ও চরিত্রের

মহত্ত্বের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটুট ছিল শেষদিন পর্য্যন্ত। গুরুদেবের নামে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মারকবৃত্তি ও পারিতোষিক দানের জন্য প্রথম যে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় যাহার প্রথম অধিবেশন হয় নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে, তাহার আয়োজন ও ব্যবস্থার আরম্ভ হয় সুকুমারদাদারই উদ্যোগে। তিনি কোন দিনই নিজের নামযশের জন্য উদগ্রীব ছিলেন না সুতরাং সংবাদ পত্রের স্তম্ভে তাঁহার নাম জাহির হয় নাই।

শ্রীনিকেতন ছাড়িয়া তিনি আরও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে সময়, তখন মহাযুদ্ধের দুন্দুভি বাজিল। যুদ্ধের সময় নানাদিকে নানা সময়ে সরকারি ও বেসরকারি কাজে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত। উপরন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে সুরু করে। কিন্তু সকল কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট, শারীরিক অস্বস্তি ও সাংসারিক প্রচুর অশান্তি, কোন কিছুতেই তাঁহাকে দেশের মঙ্গল চিন্তা ভুলিতে দেয় নাই বা সে কাজের জন্য সামর্থের সীমা পর্য্যন্ত প্রয়াসে বিমুখ করে নাই।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা আমাদের বাঁকুড়া। খাদ্যের অভাবে, প্লাবন ও অজন্মার প্রকোপে, বাঁকুড়ার প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে শেষ হইতে চলিয়াছে। বাঁকুড়ায় মুসলমান মাত্র শতকরা ৪জন, সুতরাং ইংরাজ শাসনের "সুয়োরাণী দুয়োরাণী" ব্যাবস্থায় ঐ জেলা সরকারী সাহায্য বা উন্নয়ন চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। অন্যদিকে বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে স্থিত। সুতরাং কংগ্রেসের পূর্ব্ববঙ্গবাসী ধুরন্ধরগণ ইহাকে একদিকে অবহেলা অন্যদিকে তাঁহাদের দলগত কুটনীতির ভুক্তভোগী করিয়াছেন; উপরন্তু বাঁকুড়া বাসীর মধ্যেও বাঙ্গালীর মজ্জাগত দোষ দলাদলি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এমত অবস্থায় বাঁকুড়া জেলায় দেশহিতকারী কোনও কাজের চেষ্টা করা যে কি বিষম কষ্টকর ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝা যায়।

প্রতি পদে নানা বাধা, অর্থের অনটন, সাধারণের মনে দারিদ্র জনিত হতাশা, এইসকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়া এই ধ্বংসপ্রায় জেলার উন্নয়ন এরূপ দুঃসাধ্য ব্রত যে তাহাতে সুস্থ ও সবল যুবকেরও দেহমনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। সুকুমারদাদা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বাঁকুড়া ও বাঁকুড়াবাসীর, দারিদ্রের অবসান ও অবস্থার উন্নতির জন্য আপ্রাণচেষ্টিত ছিলেন। শেষের দিকে তাঁহার স্বাস্থ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মনেও অশান্তির কারণ যথেষ্ট ছিল, তখনও দৈহিক গ্লানি ও মানসিক অবসাদ কোন কিছুই তাঁহার এ ব্রতের অবসান ঘটাইতে পারে নাই সেইদিন পর্য্যন্ত, যেদিন কালের নিদারুণ আঘাতে তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। তিনি কায়মনোপ্রাণে দেশের কল্যাণ কামনা করিতেন এবং তাঁহার সে দেশপ্রেম ছিল নিষ্কাম। ধনমানযশের জন্য চেষ্টিত হইলে তিনি তাহা যথেষ্ট অর্জ্জন করিতে পারিতেন কিন্তু সেদিকে তিনি দৃকপাতও

করেন নাই। কারণ তাঁহার আদর্শবাদ ছিল নির্ম্মল ও উদার, স্বার্থ চিন্তার স্থান তাহাতে ছিল না।

বাঁকুড়া তাহার এই তেজস্বী, নিঃস্বার্থ সুসন্তানকে অকালে হারাইয়া বিষম ক্ষতিগ্রস্থ হইল। কেননা বাঁকুড়ার দুর্ভাগ্য এই, যে তাহার যাহা যায় তেমনটী আর ফিরিয়া আসে না।

৭।১লাউডন ষ্ট্রীট্। শ্রীকেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়

মনীষী সুকুমার

প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে আমার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয় বাঁকুড়া সহরে। সেখানে পৌঁছিবার ২।৩ দিন পরেই স্থানীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আমাব সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনুসন্ধান করিযা আমি জানিতে পারিলাম যে আমার বাঁকুড়া পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে একজন রাজ কর্ম্মচারী সে সব প্রতিষ্ঠানকে প্রাণ-বন্ত করিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম সে রাজ কর্ম্মচারিটীব নাম সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। তখনও আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। তখন শুধু শুনিলাম্ তিনি অদম্য কর্ম্মশক্তির অধিকারী এবং দেশের প্রতি তাঁহার দরদ গভীর ও অকৃত্তিম। মনে মনে তাঁহাকে আমার প্রণতি জানাইলাম এবং তাঁহার পরিচয় লাভের জন্য আমার একান্ত বাসনা জন্মিল। আমার সে বাসনা পূর্ণ হইতে খুব বেশী দিন লাগে নাই। পরে বহুক্ষেত্রে বহুবিধ কর্ম্মে তাঁহার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার হইযাছে। এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্য শব্দটির ব্যবহার অতিশয়োক্তি নহে, কারণ তাঁহার ভিতর এমন কিছু ছিল যাহা সচরাচর বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা যায় না। বয়সে তিনি আমার চেয়ে অনেক বড ছিলেন কিন্তু তাঁহার অনলস কর্ম্মশক্তি দেখিয়া আমাকে সর্ব্বদা লজ্জিত হইতে হইত। বিরামহীন বিশ্রামহীন ছিল সে কর্ম্মশক্তি প্রৌঢ় বয়সেও তাহা অটুট ছিল। তাঁর আর একটি বিশেষত্ব ছিল, সেটী দেশের প্রতি খাঁটি ভালোবাসা। যারা দীনদরিদ্র যারা অশিক্ষিত ও মূক তাদের জন্য তাঁর কি টান কি তাঁর দরদ তা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভালোভাবেই বুঝিতে পারিতেন। কিসে তাদের মঙ্গল হয় কিসে তারা মানুষ হয় এ চিন্তা অহরহ তাঁহাকে একরকম পাগল করিয়া রাখিত। এদের জন্য তিনি দারিদ্র বরণে ও কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীনিকেতনে কর্ম্মীরূপে ইনি এদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীনিকেতনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আজোও তাঁরা সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করেন। রবীন্দ্র নাথের সান্নিধ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের তিনি ছিলেন একজন বড় সমঝদার। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁর স্মৃতি শক্তি ছিল অসাধারণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। রবীন্দ্র-

নাথের তিরোধানের পর তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলিয়া ছিলেন তাহা All India Rabindra Memorial fundএ দেওয়া হইয়াছে।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আজও তাঁর কথা মনে করিলে মন বেদনায় পূর্ণ হইয়া যায়। যাঁরা তাঁকে ভালোভাবে জানতেন তারাই বুঝতে পারেন এ বেদনা কিসের জন্য। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে একথা যে শুধু তাঁহার বন্ধুবর্গই বুঝিতে পারেন তা নয়,.তিনি যে যে স্থানে কাজ করিয়াছেন সেখানকার সাধারণ লোকেরাও তা বুঝতে পারে। এরকম দরদী বন্ধু তাহাদের যে শীঘ্র জুটিবে না তা তারা বেশ ভালোভাবেই জানে।

তাঁহার সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই লিখিতে পারিতাম কারণ তাঁহার স্মৃতি আমার কাছে অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার বিশাল ব্যক্তিত্ব জলন্ত উৎসাহ অপূর্ব্ব মনীষা সুগভীর দেশপ্রেম ও অপরিসীম কর্ম্মশক্তি আজও আমাকে অভিভূত করে এবং আমরণ তা করিবে।

B. K. Guho. I. C. S. শ্রীব্রজকান্ত গুহ

121 Rash Behari Avenue.

"ইমপালসিভ সুকুমার"

গত ১০।১২ বৎসর সুকুমার বাবুর সঙ্গে মেলা মেশা চলাফেরা করবার সময় বহু উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটেছে যার বিবৃতি সম্ভবপর নয়। আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করি প্রায়ই কথায় ও বক্তৃতায়-কিন্তু কাজে প্রতিবাদ জানানোটা একটু বিরল। এবিষয়ে সুকুমার বাবু ছিলেন বেশ একটু অসহিষ্ণু কিন্তু তাঁর নির্ভিকতা ও সৎসাহস সত্যই প্রশংসনীয়। দুটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতে চাই।

১৯৪১ সালের প্রথম ভাগে সুকুমার বাবু ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা তখন সত্যই শোচনীয়। কার্য্যভার গ্রহণ করে দিবারাত্র পরিশ্রমকরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে সমর্থ হন।

মে মাসে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাই। ঠিক তখন তিনি নিকটস্থ জুটমিলে যাবার উদ্যোগ করেছেন। আমাকেও গাড়ীতে তুলে নিলেন। শুনলাম তিনি কুলিদের ট্র্যানজিট ক্যাম্পে যাচ্ছেন। অর্থাৎ পালা অনুসারে শত শত কুলিদের দেশে যেতে দেওয়া হয় আর তার সব বন্দোবস্ত মিল কর্ত্তৃপক্ষই

করেন। জনৈক মিল প্রাঙ্গনে প্রায় একহাজার কুলি একত্রিত হয়েছে তাদের থাকবার ও খাবার সব ব্যবস্থা করেছেন সেই মিল কর্তৃপক্ষগণ। সব ব্যবস্থা ঠিক মত হচ্ছে কিনা পরিদর্শন কর্বেন আমাদের রায় বাহাদুর। গাড়ী থেকে নেমে আমরা মিল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলাম, দেখলাম একটা চট বিছিয়ে তার উপর প্রচুর চিঁড়ে রাখা হ'য়েছে আর ৫।৬টি খোলা মাটির গামলায় ১০।১৫ সের গুড়ও সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গামলাগুলিতে যে গুড় আছে তা বোঝবার উপায় নেই কারণ প্রত্যেকটীতে মাছির একটা পুরু পরদা প'ড়েছে—তার মধ্যে কতক জীবিত বাকী মৃত। স্বকুমারবাবু মিল-এর ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। লালমূর্তি মোটাসোটা মধ্যবয়সী একটি ইংরাজ পুঙ্গব এসে উপস্থিত হ'লেন—বেশ একটু হাসতে হাসতে। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল :—

"you are the Manager of this mill ?"

"yes sir"

"Are you going to feed these people with this stuff ?"

(গুড় দেখিয়ে)

"yes sir, after all they are coolies · they are used to such food. They eat such stuff from the Bazzar."

আর যাবে কোথায়! ব্রহ্মরন্ধ্র বোধহয় টগবগিয়ে ফুটতে আরম্ভ করল !!

"yes they are coolies—not men, they are just cats and dogs to you .... "

বলতে বলতে তিনি পা দিয়ে গামলাগুলি উল্টিয়ে ফেলতে লাগলেন! আমিও প্রমাদ গুণলাম, ভাবলাম এখুনি একটা হাতাহাতি হয়ে যাবে !! কিন্তু সুখের বিষয় তা হ'ল না। ম্যানেজার সাহেব অবাক হ'য়ে ওই দৃশ্য দেখে আস্তে আস্তে স'রে প'ড়লেন। ঘটনাটি এখানেই শেষ নয়। ম্যানেজার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিফোন ক'রলেন বোধহয় এই মর্মে :—"পাগল একজিকিউটিভ্ অফিসারকে এখুনি সরাও"—কারণ পরের দিন তলব এল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে। শুনেছি সেখানে উপস্থিত হ'য়ে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এমন একটি সারগর্ভ উপদেশ দিলেন যে ফলে তার পরের দিন ম্যানেজার সাহেবকে স্বকুমার বাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে আসতে হ'ল আর,আর-একবার তাঁকে সেই মিল প্রাঙ্গনে খাদ্য বণ্টনের সুব্যবস্থার নমুনা দেখবার জন্য যেতে হ'ল! সেবার অবশ্য আমি সঙ্গে ছিলাম না।

দ্বিতীয় ঘটনা বছর দুই পরে, ১৯৪৪ সালে। আমরা দুজন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি—সিনেমাগুলির কাছাকাছি। চা খাবার ইচ্ছা হল। স্বকুমার বাবু চায়ের দোকানে ব'সে চা খেতে বিশেষ রাজি না হ'লেও ঢুকলেন। সামনে একটা উঁচু ডেস্কের ওপর কয়েকটা জার' এ কেক-বিস্কুট প্রভৃতি রাখা হ'য়েছে

আর একটি কেকের জারের মধ্যে খুচরো পয়সা ফেলা হচ্ছে—তাতে ৫।৬টি কেক ও আছে। সেই জার থেকে 'চেঞ্জ' দেওয়া হচ্ছে। বহুলোক চা খাচ্ছে—ব'সে ও দাঁড়িয়ে। সুকুমারবাবু দু-দুবার প্রতিবাদ জানালেন, বল্লেন—"পয়সা আনি প্রভৃতি মোটেই পবিত্র নয়। এমন কি কুষ্ঠ রোগীরাও এসব নিয়ে নাড়া-চাড়া করে...।" কোন ফল হ'ল না। দোকানের মালিক ও ব্যস্ত কর্ম্মচারীরা কেহই তার প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপ করল না বরং একজন একটু মুচকিয়ে হাসল। সুকুমারবাবু সোজা সেই জারটী তুলে নিয়ে বাইরে এসে ফুটপাতে কেক্ ও 'চেঞ্জ' উপুড় করে ঢেলে ফেল্লেন ও জারটি মাটিতেই রেখে দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এই কাণ্ড ঘটবে আমি তা ভাবতেও পারিনি। বেশ একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল কিন্তু দেখা গেল আগন্তুকদের মধ্যে পনের-আনা লোক তাঁর কাজের অনুমোদন করছে। টাকা-পয়সা ও জারটি দোকানদার এসে তুলে নিয়ে গেল কিন্তু নিক্ষিপ্ত কেক্গুলি স্পর্শ করবার সাহস আর তার হ'ল না!

আমার চায়ের পিপাসা মিটে গেল—শুধু তখনকার জন্যে নয় কিন্তু ভবিষ্যতেও—অর্থাৎ যখন পথে-ঘাটে তাঁর সঙ্গে কোথাও যেতে হ'য়েছে।

Rev. B. C. Mukherji বিলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
1-1 College Square.

—*—

সব্যসাচী সুকুমার

মানবহিত ব্রতে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। এই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁর জীবনের শেষ চার বৎসর। সরকারী কর্ম্ম থেকে অবসর প্রাপ্ত জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। বলা বাহুল্য সরকারি কর্ম্মজীবনে ব্রিটীশ আমলাতান্ত্রিক শাসন যন্ত্রের অংশ বিশেষ হয়েও আমলা তন্ত্রের সংগে তাঁর মতের মিল ছিল না কোন দিনই। তিনি ওদের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ কারণ দেশের প্রকৃত উন্নতি ও দেশের জন্য দরদ দিয়ে প্রকৃত কাজ তিনি চাইতেনও করতেনও। Red-tapism তিনি নিজে কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। আমার মনে হয় সরকারি কাজে যোগ না দিতে হলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দেশহিত ব্রতী বলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মধ্যে যে অফুরন্ত উৎসাহ, অদম্য কর্ম্মপ্রেরণা ও অপরকে প্রেরণা দেবার শক্তি বর্ত্তমান ছিল তা সাধারণে একান্ত দূর্লভ।

আমার সঙ্গে এই মহান ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা হয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গবেষণায়

ব্যাপার নিয়ে, কলকাতায় রবীন্দ্র পাঠচক্র (Tagore study circle) প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের একটা বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ছিল তাঁর মনের নিত্য সহচর। মনে পড়ে রবীন্দ্র পাঠচক্রের প্রতিটি অধিবেশনকে যথার্থ ভাল করবার জন্য তাঁর কি ঐকান্তিক চেষ্টা। তিনি নিজে কি রকম উৎসাহের সঙ্গে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ থেকে সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন। কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সম্পর্ক এই অনুরাগী ব্যক্তি কি রকম গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাকে রূপ দেওয়ার জন্য উৎসবানুষ্ঠান করে, সভা আহ্বান করে গবেষণা বৃত্তি দিয়ে, তাঁর অনুভূত সত্যকে সার্থক করার চেষ্টা করেছিলেন তা রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুরাগীগণ অবশ্যই চিন্তা করবেন। কিন্তু এই অন্তরঙ্গ দিকটি ছাড়া তাঁর ব্যক্তি সত্বার আরও একটা ব্যাপক ও গভীর দিক ছিল—যেটির সঙ্গে ছিল সাধারণের (যথা আমার) নিবিড় পরিচয়। এটা তাঁর মানব প্রীতির দিক।

বাঁকুড়া জেলা তাঁর প্রাণ ছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁর মানব হিতের তীব্র অভিলাষ বাঁকুড়াবাসীর হিতের নিমিত্ত বিচিত্র কর্ম্মে রূপায়িত হয়েছিল। 'বাঁকুড়া সম্মিলনীর' তিনি সভাপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁর হিতৈষা সম্মিলনীর ক্ষুদ্র পরিসরেই আবদ্ধ ছিল না, বরং সম্মিলনীর দায়িত্ব তাঁর উগ্র হিতাভিলাষ ও স্বাধীন কর্ম্মপ্রচেষ্টা—অনেক পরিমাণে ব্যাহত করেছিল। এর দুঃখ তাঁকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পীড়িত করেছে। মহামন্বন্তরের আঘাত থেকে আরোগ্য লাভ করতে না করতেই বাঁকুড়া যখন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ অবস্থায় বিপন্ন, তখন তাঁর যে তীব্র উদ্বেগ ও অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখেছি তা ভোলবার নয়। মুহূর্ত্তের জন্যেও তিনি স্থিরচিত্ত ছিলেন না। পরিশ্রান্ত দেহ বার বার বিশ্রাম চেয়েছে কিন্তু মানসিক যৌবন দৈহিক অক্ষমতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। সুকুমারবাবুর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে এবং যার জন্যে অন্তরের মধ্যে তাঁকে বার বার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়েছি তা হচ্ছে তাঁর মনের প্রগতিশীলতা। যুবকের মত কর্ম্মের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজ ও রাষ্ট্রের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল পটভূমিকায় এই কর্ম্মী যেমন তাঁব কর্ম্ম-পদ্ধতিকে সামঞ্জস্য দান করতে পারতেন এমন আর কাউকে সংসা দেখা যায় না। ঠিক এই কারণে সম্মিলনীর প্রাচীন পন্থার সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ হয়েছে বারংবার। সেখানে পরাজিত হয়েছেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নূতন পথে নূতনতর প্রতিষ্ঠান গঠন করে উদার দৃষ্টির দ্বারা আমাদের মত যুবকদের আকর্ষণ করেছেন। তখন দেখেছি অপটু ও চাকুরী ব্যবসায়ী ও স্বার্থান্ধ সরকারি আমলাদের উপর তাঁর কী অসীম ক্রোধ এবং সম্মিলনীর সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামী ও যশোলিপ্সার প্রতি কী দারুণ বিতৃষ্ণা। তখন সব্যসাচীর মত দেশের শত্রুদের বামহস্তে আক্রমণে জর্জ্জরিত করেছেন এবং দক্ষিণহস্তে নূতন কর্ম্মপন্থা গঠন করে চলেছেন।

তাঁরই প্রেরণায় কয়েকজন উদ্যোগী যুবককে নিয়ে আমি এখানে 'জনকল্যাণ-সঙ্ঘ' গঠন করেছিলাম এবং বাঁকুড়ায় তিনি প্রবীন ও যুবকদের নিয়ে করলেন 'রিলিফ্ কো অর্ডিনেশন কমিটী' এই সময় সুকুমারবাবু পুনশ্চ সরকারী কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং ঘরে-বাইরে কী রকম বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই সময়টায় এমন হয়েছিল যে কখন কী কাজে আমাদের ডাক পড়বে তার ঠিক ছিল না। হয়তো সকালেই খবর এলো সম্ভব হলে এখনই আমার সঙ্গে দেখা কর। অথবা কোন-দিন পোষ্টকার্ড পাওয়া গেল কাল সকাল সাড়ে সাতটায় আমার সঙ্গে দেখা করবে বিশেষ কথা আছে সাড়ে সাতটার পর আমি বেরিয়ে যাবো। একটানা বাঁকা বড় বড় জড়ানো অথচ স্পষ্ট লেখা, তলায় সংক্ষিপ্ত সই—স. চ.—।

যাওয়া মাত্রেই হয়তো তিনি আরম্ভ করলেন 'দেখো এ রকম ধীর গতিতে চললে তো আমাদের কাজ হবে না। এই দুদিনের মধ্যেই কলকাতায় পরিচিত সকলের কাছে আবেদন করতে হবে আর সবাইকে জোটাও। তিনি কথা বলতেন প্রত্যেকটি শব্দের উপর বিশেষ জোর দিয়ে এবং আস্তে বলতেন না। এর কারণ তাঁর অভ্যন্তরের বিপুল কর্ম্মপ্রেরণা ও বাহিরের দিক থেকে হতাশার সংঘর্ষ। সম্মিলনীর দিক থেকে যখনই তিনি বাধা পেয়েছেন তখন অর্দ্ধ হতাশায় অর্দ্ধ উত্তেজিতভাবে আমায় বলতেন "তা-ই ক-রোনা 'জনকল্যাণ'কে Revive করো, সম্মিলনীর দ্বারা কোনো কাজ হবে না। এবং কথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে তালিকা করে দিলেন কী কী করতে হবে এবং কার কার কাছে যেতে হবে। কখনও তাঁর নির্দ্দেশ এলো, বাঁকুড়ায় গিয়ে বাঁকুড়াবাসীর অবস্থা সম্পর্কে একটা Statement বিশিষ্ট লোককে দিয়ে লিখিয়ে কাগজে ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কখনও বা "রেণুকা রায়কে বাঁকুড়ার অবস্থা দেখার জন্যে রাজি করানো গেছে। তুমি বাঁকুড়া গিয়ে এঁর এঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর দেখা-শোনার ব্যবস্থা করগে—লোক মরে যাচ্ছে আর অকর্ম্মণ্য অফিসাররা তাঁদের চাকরী বজায় করবেন।" বাঁকুড়া সম্পর্কে যাঁদের অনুরাগ আছে তাঁরা তৎ-কালীন কাগজে শ্রীমতী রেণুকা রায়ের বর্ণনা ও মন্তব্য নিশ্চয়ই মনে রাখবেন। বলা বাহুল্য এই রকম আন্দোলনের ফলেই সরকারের টনক নড়ল এবং দারুণ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁকুড়া রক্ষা পেল।

তাঁর লোকান্তরিত হবার পর থেকে আমার বার বার মনে পড়ে স্নেহ ও সরলতায় মণ্ডিত সৌম্যমুখ ও অকপট হৃদয়ের সহানুভূতির বাণী। এই সময় আমার স্ত্রীর অসুখের জন্যে মাঝে মাঝে বাড়ী যেতে হোত। সুকুমার বাবুর তখনকার চিঠিগুলির আন্তরিকতা আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে। কঠোরে ও কোমলতায় তিনি লোকোত্তরই ছিলেন। তিনি কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন কিন্তু তা অনেকের মত মামুলি ভাবে নয়। তার মধ্যে তাঁর কতটা

স্নেহ ও আন্তরিকতা থাকতো তাঁ কণ্ঠেই উচ্ছলিত হোত। সেকণ্ঠ এখনও আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। আমার চিত্তপটে তাঁর আকৃতি বিন্দু-মাত্রও ম্লান হয়নি। কখনও মনে পড়ে বালিগঞ্জে তিনি তাঁর বাড়ীর সামনে রাস্তায় কারও সঙ্গে কথা কইতে কইতে পায়চারি করছেন। গায়ে খাকি সার্ট ও সর্ট হাতে ছড়ি, কখনও বা গরমের লম্বা কোট গায়ে। কখনো বা উৎকন্ঠিত ভাবে কার প্রতীক্ষায় বারে বারে বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছেন। বাইরে যখন দাঁড়াতেন ছড়িটি তাঁর হাতে সব সময়েই থাকতো। আমি আশা করি স্বকুমার বাবুর আত্মীয়েরা এই ছড়িটি সযত্নে রক্ষা করবেন।

আমি দেখেছি উন্নত চিন্তা তাঁকে বাস্তব কর্ম্মজীবনে প্রেরণা দিয়েছে। কর্ম্মের অবকাশে বা পথে চলার মধ্যে তাঁব কখনও কখনও মনে পড়তো কালিদাসের যুগের কথা—সে যুগের জীবনাদর্শ সামাজিক ও রাষ্ট্রীক চিন্তাধারা। একদিন তাঁর সঙ্গে পথে চলেছি সম্ভবত কোন ধনীর দ্বারে অর্থভিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি চিন্তা করতে করতে সহসা প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা বলতে পার 'রঘুর' প্রথমে দিলীপের বর্ণনায় 'দুদোহ গাং স যজ্ঞায়'—এর পর কী আছে? আমার মনে পড়ে ও ঠিক আসছে না।" আমি বললাম 'শস্যায় মঘবা দিবম্।' অতঃপর শ্লোকার্দ্ধটি তিনি বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন। বাঁকুড়ার দুঃস্থদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য বার বাব ধনীদের কাছে গেছেন কিন্তু অর্থ সাহায্য পেয়েছেন ক্বচিৎ। তিনি আমাকে একটা সংস্কৃত শ্লোক বহুবার শোনাতেন যার অর্থ হচ্ছে 'ধনীরা দরিদ্রের মর্ম্মবেদনা বোঝে না।'

কর্ম্মসূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় বাঁকুড়ায় তাঁর মৃত্যুর আনুমানিক পাঁচ মাস আগে ডিষ্টিক্ট বোড প্রেস বিল্ডিংএ। এর কিছু পূর্ব্বে বাঁকুড়ায় ডিষ্ট্রিক্ট ডেভালাপমেণ্ট কমিটি প্রতিষ্ঠা তাঁর শেষ স্মরণীয় কীর্ত্তি। তখন বাঁকুড়া জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। আমি যাওয়া মাত্রই তিন আমাকে দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে চিঠি লেখালেন অতিশীঘ্র প্যালুড্রিনের ব্যবস্থা করার জন্যে। বাঁকুড়ায় তখন প্যালুড্রিন একেবারেই পাওয়া যাচ্ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি প্যালুড্রিনের ব্যবস্থা করার জন্য কলকাতায় লোক পাঠাবেন। স্বকুমার বাবু বিস্মিত ও উত্তেজিত হয়ে বললেন "কেন লোক দিয়ে প্যালুড্রিন আনার ব্যবস্থা মানে পাঁচ সাত দিন, কেন বিজ্ঞানের যুগে ফোনে তিনি ব্যবস্থা করতে পারেন না আশ্চর্য্য?" নানা কথাবার্ত্তার পর আমরা রাস্তাদিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি তিনি বললেন "দেখ বাঁকুড়ার গাছ পালার মাঠের যেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করি এমন আর কোন জায়গারই নয়। এর গাছ পালা যেন কথা কয়" প্রশ্ন করলেন "এর কারণ কি বল দেখি? এটা যেন একটা এক্সিডেণ্ট নয় একটা অন্য কিছু" প্রশ্ন কর্ত্তার অন্তরই একমাত্র এর

উত্তর দিতে পারে তবু আমি বললাম "কারণ বোধ হয় আপনি গাছপালা ভালোবাসেন এবং বাঁকুড়াকে ভালোবাসেন আরও গভীর ভাবে।"

আমি বিস্মিত হই এই মানুষটির অন্তরে কী গভীর প্রীতিরসই ছিল এবং বাঁকুড়ার সঙ্গে নিজের জন্মান্তরীণ অচ্ছেদ্য বন্ধন কী গভীর ভাবে অনুভব করতেন। এর পরেই তাঁর একমাত্র কন্যার অসুস্থতার সংবাদে মিহিজাম চলে যান্ এবং সেখানেই আকস্মিক এই কঠিন রোগে আক্রান্ত হন্ তারপর তাঁকে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়, তারপর সব শেষ।

রোগ শয্যায় তাঁকে দেখতে যাওয়া যে কী রকম বেদনা দায়ক তা আমার মত আরো অনেকেই অনুভব করেছেন নিশ্চয়ই। মনের যুবা সুলভ অদম্য কর্ম্মপ্রেরণা বিকলদেহ পিঞ্জরে বদ্ধ হয়ে মাথা কুটছে উপায় নেই। এ দৃশ্য দেখে অশ্রুসংবরণ করা কঠিন হোতো। কারো সঙ্গে বেশী কথা বলাও নিষেধ ছিল। কয়েকটা মাত্র কথার পরই আমায় বললেন 'তুমি যাও তুমি কাছে থাকলেই বেশী কথা বলে ফেলচি' ইত্যাদি। চলে যাচ্ছি আবার ডাকলেন।

আমার মনে হয় অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে বঞ্চনা ও হতাশা তাঁর মৃত্যুকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। আমি জানি যার ওপরে তিনি সবচেয়ে আস্থা স্থাপন করেছেন তারি কাছে তাঁকে আঘাত পেয়ে হতাশ হতে হয়েছে।

মৃত্যুর পর তাঁকে আমার মনে পড়েছে বহুবার। বাঁকুড়ার কথা মনে করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা মনে আসে। তাঁর তিরোধানের পর আমি যখনই হরিশ মুখার্জ্জীর রোডে গিয়েছি বা তাঁর বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ীর দিকে গিয়েছি দু'চার বার আমার অজ্ঞাতসারেই চোখ সজল হয়ে এসেছে। আরতো সেই বাইরে দণ্ডায়মান দীর্ঘ দেহ ও সরল মুখচ্ছবি দেখতে পাব না। আর সেই প্রিয় পরিচিত কণ্ঠের কখনো উত্তেজিত কখনো ব্যস্ত কখনো স্নেহাপ্লুত কথাও শোনা যাবে না। কালিদাস রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রেরণা আর কার কাছে পাব? তাঁকে যখনই মনে পড়ে তখনই প্রার্থনা করি হে মানব হিত ব্রতী যুবক, কালিদাস রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের বাহক, মৃত্যুর পার থেকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করো তোমার প্রেরণা যেন জীবনে কিঞ্চিৎও সার্থক করে তুলতে পারি।

অধ্যাপক প্রেসীডেন্সী কলেজ — শ্রীক্ষুদিরাম দাস

অপাপবিদ্ধ সুকুমার

সুকুমার বাবুর সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। প্রথম তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯০৪ সালে। আমি সে বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হই। সুকুমার বাবু ফোর্থ ইয়ারে পড়েন। ঘটনাক্রমে আমরা দুজন ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে একই ঘরে কিছুদিন ছিলাম। সুকুমার বাবুর নাম আমি আগে হইতেই জানিতাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন কৃতি ছাত্র হিসাবে ছাত্রমহলের সকলেই তাঁহাকে জানিত। তাঁহার এই পরিচয়ে মফঃস্বলের একটি ছোট সহর হইতে আসিয়া আমি খুবই ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু দুই একদিনের মধ্যেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার ভয়ের কোনও কারণ নাই। আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে তিনি খুবই অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হইবেন ও সদাসর্ব্বদা বই লইয়াই থাকিবেন। দেখিলাম আমার সে সব ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহার কিছুমাত্রও অহঙ্কার নাই, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, সদাসর্ব্বদা বই লইয়া থাকা দূরে থাকুক, সকালে ও রাত্রিতে তিনি খুব অল্প সময়ই পড়াশুনা করিতেন। বাকী সময়ে হাসি ঠাট্টা করিয়া, লোকজনের সঙ্গে নানাবিষয়ে গল্প করিয়া সময় কাটাইতেন। এত অল্প সময় লেখাপড়া করিয়াও পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বদাই বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। তিনি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন অথচ ইংরাজী ও সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।

আমরা ভাবিতাম যে তিনি যদি আরও কিছু পড়াশুনা করিতেন তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে আরও অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

ডাক টিকেট্ সংগ্রহ করাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বহু দেশের বহু রকমের ষ্ট্যাম্প তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জানিনা সেগুলি এখন কোথায়।

তিনি অসাধারণ বন্ধুবৎসল ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় তামাক বা সিগারেট খাওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার এক বন্ধু তামাক খাইতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমি অনেকদিন দেখিয়াছি সুকুমার বাবু স্বহস্তে তাঁহার জন্য তামাক সাজিয়া দিতেছেন।

আর এক ঘটনার কথা মনে পড়ে। বিহার প্রত্যাগত আমার এক বন্ধু রাত্রিতে রুটী খাইতেন। তাহা দেখিয়া আমিও রাত্রিতে রুটী খাইতে আরম্ভ করি। সেজন্য হোষ্টেলে কিছু বেশী দিতে হইত। রাত্রের খাবার আমাদের ঘরেই দিত। একদিন আমাদের কয়েকজন বন্ধু আমাদের সাময়িক অনুপস্থিতিতে আমাদের রুটী খাইয়া ফেলেন। পরে বাধ্য হইয়া কম পড়িয়াছে

বলিয়া আবার চাহিয়া লই। ক্রমে আমরা যত রুটী খাইতে পারি তাহার অনেক গুণ বেশী রুটী লইতে আরম্ভ করি। তাহা অবশ্য বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বিলান হইত। সুকুমার বাবু ইহা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে খুব ভর্ৎসনা করেন। তখন তাঁহার সঙ্গে আমরা অনেক তর্ক করি, কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারি আমাদের খুবই অন্যায় হইয়াছে! সুকুমার বাবু কোনও অন্যায় আচরণ দেখিতে পারিতেন না ও তাঁহার বন্ধুদিগকে অন্যায় আচরণ হইতে দূরে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

কিছু লেখাপড়া করা, কিছু খেলাধূলা ও কিছু গল্পগুজব করা, এইভাবেই আমাদের হষ্টেলের জীবন অতিবাহিত হয়।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সুকুমার বাবু বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে যোগদান করেন। তখনকার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ফৌজদারী মোকর্দ্দমা বিচার প্রণালী শিক্ষার জন্য নূতন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে একজন সুদক্ষ প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বসিয়া সাক্ষীগুলির জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিতে হইত ও আইনের তর্ক উঠিলে তাহার নিষ্পত্তি করিতে হইত। একটি সংক্ষিপ্ত রায়ও লিখিতে হইত। ঐরূপ একটি মোকর্দ্দমায় প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে শাস্তি দেন। সুকুমার বাবু কিন্তু স্থির করেন, যে সব প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আসামীকে দোষী বলা চলে না, তাহাকে খালাস দেওয়া উচিত। সুকুমার বাবুর লিখিত নথীপত্র জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যালিফাক্স সাহেব দেখেন ও তিনি মত দেন যে সুকুমার বাবুর মতই ঠিক, আসামীকে খালাস দেওয়াই উচিত ছিল।

সুকুমার বাবু বহরমপুর হইতে আলিপুরে বদলি হইয়া আসেন। সেখানে তাঁহার কাজ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা নাই। তবে তাঁহার সম্বন্ধে বহুদর্শী একজন কৃতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি—কথা হইতেছিল কৃষ্ণনগরে নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদের সম্বন্ধে। একজন সিনিয়ার ডেপুটী বলিলেন, "নূতন নূতন ছোকরা ডেপুটীরা কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে চায় না, কাজ শিখিবারও বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাহাদের নাই—বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রেরা ডেপুটী হইলে তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, সিনিয়ারদের কিছুমাত্র খাতির করে না, তাহারা কোনও কালে ভাল অফিসার হইবে না।" সেখানে সব চেয়ে সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি "অনাথবালক" প্রভৃতি কয়েকখানি উপাদেয় বই লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। অফিসার হিসাবে তাঁহার সমতুল তখন কেহই ছিল না। তিনি তখন বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন

তাহা অনেকের পক্ষেই খাটে, কিন্তু আলিপুরে রামসদন বাবুর ছেলে স্থকুমারকে যেমন দেখিলাম, আমার এই বয়সে এত ছোট বেলায় এমন ভাল অফিসার আমি কখনও দেখি নাই।”

আমি তখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া কৃষ্ণনগরে কাজ শিখিতেছি। চন্দ্রশেখর বাবু অনেকবার আমাকে বলিয়াছিলেন যেন আমি স্থকুমার বাবুর মত কার্য্যদক্ষ হইয়া উঠি।

১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে স্থকুমার বাবু কৃষ্ণনগরে বদলি হইয়া যান। আবার আমরা পুনর্মিলিত হই। কয়েক মাসের জন্য আমরা দুজনে কৃষ্ণনগরে থাকি। তারপরে আমি অন্যত্র চলিয়া যাই।

কৃষ্ণনগরে একটি সাধারণ পাঠাগার আছে। তাহার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সামান্য কয়েকখানি বই লইয়া কোনও রকমে উহা চলিত। স্থকুমার বাবু আসার পরই উহার ভার লন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অনেক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া অনেক আসবাবপত্র ও বই কিনিয়া উহাকে নূতন জীবন দান করেন। তাঁহার এই দানের কথা কৃষ্ণনগরবাসী কখনও ভুলিবে না।

এই সাধারণ পাঠাগারের সম্মুখের মাঠে আমরা টেনিস খেলিতাম। কিন্তু বর্ষাকালে এই মাঠে টেনিস খেলা অসম্ভব হইত। স্থকুমার বাবু এক বৎসর শেষ না হইতেই কৃষ্ণনগর হইতে বদলী হইয়া যান। যাইবার পুর্ব্বে একটি পাকা টেনিস কোর্ট করিবার জন্য যথোপযুক্ত চাঁদা তুলিয়া এক ভদ্রলোকের নিকট রাখিয়া যান। দুঃখের বিষয় ঐ টাকা সেই ভদ্রলোকের নিকট হইতে আর উদ্ধার করা যায় নাই। তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে এখনও সেখানে কোনও পাকা কোর্ট হয় নাই।

স্থকুমার বাবু কিছুদিন কৃষ্ণনগরে আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আবগারী বিভাগের বড় দুর্নাম। এই বিভাগের অনেকেই তখনকার দিনে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কলেজ হইতে পাশ করিয়াই একজন নূতন আবগারী ইন্‌স্পেক্টার সেখানে যান। তিনি অত্যন্ত সৎস্বভাবের ছিলেন। স্থকুমার বাবু তাঁহার সৎস্বভাবের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। স্থকুমার বাবু এই খবর পাইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। শুনিয়াছি প্রায় ৩৬ ঘণ্টা তিনি একাদিক্রমে রোগীর পাশে বসিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এত চেষ্টা যত্ন সত্ত্বেও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত

হন। তাঁহার অকাল মৃত্যুর খবর সুকুমার বাবু চিঠি লিখিয়া আমাকে জানান।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনকে সুকুমার বাবুই প্রথম আবিষ্কার করেন। যতীন্দ্র বাবু তখন কৃষ্ণনগরে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনে সামান্য চাকরী করিতেন। তিনি যে সুকণ্ঠ গায়ক, কবি ও লেখক সুকুমার বাবুই তাহা প্রথম জানিতে পারেন ও লোককে জানান। প্রত্যেক গানের আসরে ও মজলিসে সুকুমার বাবুই যতীন্দ্র বাবুকে লইয়া যাইতেন। তাঁহার গান শোনাইতেন ও তাঁহার লেখা পড়িতেন।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্. সি. মুখার্জ্জী একবার মফঃস্বলে টুর করিতে বাহির হন। তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার ভার যতীন বাবুর উপর ছিল। পলাসী পর্য্যন্ত যাইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনেক অসুবিধায় পড়েন ও বন্দোবস্তের অনেক ত্রুটিও বাহির হইয়া পড়ে। সুকুমার বাবু তখন অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন। যতীন বাবু এই সামান্য ঘটনাগুলি লইয়া একটি সুন্দর, হাস্যোদ্দীপক চিঠি সুকুমার বাবুকে লেখেন। সুকুমার বাবু এই চিঠিখানি আমার নিকট পাঠাইয়া দেন ও লেখেন যে যতীন্দ্রবাবু কালে একজন বিখ্যাত লেখক হইবেন। তাঁহার সেই ভবিষ্যৎ বাণী আজ সফল হইয়াছে।

ইহার পর অনেকদিন সুকুমার বাবুর সহিত আমার দেখা হয় নাই। ১৯১৫ সালের শেষে হঠাৎ তাঁহার নিকট হইতে আমি চিঠি পাই যে রাইটার্স বিল্ডিংএ সেক্রেটেরিয়েটের কাজ শিখিবার জন্য কয়েকজন ডেপুটী লওয়া হইতেছে এবং তিনিও তাঁহাদের মধ্যে আছেন তিনি লেখেন যে সেক্রেটেরিয়েটের কাজ শিখিলে ভবিষ্যতে চাকরীতে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং আমি যেন অবিলম্বে এই প্রার্থীদের মধ্যে মনোনীত হইবার জন্য চেষ্টা করি। তিনি বলেন যে রেভেনিউ সেক্রেটারী বার্লি সাহেব-এর অধীনে আমি চাকরী করিয়াছি। তাঁহাকে যেন পত্রপাঠ এই কাজের জন্য লিখি তাঁহার কথামত আমি বার্লি সাহেবকে লিখি এবং তিনি আমাকে মনোনীত করেন। আমি ১৯১৬ সালে সেক্রেটেরিয়েট-এর কাজ শিখিবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসি।

ভবিষ্যত জীবনে চাকরীতে আমার যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা এই সেক্রেটেরিয়েট-এর শিক্ষার ফলে এবং ইহার মূলে ছিলেন সুকুমার বাবু। দিবারাত্রি তাঁহার এই চিন্তাই ছিল কি করিয়া পরের, বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবদের উপকার করা যায়। তাঁহার এই ঋণ আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারি না।

ইহার পর বহুদিন তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। ১৯২৫ সালে হুগলীতে তিনি এক বেলার জন্য আমার বাড়ীতে আসেন। তখন তিনি সিউড়ীতে। ১৯৩১ সালে আবার তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয় রাজসাহীতে। তখন তিনি নওগাঁতে কো-অপারেটিভ সোসাইটির এ্যাসিষ্টেণ্ট রেজিষ্টার সেই সময়ে তিনি মৃতপ্রায় সমবায় সমিতিগুলিকে নূতন জীবন দান করিয়াছিলেন ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এ সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার নাই।

১৯৩৩ সালে আবার তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয় ফরিদপুরে। আমি তখন ফরিদপুর সদরে, তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত সাবডিভিসনাল অফিসার। গোপালগঞ্জ সাবডিভিসনের বিশেষত্ব আছে ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই নমঃশূদ্র। বেশীর ভাগ সময়ই ইহা জলমগ্ন থাকে। পৃথিবীর আর কোথাও এত কচুরীপানা নাই। এই কচুরীপানায় শস্যের যে কত অনিষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানকার সাবডিভিসনাল অফিসাররা বরাবর গতানুগতিকভাবে কাজ করিয়া যাইতেন। চোর ডাকাতদের জেল দেওয়া, মফঃস্বলে নৌকাযোগে বেড়ান ও মাঝে মাঝে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি পরিদর্শন করা, এই ছিল ইহাদের কাজ। সুকুমার বাবু সে ধাতের লোক ছিলেন না। এই সবডিভিসনের কচুরীপানা ধ্বংসের একটি বিরাট পরিকল্পনা তিনি প্রণয়ন করেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করা এবং তারপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার পরিকল্পনামত তিনি নিজেই কাজ করিয়া এই মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশ কচুরীপানা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন। সেই পরিকল্পনা মত কাজ যদি এখন পর্যন্ত চলিত তবে যে কত লক্ষ লক্ষ মন ধান রক্ষা পাইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। জানিনা এখনও তিনি বাঁচিয়া আছেন কিনা এবং কোথায় আছেন। এখানে তাঁহাব কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। তিনি এককালে একজন কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। পরে কংগ্রেসের দলাদলি ছাড়িয়া গঠনমূলক কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল ফরিদপুর জেলা, বিশেষতঃ গোপালগঞ্জ মহকুমা। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন তিনি রাজদ্রোহী ইংরাজ রাজত্বের অবসানের জন্য তিনি ব্যাগ্র। কিন্তু সুকুমার বাবু তাঁহার প্রকৃত দেশহিতৈষণার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গোপালগঞ্জে আসিলে তিনি তাঁহাকে সমাদরে বাড়ীতে আনিতেন ও যত্ন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। উচ্চবাজকর্ম্মচারীরা এইজন্য সুকুমার বাবুর উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন কিন্তু সুকুমার বাবু তাহা গ্রাহ্যই করিতেন না।

গোপালগঞ্জে থাকাকালীন আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ গ্রেহাম একবার গোপালগঞ্জ সাবডিভিসনাল আফিস পরিদর্শন করিতে আসেন। সুকুমার বাবুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পথে বেড়াইতে যান। তখন Banking Enquiry Committeeর Report প্রকাশিত হইয়াছিল। কথায় কথায় বাংলাদেশের Bankগুলির কথা উঠে। সুকুমার বাবু Bank সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য বলেন ও Banking Enquiry Committeeর Report-এর কতটুকু ঠিক ও কতটুকু তাঁহার মতে বেঠিক তাহাও বলেন। কমিশনার Graham সাহেব তখন কিছুই বলেন নাই। পরে ঢাকায় ফিরিয়া গিয়া তিনি বলেন যে গোপালগঞ্জে এক আশ্চর্য্য (wonderful) মানুষের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, সে Banking সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ (authority), এরকম অদ্ভুত লোক তিনি কখনও দেখেন নাই।

ইহার পর পাবনায় তাঁহার সহিত আমার দুই একবার দেখা হয় তখন তিনি Inspector General of Registration. পরে বীরভূমে আবার তাঁহার সহিত মিলিত হই। তখন শ্রীনিকেতনে তিনি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। দেশের উন্নতিকল্পে তখন তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত। এই সময়কার তাঁহার দু একটি কাজের কথা উল্লেখ না করিয়া পারি না। বীরভূম জেলায় লক্ষ লক্ষ তালগাছ আছে কিন্তু সমগ্র জেলায় একটিও তালপাখা তৈয়ার হয় না; যত তাল পাখা পাওয়া যায় তাহা সমস্তই বর্দ্ধমান জেলা হইতে আনীত হয়। বীরভূম জেলায় তালপাখা তৈয়ার হইলে বহু দুঃস্থ লোকের কিছু সংস্থান হয় ইহা মনে করিয়া সুকুমার বাবু খুলনা জেলা হইতে লোক আনিয়া বীরভূম জেলার অনেক লোককে তালপাখা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেন।

তালের গুড় অত্যন্ত উপাদেয় জিনিষ। কিন্তু এত তালগাছ থাকা সত্ত্বেও বীরভূম জেলায় এক ছটাকও তালের গুড় তৈয়ার হয় না। তালের গুড় তৈয়ারীর প্রণালী যাহাতে বীরভূম জেলার লোক শিখিতে পারে সেইজন্য ডায়মণ্ডহারবার হইতে লোক (শিউলী) আনাইয়া তিনি বোলপুরের নিকটে তালের গুড তৈয়ারীর ব্যবস্থা করেন। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে একদিন আমি শ্রীনিকেতনে যাইয়া দেখি যে নূতন তৈয়ারী তালের নলেন গুড় কিছু সুকুমার বাবু কবিগুরুর নিকটে পাঠাইতেছেন, পরে শুনিয়াছিলাম গুরুদেব এই গুড় পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

বীরভূমে আকড় নামে একটি আগাছা সহজেই জন্মে এবং পুরানো পরিত্যক্ত বাসভূমে বিস্তৃতভাবে বাড়িয়া উঠিয়া গ্রামের সে প্রান্তটি জঙ্গলে পরিণত করে। সুকুমার বাবু দেখিয়া ঠিক করেন যে আকড় গাছ হইতে সহজে লাঠি হইতে পারে। কাঠ খুব শক্ত ও সহজে বাঁকা অংশগুলি সোজা

করা যাইতে পারে। তাঁহার কথামত পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাঁহার অনুমান ঠিক। আকড় গাছে অতি সুন্দর গ্রন্থি বিশিষ্ট এবং কঠিন লাঠি তৈয়ার করা যায়। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রথম যে লাঠিটা তৈয়ার হয় তাহা তিনি আমাকে উপহার দেন। সে লাঠি এখনও সযত্নে আমার নিকটে রক্ষিত আছে। পরে অতি সুন্দর সুন্দর লাঠি আকড গাছ হইতে শ্রীনিকেতনে তৈয়ার হইতে আরম্ভ হয় এবং কলিকাতার লোকেরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে কিনিতে থাকে। এইরূপে বহুলোকের অন্নসংস্থানের উপায় হয়।

ওদেশে শর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী পূজার সময়ে কলম তৈয়ারী ছাড়া এই শর গাছে কোনও কিছু কাজ হইত না। দরকারের সময়ে লোকে উহা জ্বালানীকাঠ স্বরূপ ব্যবহার করিত। সুকুমার বাবু ঠিক করেন যে উহা দ্বারা ভাল মোড়া ও চেয়ার তৈয়ার হইতে পারে। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী শর হইতে প্রথম মোড়া তৈয়ার হয়, পরে জুতা তৈয়ারী বিভাগের পরিত্যক্ত চামড়া দিয়া ঐ সব মোড়া ও চেয়ারের বসিবার স্থান তৈয়ার করা হয়। প্রথম তৈয়ারী ঐরকম দুখানা চেয়ারা এখনও আমার নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের মধ্যে আছে।

এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় সুকুমার বাবুর প্রতিভা কেমন সর্ব্বতোমুখী ছিল—দেশের লোকের আর্থিক উন্নতির জন্য কেমন করিয়া ও কত দিক দিয়া তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সেচের পুকুরের সংস্কারের জন্য তিনি নিজেকে কেমন করিয়া উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। সেজন্য এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু লিখিলাম না।

হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মুসলমানগণ এদেশে সংখ্যায় বেশী, অথচ তাহাদের আর্থিক অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক অসচ্ছল এই কথা সর্ব্বদাই তাঁহাকে পীড়া দিত। এ বিষয়ে একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। আমরা দুজনে একসঙ্গে বেড়াইতেছিলাম। সে জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক বেশী. কিন্তু সহরের রাজপথে যত বড় বাড়ী দেখা গেল সবগুলিই হিন্দুর। মুসলমানদের বাড়ী সংখ্যায় অনেক কম এবং সেগুলি অত্যন্ত ছোট এবং বেশীর ভাগ ভগ্ন। সুকুমার বাবু বলিলেন, "দেখলেন—মুসলমানদের অবস্থা—তাহাদের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা না করিলে আমাদের স্বরাজ বৃথা—স্বরাজ শুধু হিন্দুর নয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই। রাজকর্ম্মচারী হিসাবে তিনি কখনও হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য করিতেন না, সর্ব্বদাই মুসলমানদের আর্থিক উন্নতির জন্য বিশেষ সচেষ্ট থাকিতেন।

তাঁহার মত উদার লোক আমি কখনও দেখি নাই।

তাঁহার পুরান বন্ধু ও তাহাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য তাঁহার চিন্তার

বিরাম ছিল না। ১৯১৭-১৮ সালে তিনি পাবনার সদর সাব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। তখন স্বর্গীয় ক—মহাশয় সেখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে সুকুমার বাবু ইসাক সাহেবের সঙ্গে এ-দেশের গ্রামোন্নতি বিভাগে ছিলেন। সেই সময়ে ক—বাবুর এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় তহবিল তসরুপাত অভিযোগে অভিযুক্ত হন। সুকুমার বাবু তদন্ত করিয়া দেখেন যে সেই লোকটি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছে তাঁহারই এক কেরাণী তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার সুযোগ লইয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। সুকুমার বাবু সেই কেরাণীর নিকট হইতে সেই টাকা আদায় করিয়া লন ও ক—বাবুর সেই আত্মীয়কে কি করিয়া বাঁচান যায় তাহা লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত হন। তাঁহার চেষ্টার ফলে সেই নির্ব্বোধ লোকটি বাঁচিয়া যায় ও তাহার চাকরীও বজায় থাকে।

২৯১০-১১ সালে শ্রীপ—মহাশয় আলিপুরে সুকুমার বাবুর সহকর্ম্মী ছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান। ২৬।২৭ বৎসর পরে (যতদূর মনে পড়ে সুকুমার বাবু তখন পেনসন লইয়াছেন) তিনি খবর পান প—বাবুর স্ত্রী ছেলে-পিলে লইয়া অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে পড়িয়াছেন। অনেক খোঁজ করিয়া সুকুমার বাবু তাঁহাদের সন্ধান করেন ও দেখিতে পান যে প—বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া ভীষণ দুঃখ ও কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। সুকুমার বাবু তৎক্ষণাৎ এই দুঃস্থ পরিবারের সমস্ত ভার লন ও মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সুকুমার বাবুর পেনসন ছিল কিছু কম ৫০০৲ টাকা। তাহার মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসা বাবদ খরচ হইত মাসিক ৩৫০৲ টাকা। বাকি ১৫০৲ টাকায় কোন রকমে তাঁহার সংসার খরচ চলিত। এই অল্প আয়ের মধ্যে প—বাবুর সংসারের সমস্ত ভার লইতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এই দুঃস্থ পরিবারের সমস্ত খরচ তিনি বহন করিতেন। কিছুদিন পরে প—বাবুর স্ত্রী মারা যান। পরে তাঁহার পুত্রবধূ যক্ষারোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাকী থাকিল প—বাবুর পুত্র। তিনি সর্ব্বদাই নানা রোগে ভুগিতেন। যতদিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন সুকুমার বাবু তাঁহার সমস্ত খরচ ও চিকিৎসার ব্যয় বহন করিতেন। ১৯৪৪ সালে প—বাবুর পুত্র সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া পরলোক গমন করেন।

এইরূপ বন্ধুপ্রীতি ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই বিরল নয় কি?

সুকুমার বাবু ১৯০৮।১৯০৯ সালে বহরমপুরে, তখন তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন শ্রীযুক্ত ক—বাবু। ক—বাবু বহুদিন গত হইয়াছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে ক—বাবুর এক পুত্র আসিয়া সুকুমার বাবুকে ধরে যে তাহাকে চাকরি করিয়া দিতে

হইবে। সে বেশীদূর লেখাপড়া শিখে নাই। সুকুমার বাবু তাহাকে চাকরি দিবার জন্ম বহুলোককে অনুরোধ করেন, বহুলোকের নিকট নিজে গিয়া তাহাকে চাকরী দিবার জন্ম ধরেন ও যতদিন তাহার না চাকরী হয় ততদিন মাসে মাসে তাহাকে অর্থসাহায্য করেন। একদিন আমি সুকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—ক—বাবুর বহু সম্ভ্রান্ত আত্মীয় পরিজন আছে—আপনার সঙ্গে তাঁহার শেষ দেখা ৩৫।৪০ বৎসর আগে। আপনি কেন তাঁহার ছেলের জন্ম এত পরিশ্রম করিতেছেন?" তিনি উত্তর দেন "আর যদি কোন লোক উহার জন্ম কিছু করিত তবে সে কেন আমার নিকট আসিয়াছে? আমার ছেলের জন্ম দরকার হইলে আপনাকে সবকিছু করিতে হইবে আপনার ছেলের জন্ম যদি আমি কখনও কিছু করিতে পারি তাহা করিব—সেই রকম ক—বাবুর ছেলের জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য।"

এই কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলাম। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে কত লোককে, কত পরিবারকে যে তিনি সাহায্য করিতেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সে সব কথা কখনও তিনি কাহাকেও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকেও বলিতেন না।

সুকুমার বাবু ছোট ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমাদের বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত ব—বাবুর নাতি ন— সুকুমার বাবুকে দেখিলেই "পণ্ডিতদাদু পণ্ডিতদাদু" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিত। সুকুমার বাবু যখনই ব—বাবুর বাড়ী যাইতেন তখনই ন—এর জন্ম অন্ততঃ ২৲ টাকার মিষ্টান্ন লইয়া যাইতেন। ব—বাবুর বাড়ীতে গেলে তাহাকে জলখাবার দিতে অনর্থক তাঁহাদের অর্থদণ্ড না হয় সে বিষয়েও তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

তাঁহার শেষ সময়ের কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত দুর্ব্বল, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে খুব কষ্ট হইতেছে, অনবরত হাঁপাইতেছেন, রাত্রিতে মোটেই ঘুমাইতে পারেন না, কথা বলিতেও কষ্ট হয়। ক্রমাগত ছটফট করিতেছেন। এমন সময় খবর আসিল তাঁহার বন্ধুকন্যা এম, এ পাশ হইয়াছে। তখন তাঁহার কি আনন্দ রোগক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এইবার ওর একটা চাকরীর জোগাড় করিয়া দিতে হইবে।" আমি গেলেই আমাকে বলিলেন, "শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ স্নেহময় দত্তের সহিত আপনার পরিচয় আছে। আপনি —কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া স্নেহময় দত্ত মহাশয়কে বিশেষ করিয়া ধরুণ।" যখন এসব কথা তিনি বলিতেছিলেন তখন রোগযন্ত্রণা তাঁর এত বেশী ছিল যে দেখিতেও কষ্ট হয়। কথাগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল, মুখের কাছে কাণ না লইয়া গেলে তাহার কথা বোঝা যায় না। তখনি গীতা-

নাথের (১) ডাক পড়িল— তাহাকে বলিলেন, 'তুমি এখনই গিরীশ (২) কে ও বিনয় (৩) কে চিঠি লিখিয়া দাও যেন তাহারা অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করে।—র চাকরীর জন্য আমি তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব, তাহারা যেন প্রাণপণ করে।

মৃত্যুশয্যায় বসিয়া অপরের জন্য এতখানি করা আমি আর কখনও দেখি নাই।

ইহার কিছুদিন পরে আর একটি ঘটনা ঘটে। তখন তাঁহার গলার স্বর প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই অসহ্য যন্ত্রণা—ডাক্তাররা বলিয়াছেন, যে কোনও মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইতে পারে। অথচ ভিতরে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এমন সময়ে কাহার কাছে তিনি শুনিতে পান যে আমি আমার গাড়ী বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছি। তখন আমাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অস্ফুটস্বরে, কতকটা ইসারায়, আমাকে বলেন যে আমাদের বন্ধু ব—বাবু পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া হাটিতে পারেন না, একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে গাড়ী পাইলে একবার তিনি বেড়াইয়া আসেন। সুকুমার বাবু সেই কথা স্মরণ করিয়া আমাকে বলেন যে গাড়ী বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে যেন আমি ব—বাবুকে গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া লইয়া আসি।

এত রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি অপরের কথা ভাবিতেন।

এমন যে স্নেহপ্রবণ, পরোপকারী, পরহিতৈষী লোক তিনি ছিলেন তবুও কর্ত্তব্য কাজে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি বা অবহেলা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তখন তিনি বজ্রের মত কঠোর হইতেন। মনে পড়ে কবিগুরু এই সম্বন্ধে সুকুমার বাবুকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তুমি খাঁটি ইংরেজের স্বভাব পেয়েছ —কাজে বিন্দুমাত্র ত্রুটী বা অবহেলা সহ্য করিতে পার না।" সুকুমার বাবু উত্তর দেন—"আমরা সেইরকম শিক্ষাই পেয়েছি—নিজে কোনও দিন কাজে অবহেলা করিনি—অন্য লোকের কাজে অবহেলা সেইজন্য আমার অসহ্য বলিয়া মনে হয়।"

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কি করিয়া দেশের উন্নতি করা যায় তাহা ভাবিতেন। দেশের পুকুরের সংস্কার করা, দেশের অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, দেশের তথাকথিত অস্পৃশ্যদের আর্থিক উন্নতি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা—এই সব ছিল তাঁহার জীবনের পণ। যতদিন কথা বলিতে পারিতেন ততদিনই এইসব বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিতেন।

(১) সীতানাথ নামে একটি ছেলে তাঁহার বাড়ীতে তখন থাকিত।
(২) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র সেন।
(৩) শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ দাসগুপ্ত।

আমার মনে হয় তিনি যদি অসুস্থ অবস্থায় নোয়াখালি গিয়া উৎপীড়িত লোক-জনের সাহায্যের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম না করিতেন ও পরে ফরিদপুর ও ডায়মণ্ডহারবারের দুর্গম গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অস্পৃশ্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য অতটা ক্লেশ স্বীকার না করিতেন তবে হয়তো আরও কিছুদিন আমরা তাঁহাকে পাইতাম। আমার ধারণা দেশের কাজে এমন ভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্যই তাঁহাকে আমরা অকালে হারাইয়াছি।

এখানে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। জীবনের শেষ কয়েক মাস তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। ডাক্তাররা বলিতেন যে কোনও মুহূর্তেই তাহার জীবনান্ত হইতে পারে। এত শারীরিক কষ্টের মধ্যেও কোনও দিন তাঁহাকে অস্থির হইতে দেখি নাই। তাঁহার সহ্য গুণ ছিল সত্যই অসাধারণ, রাগ নাই, বিরক্তি নাই, চিৎকার নাই। কান্নাকাটি তো মোটেই নাই। বাহিরের লোক বুঝিতে পারিত না যে ঘরে একজন মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছে। ঘরে গেলেই দেখা যাইত নিঃশ্বাস ফেলিতে তাঁহার কি ভীষণ কষ্ট হইতেছে। মনে হইত প্রতি ক্ষণেই যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কতরাত্রি কাটিয়া গিয়াছে বিন্দুমাত্রও ঘুমাইতে পারেন নাই। একভাবে স্থির হইয়া আছেন, পাশ ফিরান অসম্ভব। অত দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও যে কেমন করিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন তাহা ধারণা করা যায় না। অথচ আমা-দিগকে দেখিলে এরই মধ্যে অতি অস্পষ্ট স্বরে দেশের উন্নতির কথা, পুকুর সংস্কারের কথা অশিক্ষিতদের ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার কথা এই সব বিষয় বলিতেন এই সবই ছিল তাঁহার প্রাণ ও ধ্যান। ডাক্তারদের বিশেষ বারণ ছিল তাঁহাকে যেন কোনও কথা বলিতে দেওয়া না হয় কিন্তু তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজের ভার আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে এত ব্যগ্র ছিলেন যে সে সব বারণ তিনি মানিতেন না।

এই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁহার কন্যা পুষ্প, তাঁহার জামাই শান্তনু তাঁহার ছোটছেলে সুধীর তাঁহার দৌহিত্রী মোনো ও বুলু ও ছোট দুই পুত্রবধূ এঁদের সেবার কথা। সে যে কি যত্ন কি সেবা কি ঐকান্তিক নিষ্ঠা যাহারা না দেখি-য়াছে তাহাদের বুঝান অসম্ভব। সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগিত শান্তনুর কঠিন দায়িত্ববোধ ও ঐকান্তিক যত্ন দেখিয়া। লোকে বলে জামাই কখনও আপনার হয় না। অনেকক্ষেত্রে হয়ত তাহাই ঠিক। কিন্তু শান্তনুর বেলা সেকথা একেবারেই খাটে না। রোগে দুঃখে সেবা করাই মেয়েদের ধর্ম্ম আমরা তাহাই আশা করিয়া থাকি। তাহাদের সেবা দেখিলে আমরা খুশী হই কিন্তু আশ্চর্য্যা-ন্বিত হই না। মনে করি তাহারা ত মায়ের জাতি, তাহাদের সেবা যত্ন না পাইলে আমরা তো বাঁচিতেই পারি না। কিন্তু জামাইয়ের কাছে এতটা কেহ কখনও আশা করে না। কিন্তু অবাক হইয়া দেখিলাম শান্তনুর দায়িত্ব,

যত্ন ও নিয়মানুবর্ত্তিতা এই জিনিষটি আমার অত দুঃখের মধ্যেও সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ দিয়াছিল। সব ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল শান্তনুর আশ্চর্য্য শৃঙ্খলাপরায়ণতা নিজে অসুস্থ অথচ দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি বিরাম নাই বিশ্রাম নাই ঘড়ির কাঁটার মত তাহারই নির্দ্দেশে সব ব্যবস্থা চলিতেছে। ডাক্তারদের উপদেশ গুলির কোথাও কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে না। রোগীর চিকিৎসার জন্য যত কিছু ঝঞ্ঝাট ও দায়িত্ব লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা ভয় নাই এবং তাহার উপর নিকটজনের হিংসা শ্লেষ ও নিন্দা উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যের পথে দৃঢভাবে চলার সাহস, ধীর স্থির অবিচলিত। ঐ দুরারোগ্য রোগে ক্লান্তি নাই দ্বিধা নাই সর্ব্বদাই একচিন্তা কি করিয়া শ্বশুরের রোগ যন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও লাঘব হয়—। মনে আছে এইসব দেখিয়া আমি সুকুমার বাবুকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে তিনি সত্য সত্যই ভাগ্যবান।

সুকুমার বাবুতো চলিয়া গেলেন। তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে এখন তিনি পার্থিব শোক দুঃখের বাহিরে কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমার ক্ষতি অপূরণীয়। ভগবান আমাকে এক সঙ্গিনী দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অকালে ছাড়িয়া গিয়াছেন। এক অকৃত্তিম পরম হিতৈষী সুহৃদ দিয়াছিলেন। তিনিও চলিয়া গেলেন জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন কি লইয়া থাকিব? জীবনে অনেক দুঃখ শোক ও সন্তাপ পাইয়াছি। মনে হয় আর কেন? মুক্তির আর কত দেরী? আমার মত অভাগার আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? কিন্তু সত্যই কি আমি অভাগা? সুখে দুঃখে এমন সহানুভূতি সম্পন্ন এমন হিতৈষী বন্ধু, এমন উদার, এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী, হিংসা দ্বেষ শূন্য মহাপুরুষ, কয়জনের ভাগ্যে এমন সুহৃদ মিলিয়াছে? আমি সত্যই মহা ভাগ্যবান।

হয়ত আর বেশী বিলম্ব নাই! অচিরেই আমাদের আবার পুনর্মিলন ঘটিবে সেই আশাতেই বুক বাঁধিয়া আছি।

১৮।৪২ ডোভার লেন। শ্রীবিনোদ বিহারী সরকার

অমলিন সুকুমার

বহুদিন সংসারে থাকিলে বহুদৃশ্য দেখিতে হয়। বহু স্মৃতির সুখদুঃখ মানুষকে বহন করিতে হয়। এইরূপ এক সুখস্মৃতির সঙ্গে অনুজ প্রতিম সুকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর কথা জড়িত।

১৯০৭ সালে জীবনের প্রথমে নবনিযুক্ত কর্ম্মচারী হিসাবে বহরমপুরে যাই। তখন তথায় শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর রামসদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের মধ্যে

প্রধানতম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার পুত্র সুকুমার আমা অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের কনিষ্ঠ।

অনেক আদর্শের সাম্য থাকায় স্বভাবত আমাদের অনুভূতির সাম্য হইয়াছিল। দেশ বিদেশের বহু প্রশ্ন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনা আবৃত্তি বিশ্লেষণ লইয়া প্রায় সন্ধ্যা ও তৎপরের বহুক্ষণ প্রত্যহ আনন্দে অতিবাহিত হইত। আমাদের সে সময়ের ক্ষুদ্র সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে ছিলেন কটক কলেজের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অধ্যাপক নিশিকান্ত হুগলি কলেজের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অধ্যাপক ৺শিশিরবর্দ্ধন বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ৺জ্যোতির্ব মিত্র প্রভৃতি। প্রায়ই সকলে সমবয়স্ক। শ্রদ্ধেয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়এর সুযোগ্য জামাতা দেবেন্দ্র বিজয় বসু মহাশয় তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্বপূর্ণ গীতা ও ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের আনন্দ দিতেন।

সুকুমারের তখন সবে বিবাহ হইয়াছে। ১৯ বৎসর বয়স। বিশেষ খ্যাতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বভারতীয় অডিট পরীক্ষায় অত্যল্পের জন্য অকৃতকার্য্য হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার মনে আছে নূতন কর্ম্মচারী আমি। সুকুমার তখনও কর্ম্মে নিযুক্ত হন নাই। আমরা দুজনে বহরমপুর ঘাটেতে রঞ্জিত জাহাজে তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর বেকাব সাহেবের সাক্ষাৎ করি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বেকার আমাদের দুজনকে বহু প্রশ্ন করিলেন। সুকুমারের সুন্দর আকৃতি, স্বচ্ছ সরল স্বভাব, উৎসাহী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ভাষণ এখনো আমার মনের কাছে পূর্ণভাবে প্রতিভাত। কয়েকমাস পরে সংবাদ আসিল সুকুমার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হইয়া বহরমপুরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তদনীন্তিন কলেক্টার এ, জি, হ্যালিফ্যাক্স অক্সফোর্ডের এম, এ, শান্ত সুবিচারক সাহিত্যিক নবীন কর্ম্মচারী আমাদের বহুভাবে উৎসাহিত করিতেন। ও সময় সময় তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার ইংরাজী সাহিত্যের গভীর দিকটার পরিচয় দিতেন। তাহার শয়নকক্ষে আমি শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী ভাস্করানন্দের যোগাসনে উপবিষ্ট একটী প্রতিকৃতি দেখিতাম তাহা এত সুন্দর মনে হইত যে বহু অনুসন্ধানের পর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাশীতে বহু চেষ্টার ফলে আমিও এইরূপ একটী প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া গৃহে সাঁদরে সংরক্ষণ করি।

সুকুমারের কর্ম্মে অনুরাগ গভীর। সমস্ত কর্ম্মই দেশের ও জাতির কর্ম্ম বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতেন। সমস্ত প্রশ্ন জাতির কল্যাণের দিক হইতে বিশ্লেষণ করিতেন। বহুদিন বহু কর্ম্মের মধ্যে দেশের ও ইংরাজ রাষ্ট্রের স্বার্থের সংঘাত আমাদের আলোচনার বিষয় হইত। রাষ্ট্রীক বহু দুর্নীতির ও জাতির যাহা অকল্যাণকর তাহার বিষয় কত নির্জ্জন ডাকবাঙ্গলায় কত রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি। বিদেশীয় কোন কোম্পানীর জমিদারীর শাসনের

অনাচার ও তাহার বিষয় গোপন অনুসন্ধান ও প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যকরি করিতে সুকুমারের উৎসাহ আগ্রহ ও পরিশ্রমএর অভাব কোনদিন লক্ষ্য করি নাই। বরং এক এক সময় নিজের স্বাস্থ্য শান্তি ও বিশ্রামের বহু অভাব অগ্রাহ্য করিয়া কিসে দেশের লোকের কল্যাণ হয় তাহারই চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। সমবায় প্রথা কিসে কায্যকরি হয়, বহু প্রশ্ন, কৃষকের কোন কোন নূতন উপায় সমাধান এ সমস্ত বিষয় তাহার আগ্রহ উৎসাহ ও সোৎসাহ আলোচনা আজও আমার হৃদয়ে জাগ্রত।

সুকুমার রাঢ়ের প্রধান প্রশ্ন জলসেচন সমবায় সমিতির সোৎসাহে প্রচলন চেষ্টা আপ্রাণ করিয়াছিলেন। সার্থকতাও অনেকটা হইয়াছিল কিন্তু তদানীন্তন হৃদয়হীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার দেশে কর্ম্মের ও কর্ম্মীর স্থান সামান্য ছিল। তাই সুকুমারের অসমাপ্ত কর্ম্ম অন্যের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়া ব্যর্থ হইল। বিদেশীয়ের রাষ্ট্রে দেশে কল্যাণব্রতীর কর্ম্ম করা সুকঠিন কিন্তু দেশের কাজ ও সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থাঘাতের ভিতরেও অনেকটা দেশ সেবার অবকাশ ছিল। সুকুমার সেই অবকাশে কর্ম্ম করিয়া দেশের কল্যাণের কোনও সুযোগ পাইলে তাহা ব্যর্থ হইতে দিতেন না। ইহার পর আমার ও তাঁহার কর্ম্ম জীবনে মিলন আর হয় নাই।

আমার কর্ম্মজীবনের প্রায় অবসান আসন্ন। আমি তখন জমিসত্ব ও 'জরীপ' বিভাগের শেষ পর্য্যায়ে (ডিরেক্টার অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড সার্ভে) এবং তিনি রেজিস্ট্রি বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা (ইনেস্পক্টার জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেসান) প্রায় ৩১ বছর পরে আবার দুজনে এক সঙ্গে কার্যে যাবার সুযোগ হইল। ১৯০৮ সালের একদিন প্রথম প্রভাতে মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রান্তরে ডাক বাংলোর কথা মনে করিলাম। আমি নীলকুঠী ও জমিদারী মালিক পাটকে-বাড়ীর কুঠিয়ালের সহিত জনগণের বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ায় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৫ ধারা এক মকর্দ্দমায় শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনায় স্থানীয় পরিদর্শনে আসিয়াছি। সুকুমার ও আমার সঙ্গে আসিয়াছিল। ঐখানে সুকুমারের পিসশ্বশুর জমিদার অনুকূল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করি। যখন ফিরিলাম সমস্ত মাঠ ঘাট চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত আমাদের নবীন বয়স সমস্ত জীবন সম্মুখে উৎসাহ উদ্যম জ্ঞানস্পৃহা ও দেশকে ও দশকে জানিবার ও তাদের কোন্ কল্যাণ আমাদের দ্বারা সম্ভব এই আলোচনা হইয়াছিল। ৩১ বৎসর পরে ১৯২৮ সালে আবার দুজনে একসঙ্গে মফস্বল করিলাম। সরকার বাহাদুরের আদেশে রেজেষ্ট্রেশান অফিসারদের দ্বারা সত্বলিপি পরিবর্ত্তন করা যায় কিনা তাহার সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ডায়মণ্ড হারবারে রেজিস্ট্রি আফিসে গিয়া উভয়ে পরিদর্শন করিলাম কর্ম্মের শেষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন কালে এক বৃক্ষ তলে বসিলাম। বাংলার সন্ধ্যা বিস্তীর্ণ আকাশের নিম্নে বিস্তীর্ণ মাঠের শেষে সূর্য্য

নামিতেছেন দিনান্তে কার্য্যের অবসানে। আমার কর্ম্মজীবন প্রায় অবসান্ সুকুমারও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ঐ গৌরবময় পদ ত্যাগ করিয়া দেশসেবার জন্ত রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প করিতেছেন। বহু আঘাত নিরাশার পর জীর্ণ ক্লান্ত মন। সেই ৩১ বৎসরের কথা মনে করাইয়া দিল। আবার রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিলাম সমস্ত অতীতের দৃষ্টি মনে পড়িল।

"দেবী! অনেক ভক্ত এনেছে তোমার চরণ তলে
অনেক ভাগ্যমানি
আমি অভাগ্য এনেছি কেবল নয়ন জলে
ব্যর্থ সাধনাখানি
তুমি জান দেবী মনের বাসনা সাধ ছিল যত সাধ্য ছিল না
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা দিবস নিশি—"।
ভেবেছিনু যাহা হয়ে গেল আর
গড়িতে ভাঙ্গিয়া গেল বারবার
আলোকে আঁধারে ভালোয় মন্দে
গিয়াছে মিশি—।

বহু কথায় আলোচনা হইল জীবনে কত ব্যর্থতা কত নির্ম্মমতা উভয়ে অনুভব করিলাম। মনে পড়িল বিলেত যাওয়ার পথে তাহাকে জাহাজ হইতে যে কথা লিখিয়াছিলাম

কত সুখছিল হয়ে গেছে দুখ
বান্ধব কত হয়েছে বিমুখ
ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক উন্মুখ ভালোবাসা।

দেশের দশের বা ব্যক্তিবিশেষের কোনও অকল্যাণে কোনও দিন লিপ্ত ছিলাম না। ইহাই একমাত্র শান্তি ও ভগবানের অশেষ দয়া। ইষ্টবঙ্গ রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এইটুকু সম্পদ জীবনের অমূল্য পাথেয়।

আমাদের জীবনের প্রারম্ভে যে বহরমপুর দেখিয়াছিলাম এখন আর তাহা নাই। তখন মানুষের মধ্যে মনুষত্ব ছিল বন্ধুর ভিতরে আন্তরিকতা ছিল জীবন পদ্ধতিতে ও প্রকাশে সৌষ্ঠব ছিল ব্যবহারে সম্ভ্রব ছিল। শ্রেষ্ঠ ব্যবহাজীব বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়, প্রাতঃ স্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্বর্গীয়া রাণী আন্নাকালী এমন কি নবাব মুর্শিদাবাদ ও জিয়াগঞ্জের জৈন সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের ও ধনের প্রকাশ ছিল, ভদ্রতায় শিষ্টাচারেও মনুষ্যত্বে। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক হীরালাল হালদার অধ্যাপক নাগ মুর্শিদাবাদের

গৌরব ও তাহার সুসন্তান পরম শ্রদ্ধাস্পদ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী কেবলমাত্র জ্ঞানের আধার ছিলেন না মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রতীক ছিলেন।

এই সমস্ত স্মৃতির ভিতর সহকর্ম্মী ও সহযোগী বন্ধু হিসাবে সুকুমারকে আমি স্মরণ করি। তাঁর দেশ প্রেমের সদব্যবহারের সুযোগ দেশের পরম দুর্ভাগ্যে দেশ পায় নাই। পারিবারিক জীবনে বহু মর্ম্মান্তিক আঘাত তাহার কোমল স্নেহময় জীবনকে বেদনা দিয়াছিল তাহাও জানিতাম।

সুকুমারের সঙ্গে জগতের সামঞ্জস্য হয় নাই, যে প্রাণবাণ প্রাণহীনের অঙ্কে তাহার সামঞ্জস্য হয় না। যে কোমল নির্ম্মমের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। যে অমলিন মলিনতার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় না। সুকুমার তাই দেশের কেন্দ্রে হয়তো পারিবারিক কেন্দ্রেও অপরিচিতের মত রহিয়া গেলেন এবং অপরিচিতের মতই মহাপ্রয়াণ করিলেন। সে পরিচিত অপরিচিতের আর দেখা আমরা পাব না।

"আর পরিচিত মুখে আমাদের সুখে দুঃখে দেবেনা সে দেখা"

আমি ভগবৎ দয়ায় বিশ্বাস করি আমি তাঁর বিচার সত্যতায় বিশ্বাস করি। তাই আমার স্থির বিশ্বাস সুকুমারের বহু সুকুমার প্রেরণা কোন না কোন জগতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবেই।

ব্যর্থ হয় নাই প্রভু সে সকল ধন
আপনি সকলি তুমি করেছ গ্রহণ

এই বিশ্বাসে সুকুমারের ভবিষ্যৎ আমি স্মরণ করি। তাঁর অশরীরী আত্মাকে আমার স্নেহাশীষ নিবেদন করি।

৪, গেষ্পেল রোড — রায় বাহাদুর শ্রীবিজয় বিহারী মুখোপাধ্যায়।
অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টার অফ ল্যাণ্ড রেকর্ড ও সার্ভে।

আমাদের সুকুমার

সুকুমার আমার চেয়ে ১॥০ বৎসরের ছোট ছিল তাই বুঝি আমার তার বিষয় কিছু লিখবার আদেশ পুষ্প মা দিয়েছেন। সুকুমার বয়সে আমার চেয়ে ছোট কিন্তু আর সব বিষয়ে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। সেইভাবেই আমি তাকে দেখতাম। শৈশবে ভাই বলেই জানতাম কিন্তু পরে বন্ধুভাবে পেয়েছিলাম। দুইএর সংমিশ্রণে এমন মধুর সম্বন্ধ আমাদের গড়ে উঠেছিল যে তা বর্ণনাতীত। তাকে কাছে পেলে যেন স্বর্গসুখ পেতাম। তার সরল,

সপ্রতিভ, আনন্দদীপ্ত মুর্ত্তিখানি এখনও চোখের সামনে রয়েছে যা দেখলে মর্ত্তে সমস্ত দুঃখ ভুলে যেতাম। সে যে এত শীঘ্র এ ধরাধাম ছেড়ে চলে যাবে তা কখনও ভাবি নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য তাঁরই নিকট অমরলোকে চলিয়া গেল। দেশ তাহার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিল কিন্তু তার আরও অনেক যে দিবার ছিল। "Those whom the gods love die young." একথা সুকুমারের বিষয়ও প্রযোজ্য।

সুকুমারের বাল্যজীবন বাঁকুড়ার বাহিরে অতিবাহিত হইয়াছিল সুতরাং তাহার বাল্যজীবনের কথা আমার বিশেষ জানা নাই। জ্যেঠামহাশয় (সুকুমারের পিতাঠাকুর) যখন বাঁকুড়া আসিতেন তখন ছেলে মেয়েদের লইয়া বাঁকুড়ায় নিজের পৈতৃক বাড়ীতে থাকিতেন; পরে তিনি নিজে দ্বিতল বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। যখন তিনি আসিতেন ছেলেরাও সঙ্গে আসিত। তখন আমাদের বংশের গৌরব সূর্য্য মধ্যাহ্ন আকাশে। একদিকে কাকা মহাশয় শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য প্রতিভার খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতেছিল! অন্যদিকে বাঙ্গলায় জ্যাঠামহাশয়ের কর্ম্মজীবনের খ্যাতি বাঙ্গলায় বিস্তারলাভ করিতেছিল। তাঁর ছেলেরাও কাল ক্রমে বিদ্বান ও যশস্বী হইবে তাহার সূচনাও পাওয়া যাইতেছিল। ছেলেরা বিদ্যালয়ে খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। সুকুমার এন্ট্রান্স, এফ্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া পাশ হইয়াছিল। ১৯০৪ সালে বি, এ (Honours ইংরাজী সাহিত্যে) এবং ১৯০৬ এ এম্ এ Presidency College হইতে পাশ করে। এম্ এ পাশের পূর্ব্বে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আন্দোলনে জড়িত হওয়ায় সুকুমার খুব উচ্চস্থান পায় নাই। তথাচ 2nd, class এ উচ্চস্থান পাইয়াছিল। তারপর ১৯০৮ সালে Deputy Magistrate এর কাজ গ্রহণ করে। তারপর সরকারী কাজে কিরূপ যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া যশস্বী হইয়াছিল তাহা আজকালকার বাঙ্গালার সকলেই প্রায় জানেন। I. G. of Registration হইয়া চাকরি শেষ হইবার পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করে এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনে কর্ম্মসচিবের পদ গ্রহণ করে। আজীবন রবীন্দ্রের ভক্ত গুরুর প্রেরণা পাইয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে। আর্থিক অনেক ক্ষতি যে সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীনিকেতনের কার্য্যের রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভূয়সী প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ার কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ায় সুকুমার সেখানের কাজ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় Bengal Govt এ Agricultural Development Dept এ কাজ গ্রহণ করে। সেই সূত্রে প্রৌঢ় শিক্ষা (Adult Education), Tank Irrigation প্রভৃতির কাজে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখনও এ বিষয়ে চিঠিপত্র

dictate করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। দেশচিন্তা ও স্বদেশ প্রীতি এতই তাহার মনকে অধিকার করিয়াছিল। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটি সহজপাঠ 'পড়ার বই' সঙ্কলন করিয়া তাহার প্রচলন করিয়াছিল। তখনকার বাঙ্গালা সরকার তাহার প্রৌঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল।

বাঁকুড়াবাসী তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে President Bankura Sammilani ও President, Bankura Development Committee নিযুক্ত করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাঁকুড়ার উন্নতির জন্য সুকুমার সর্ব্বদা সচেষ্ট ও যত্নশীল ছিল।

সুকুমারের কৈশোর বয়সেই আমার বিশেষ পরিচয় হয়। তার আগে কেবল জাঠতুত ভাই বলিয়া জানিতাম। বাঁকুড়ায় পাঠকপাড়ায় আমাদের বাড়ী আর ঘটকপাড়ায় সুকুমারের পৈতৃক বাড়ী। দুই পাড়ার ব্যবধান প্রায় আধ মাইল। সুকুমারের ঠাকুরদাদা গঙ্গানারায়ণ মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর টোল ছিল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রামসদন (সুকুমারের পিতা) ইংরাজী পড়িয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন এবং এম্. এ. পাশ করিয়া Competitive পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Deputy Magistrate হইলেন। সুতরাং সুকুমার বিদ্যা'ও পদে অভিজাত বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অথচ এমন সরল অনাড়ম্বর জীবন খুব কম Deputy Magistrateএর দেখিয়াছি। সুকুমারের পিতা এ বিষয়ে তার আদর্শ ছিলেন বোধ হয়। তিনি Ralli ৪৯নং ধুতি ও পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছু পরিতেন না। অবশ্য আপিসের পোষাক স্বতন্ত্র ছিল। এই পণ্ডিত বংশের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিল সুকুমার।

সুকুমারের বিদ্যানুরাগও সে 'তার পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছিল। ছেলেবেলায় যখন সে বাঁকুড়া পৈতৃক বাড়ীতে আসিত তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিত। সে এরূপ হাবভাবের সহিত আবৃত্তি করিত যে শ্রোতামাত্রই মুগ্ধ হইত। ইংরাজী কবিতার আবৃত্তিও সুকুমার সমান সুন্দরভাবে করিত। বাল্যকাল হইতেই সুকুমার রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ Nobel prize পান নাই। কিন্তু কিশোর বয়সেই সুকুমার রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার কবিতার গুণ ব্যাখ্যান করিত। কত লোকই না তাহার কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

আমার মনে আছে যখন আমি প্রথম সুকুমারের মুখে "নিন্দুকের প্রতি নিবেদন" কবিতার আবৃত্তি শুনি তখন আমার মন এতই রবীন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় যে আমি রাতারাতি সে কবিতাটি মুখস্থ করি এবং পরে রবীন্দ্রের কবিতা পড়িতে আরম্ভ করি। সুকুমারের অল্পবয়সেই এই গভীর রবীন্দ্রপ্রেম তাহার

সাহিত্যে অত্যন্ত প্রিয় পরিচায়ক। সুকুমার সংস্কৃত সাহিত্যেরও প্রেমিক ছিল। কালিদাসের প্রতি সুকুমারের প্রগাঢ় অনুরাগ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সংস্পর্শে হইয়াছিল। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ সুকুমারের পৈতৃক সম্পত্তি। বংশানুক্রমে তাহার পূর্বপুরুষরা সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিয়া আসিয়াছিলেন এবং যশস্বী হইয়াছিলেন। বালক সুকুমার ইচ্ছা করিলেও তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিত না। এখনও বাঁকুড়ায় গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাটী তাহার পিতামহের নামে বিদ্যমান। সুকুমারের পিতা এই চতুষ্পাটীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

সুকুমারের আত্মীয় প্রীতিও বোধহয় তাহার পৈতৃক সম্পত্তি স্বরূপ পাইয়াছিল। সুকুমারের পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামশরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এত ভালবাসিতেন যে তিনি যখন Deputy Magistrate হন তার কিছুদিন পরে পাছে বড় ভাই কখনও কষ্টে পড়েন এবং তিনি সাহায্য করিতে কুন্ঠিত হন সেজন্য একখানি Registered document তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে লিখিয়া দেন যে আজীবন ভাইকে ৫০৲ টাকা মাসে দিবেন। সুকুমারের পিতাঠাকুর নিজের প্রতিজ্ঞা আজীবন পালন করিয়া গেছেন। এ বিষয়ে কখনও দ্বিধা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই যদিও শেষ জীবনে তাঁহার দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। আজকাল এরূপ ভ্রাতৃপ্রেম বিরল। সুকুমারও নিজের ভাইদের সঙ্গে সর্ব্বদা ঐরূপ সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছিল বলিয়া জানি।

সুকুমার মেধাবী ছাত্র ছিল। Eden Hindu হোষ্টেলে থাকিত। Hindu Hostel অভিজাত ছাত্রদের স্থান ছিল। সেখানেও তাহার প্রতিভার সমাদর ছিল। আমি তখন Oxford Mission Hostelএ থাকি। ১৯০৫-৬ সালের কথা। সুকুমারের সঙ্গে প্রায় দেখা হইত। তাহার প্রতিভার খ্যাতি যে ছাত্রমহলে কিরূপ প্রগাঢ় ছিল তাহার সাক্ষ্য দিতে পারি। Tennyson-এর কবিতার music সুকুমারকে বড় appeal করিত। In memoriam কাব্যের অনেক অংশ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং আবেগের সহিত তাহার আবৃত্তি করিতে ভালবাসিত। এখানে একটা কথা লিখিয়া তার কলেজের অধ্যায় শেষ করি।

সুকুমার যে বৎসর M. A. পাশ করে সেই বৎসর আমি B. A. পাশ করি। আমি M. A. পড়িবার জন্য Presidency Collageএ ভর্ত্তি হই। আমার পাছে বই কিনিতে কষ্ট হয় সেজন্য সুকুমার সমস্ত ইংরাজি সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক আমায় অযাচিত ভাবে দিয়াছিল। সমস্ত পুস্তকগুলি বেশ দামী—যেমন Taines—History of English Literature, Dowden's—Shakespeare—his Mind and Art, Shaw's English Language

প্রভৃতি। এ সমস্ত পুস্তক আমি কিনিয়া পড়িতে পারিতাম কি না সন্দেহ এবং এগুলি না পড়িলে ইংরাজি সাহিত্যে অনুরাগও হইত না। M. A. পাস করার পর আমি সমস্ত বইগুলি কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে প্রত্যর্পণ করি। ভাই বলিয়া আমায় সুকুমার বইগুলি দিয়াছিল তথাচ আজ কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিতেছি। কলেজ হইতে বাহির হইবার পর সুকুমার এবং ১৯০৮ সালে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া কিছুদিন সুকুমার কোথায় কোথায় ছিল তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তবে মাঝে মাঝে তাহার দেখা পাইতাম। তখন তাহার সাহিত্যচর্চ্চা খুব জোরে চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একেবারে মগ্ন থাকিত।

১৯১৩ সালে আমি Bengal Secretariatএ Upper divisionএর clerkship গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় থাকি। তখনই সুকুমার Asst. Secretary হইয়া কলিকাতায় পুনরায় আসে এবং পৈতৃকবাটীতে ভবানীপুরে থাকে। সে সময় আমার সহিত রোজ দেখা হইত। আমি Political Deptএ কাজ করিতাম এবং সুকুমারও সেই Dept এর Asst. Secretary ছিল। Office এর কাজ সমস্ত দক্ষতার সহিত করিয়াও তাহার অনেক সময় অবশিষ্ট থাকিত। তখন আমরা তাহার কামরায় বসিয়া গল্প সল্প করিতাম এবং সময়টা বড় আনন্দে কাটিত। কিন্তু মানুষের সব সুখ হয় না। সুকুমারের সঙ্গ পাইয়া আমি যে সুখ পাইতাম তাহা অল্পস্থায়ী হইয়াছিল। আমার স্বাস্থ্য কলিকাতায় ভাল থাকিল না। আমি Secretariat এর চাকরি পরিত্যাগ করিয়া ওকালতি করিব এইরূপ স্থির করিলাম। সুকুমারও তাহার Secretariat training সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণনগরে Deputy Magistrate হইয়া চলিয়া গেল। তখন আবার আমার পিতা কৃষ্ণনগরে Jailor. সুতরাং আমি কখনও কখনও তাহার দেখা পাইতাম। আমার জীবনের সে অংশটা বড় দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে কাটিয়াছিল। চাকরি করিব, না ওকালতি করিব, ইহা লইয়া মনে অনেক যুদ্ধ হইত। সুকুমারের পরামর্শ চাকরি পরিত্যাগের পক্ষে ছিল না, কিন্তু যখন আমার কলিকাতায় থাকা অসম্ভব হইল তখন সেও আমার মতে মত দিয়াছিল। যেদিন কৃষ্ণনগর হইতে বিদায় লইয়া আমি চলিয়া যাই এলাহাবাদে ওকালতি করিতে সেদিন আমার জীবনের বড় পরীক্ষার দিন। সুকুমার অশ্রুসিক্ত নয়নে আমায় বিদায় দিয়াছিল এবং আবার কখন তাহার দেখা পাইব এই চিন্তায় মন একেবারে বিদীর্ণ হইতেছিল। তাহার পর কিছুদিন পরে এলাহাবাদে সুকুমার ও বসন্ত দুই জনেই দেশ ভ্রমণে আসে, তখন আবার সুকুমারের দেখা পাই। সেটা ১৯১৪ সালের December মনে হয়। তারপর বহু বৎসর সুকুমারের দেখা পাই নাই। সে বাঙ্গলায় বহুস্থানে কর্ম্ম করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহার পরিচয়

সরকারি কাগজপত্রে পাওয়া যাইবে। ১৯২০।২১ সালে সুকুমার বাঁকুড়ায় Sadar Sub Divisional Officer হইয়া বদলি হয়। তখন আমিও কোন কার্য্যক্রমে বাঁকুড়া গিয়া তাহার আবার দেখা পাই। তাহার পর দীর্ঘ ১২ ১৪ বৎসর আর দেখা হয় নাই।

আমার কর্ম্মস্থান Hoshangabad মধ্যপ্রদেশ—সেখান হইতে কখনও বাড়ী আসিলে বা কলিকাতা গেলে সুকুমারের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা ছিল। ১৯৩৪ সালে আমার পিতার মৃত্যুর পর যখন আমি দেশে যাই কলিকাতায় তখন সুকুমারের সঙ্গে তাহার পৈতৃক বাটী ভবানীপুর—হরিশ মুখার্জ্জী রোডে দেখা হয়। সে বৎসর তাহার একটি পুত্রের বিবাহ হয়। আমি তখন, কলিকাতায় উপস্থিত ছিলাম। তারপর আবার মস্ত gap পড়িল। যুদ্ধের পর ১৯৪৪ এর শেষে আমি কলিকাতা আসি। তখন বালীগঞ্জ প্লেসে তাহার বাটিতে সুকুমারের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। আমি হাওড়ায় আমার ভ্রাতার বাসায় নামি। পাছে আমার তাহার বাসা খুঁজিতে কষ্ট হয় সেজন্য সুকুমার একটি লোক আমার সঙ্গে যাইবার জন্য হাওড়ায় পাঠায়। তার বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল দেখিলাম। নৈহাটীতে সুকুমার ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির Executive Officer কার্য্যগ্রহন করিয়াছিল শ্রীনিকেতনের কাজ ছাড়িয়া আসিবার পর। সেখানে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তারপর তাহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সারে নাই বলিয়া মনে হয়।

তাহার বাড়ীতে অনেকক্ষণ বসিয়া কথাবার্ত্তা হয়। আমার বিষয় জানিতে চাহিল। আমি সব কথাই বলিলাম। তখন ভাবি নাই যে তাহাই আমার সহিত তাহার শেষ দেখা। কলিকাতা হইতে যখন C. P. তে প্রত্যাবর্ত্তন করি সুকুমার ফোনে আমায় বিদায় দিয়াছিল। তাহার আবেগপূর্ণ বিদায় অভিবাদন এখনও আমার কাণে ঝঙ্কৃত হইতেছে। তাহার কণ্ঠধ্বান আর মরজগতে শুনিতে পাইব না। অমরলোকে হয়ত আবার শুনিব।

বাল্যকাল হইতেই সুকুমার ভাবপ্রবণ ছিল। সুতরাং যখন বঙ্গবিচ্ছেদের আন্দোলন ১৯০৪-৫ সালে দেশের মন আলোড়িত করিল সুকুমারের মনও স্থির থাকিতে পারেল না। Boycott of British goods এর আন্দোলনে যোগ দিল। আমরা দুই বন্ধু বাঁকুড়ার রাস্তায় রাস্তায় Manchester goods কেনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতাম। সুকুমার সরকারি চাকরি লইয়াছিল বটে কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতি চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করে নাই। তাই সরকারি কাজ করিতে করিতে যখনই দেশ কোন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, সুকুমার নিজের শক্তি সামর্থ ও সমস্ত ক্ষমতা দেশের সেবায় লাগাইয়াছে। তাই দেখিতে পাই যে বীরভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে,

খাদ্য ও পানীয়ের অভাব বিমোচনে গোপালগঞ্জের কচুরীপানা ধ্বংস কার্য্যে এবং ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতি বিধান কার্য্যে সুকুমার প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিল। ১৭৪৭ সালে বসন্তকুমার (সুকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) আমায় লেখেন, "দাদা উপস্থিত ভাল আছেন। নূতন সরকার যাহাতে বাঁকুড়াতে Irrigation work আরম্ভ করে তার জন্য দাদা খুব খাটিতেছেন।" সুকুমারের স্বাস্থ্য তখন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে তথাচ সুকুমার বাঁকুড়ার কাজকে first privilege দিত। যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখনও Tank irrigation প্রভৃতির বিষয় সরকারের নিকট চিঠিপত্র dictate করিয়া গিয়াছে। এতই কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও একনিষ্ঠ মন সুকুমারের ছিল।

সরকার তাহার কার্য্যকুশলতার জন্য সুকুমারকে M. B. E এবং পরে Rai Bahadur পদবী দিয়াছিলেন। কিন্তু সুকুমার কংগ্রেসের আহ্বানে পদবী ত্যাগ করে। সরকারি কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা দেশভক্তি ও সাহসের পরিচায়ক।

এমন একটি প্রতিভাবান পুরুষের অকাল মৃত্যু দেশের পক্ষে একটি দুর্ভাগ্য এবং বাঁকুড়াবাসীর পক্ষে ত বটেই। যে বয়সে প্রতীচ্য দেশে মানুষ শ্রেষ্ঠ অধিকার পাইয়া দেশসেবা করে সে বয়সে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে মানুষের জীবন শেষ হয়। দুঃখ করিয়া কি হইবে, প্রতিকার যে আমাদের হাতে এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হাতে। শাস্ত্রে বলে মৃতের জন্য শোক করিও না। কিন্তু মৃত্যু যে একটা কঠোরসত্য তাহা ভুলিব কি করিয়া।

সুকুমার Tennyson কবির ভক্ত ছিল। তাঁহার In Memorium হইতে দুইটি stanza উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বন্ধুবরের জীবনী হইতে কিছু উপকৃত হইবেন এই ভরসায় এই কটি কথা লিখিলাম। ভাষায় ভুল হইলে সুধীপাঠক ক্ষমা করিবেন।

So many worlds, so much to do,
So little done such things to be,
How know I what had need of thee,
For thou wert strong as thou wert true?
The fame is quenched that I foresaw,
The head hath missed an earthly wreath:
I curse not nature no, nor death;
For nothing is that errs from law.

B. Chatterji MA, LLB
Advocate Hosangabad C. P,

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডিত্যে সুকুমার

জন্মান্তরবাদে হিন্দুমাত্রেরই সংস্কারগত দৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থে এবং বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে জীবের জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। কেহ বা জরায়ুজ হয়, কেহ বা স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়। পশ্চাবিদ্যা এই মত স্বীকার করেন না। পুনর্জন্ম কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবের ক্রমোন্নতিই স্বাভাবিক। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে মনুষ্যেতর জন্মলাভ করা অস্বাভাবিক। সুতরাং মানুষ জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, অমৃতত্ব লাভ করাই তাহার লক্ষ্য। মৃত্যুর পরে স্বর্লোকে দীর্ঘকাল বাস করিয়া, মানুষ আবার সংসারে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া এবং নূতন কর্ম্মসঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করে। জগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহার আত্মোন্নতি সাধিত হয়। স্বর্গলোকের স্থিতি দীর্ঘকাল। পৃথিবীতে যাহাদের সহিত ভালবাসা সূত্রে আবদ্ধ থাকে, স্বর্গে তাহাদের সহিত একত্র বাস করার পরে জীব পৃথিবীতে আসিয়া পুনরায় অতি নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। জগতে যখন দেখা যায় যে কোথায় কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার কোন স্থিরতা নাই, কিন্তু কর্ম্মসূত্র তাঁহাদের মধ্যে এমন বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছে যে দেহান্তেও তাহা ছিন্ন হইবার নহে।

প্রিয় বন্ধু সুকুমারবাবুর মৃত্যুতে যখন মুহ্যমান ছিলাম তখন এই চিন্তাই সর্ব্বদা মনে উদিত হইয়াছে। কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সর্ব্বদা একসঙ্গে বাস করা সম্ভবপর হয় নাই। জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে চিঠিপত্রেরও আদান-প্রদানও ব্যাহত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম পরিচয়ে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল তাহার কখন কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। যেন চিরপরিচিত দুই বন্ধুর দীর্ঘপ্রবাসের পরে সাক্ষাৎ। সেই প্রথম আলাপের পর হইতে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল একইভাবে কাটিয়াছে। আজ সেই জীবনস্মৃতি কথায় প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, মনে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে বল নাই। যাহা হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে বর্ত্তমান থাকিয়া, বর্ত্তমানের আলো, ভবিষ্যতের আশা, অতীতের সুখস্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার বস্তু নহে, ভগবানের চরণে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইবার বিষয়।

অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় কর্ম্মের অংশ মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মরূপে মানবজীবনে প্রকাশিত হয়। প্রাক্তন সংস্কার ফল দ্বারা ব্যক্ত হয়। বন্ধুবরের কর্ম্ম বহুল জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হইবার যে সুযোগ আমার বর্ত্তমান ছিল, তাহা হইতে দেখিয়াছি যে স্বার্থ-বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থে তাঁহার জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল। অর্জ্জন-রক্ষণ-পালন ধর্ম্মাত্মক যে সকল কর্ম্মের সহিত আমাদের

নিত্যপরিচয়, যাহার ব্যর্থতায় আমাদের দুঃখ, সার্থকতায় আমাদের সুখ, যে সকল কর্ম্ম অবশ্য করণীয় হইলেও নিরাশী, নির্ম্মমচিত্তে তাহাদের অনুষ্ঠান করাই ছিল তাঁহার প্রকৃতি। দেশের হিতের জন্য, দশের মঙ্গলের জন্য, জগতের শুভ কামনায় মেঘের বৃষ্টিধারার ন্যায়, জাতিধর্ম্ম দেশকাল নির্ব্বিশেষে তাঁহার কর্ম্মবারি বর্ষিত হইত। নিজের পরিবারগণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গ এমন কি স্বীয় সম্প্রদায়কেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার কর্ম্মধারা যে মহান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইত, তাহা প্রায়শঃই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া তাঁহার অন্তরে কল্যাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়াছিল। গীতাই ছিল তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় তাঁহার সকল কর্ম্মের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। কেবলমাত্র "বিহারশয্যাসনভোজনেষু" নহে—প্রশস্ত নদীবক্ষে গবর্ণমেণ্ট ষ্টীমারের নির্জন কক্ষে বিভিন্ন দেশস্থিত ডাকবাঙ্গালার নির্জ্জন গৃহে গভীর নিশীথে, দূরগামী রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর নির্জন কামরায়, আমাদের যে সকল আলোচনা হইত, তাহা হইতে তাঁহার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। সময় কাটাইবার জন্য লোকে এ অবস্থায় কত প্রকার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লয়, আমাদের তাহা দরকার হইত না। আলোচনা কখন কখনও এত গভীর হইত যে সময়ের জ্ঞান থাকিত না।

একদিন এই অবস্থায় বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "গীতার, মেঘদূতের ও রঘুবংশের প্রধান শ্লোক কোন্ কোন্‌টি এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা কি?" অন্য একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জন্মান্তরবাদ বিশ্বাসযোগ্য কিনা। মূলধন ব্যতীত বা অল্প মূলধন লইয়া কি প্রকারে জীবিকা অর্জন করা যায়? কৃষি ও শিল্প ইহাদের মধ্যে উৎকর্ষ কার? শিক্ষার বাহন জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত কিনা?" কত আর বলিব। যাহা লইয়া দিনের পর দিন কাটিয়াছে তাহা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান কোথায়? আলোচনার নমুনা স্বরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব।

গীতার প্রধান শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে "চারিটি শ্লোক আমি উদ্ধার করিব, প্রধানটী আপনি স্থির করিবেন।" বলা বাহুল্য এই সকল আলোচনার সময় বই থাকিত না এবং থাকিলেও তাহা দেখা নিষিদ্ধ ছিল। বন্ধুবর বলিতেন, "বই দেখে আলোচনা theatreএর rehearsal এর সমান। বিষয় যদি মনে না থাকে আলোচনা নিষ্ফল।" সংস্কৃত কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতা বিষয়ে তাঁহার যে স্মরণশক্তি ছিল তাহার তুলনা হয় না। আমি, "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ" বলিবামাত্র তিনি ৪।৫টী শ্লোক পর পর আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছেন আমারও এই মত, কিন্তু বহু

কৃতবিদ্য লোক বলিয়ে, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই উক্তিই গীতার সারমর্ম।" এই ভগবদুক্তির প্রাধান্য আমি স্বীকার করি, কিন্তু ইহা দ্বারা সাধারণ লোক উপকৃত হয় না। তাহারা প্রয়োজন ব্যতীত কর্ম্ম করে না।" "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে, পরে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু," "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" প্রভৃতি শ্লোকের আলোচনা হইয়াছিল। অনেক যুক্তির অবতারণা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। দুইজনে একমত হইয়া প্রথমেই যাহা বলা হইয়াছিল তাহার প্রাধান্য বজায় রহিল।

মেঘদূত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে বন্ধুবর বলিলেন, 'উৎসঙ্গে বা মলিন বসনে সৌম্য! নিক্ষিপ্য বীণাং' এই শ্লোক আমার ভাল লাগে।" আমি বলিলাম এই শ্লোকের diction ভাল কিন্তু 'মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতোঃ,' 'ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্,' 'শ্যামাস্বঙ্গং চকিত হরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং,' 'ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং' প্রভৃতি শ্লোক অধিকতর ভাবব্যঞ্জক এবং চিত্তাকর্ষক।" এই উপলক্ষে তিন ঘণ্টাব্যাপী যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল তাহাদ্বারা যে জ্ঞানের প্রসার ব্যঞ্জিত হইয়াছিল তাহা অতীব বিস্ময়কর।

রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ শ্লোক সম্বন্ধে বহুদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলোচনা হইয়াছিল। পূর্ব্বপক্ষ হইবামাত্র আমি বলিলাম, "এখানে বিচারকার্য্য সহজে সম্পন্ন হইবার নহে। পুষ্পকরথ হইতে রামচন্দ্র প্রয়াগতীর্থের যে দৃশ্য তাঁহার প্রিয়তমাকে দেখাইয়াছিলেন তাহা কাব্য জগতে অমর।

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা'—

এই শ্লোক হইতে 'পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতিগঙ্গা, ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ।'

এই চারিটি শ্লোকে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই প্রকার দৃশ্যপটের সহিত মানুষের সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় রাজশ্রীভ্রষ্টা অযোধ্যার বর্ণনার তুলনা কোথাও নাই।

"নিশাসু ভাস্বৎকল নূপুরাণাং" হইতে আরম্ভ করিয়া

* * * * *

"উপান্ত বাণীর গৃহাণি দৃষ্টা

শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি॥" এই একাদশটী শ্লোকে কবি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা বর্ণনার অতীত।

বন্ধুবর ইহাতে আপত্তি না করায়, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্লোকটি নির্ব্বাচিত

করিতে তাঁহাকে আমি অনুরোধ করি। তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া তখনই একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তাহাতে আমার বলিবার কিছুই ছিল না। নির্ব্বাচন এমন সুন্দর হইয়াছিল যে শ্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম :

স্তম্ভেষু যোষিৎ প্রতিযাতনানা
মুৎক্রান্তবর্ণ ক্রমধূসরণাম্।

স্তনোত্তরীয়ানি ভবন্তি সঙ্গাৎ
নির্মোকপট্যঃ ফণিভির্বিমুক্তা॥

(অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে) স্তম্ভের উপরে যে সকল দারুময়ী নারী প্রতিকৃতি ছিল, কালক্রমে তাহাদের বর্ণবিন্যাস লোপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা ধূসরবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের উপর সর্পনির্ম্মুক্ত কঞ্চুক সকল পতিত হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন স্তনাবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সাপের খোলস বুকের কাঁচুলির স্থান অধিকার করিয়াছে এবং সাপের খোলস এখন স্তনাবরণের কার্য্য করিতেছে। ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে সেজন্য আর অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল না। যাঁহারা এইসকল বিষয় অবগত আছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে অতলস্পর্শ সমুদ্র হইতে রত্নরাজি উদ্ধার করার ন্যায় এই ব্যাপারগুলি কত কঠিন। আমাদের উভয়ের বন্ধু নলিনীবাবু এইসকল বিষয়ের কথঞ্চিৎ অবগত আছেন। কালচক্রের আবর্ত্তনে তিনি এখন কোথায় তাহাও জানি না। যদি এই লেখা তাঁহার গোচরীভূত হয় তবে তিনি সংবাদ দিলে সুখী হইব।

কবিকুঞ্জর রবীন্দ্রনাথকে তিনি কেবল গুরুদেব সম্বোধন করিতেন তাহা নহে গুরুদেবের মত ভক্তি করিতেন। গুরুদেবের কবিতা প্রায় সকলগুলিই তাঁহার মুখস্থ ছিল। অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি Bradley হইতে বলিলেন, "Superior poetry is characterised by vague suggestiveness" ইত্যাদি (Oxford lectures on Poetry). আমি বলিলাম, "অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাই 'ধ্বনি' নামে খ্যাত। "বাচ্যাতিশায়নিব্যঙ্গে ধ্বনিস্তৎ কাব্যমুত্তমম্"; দর্পণকার লিখিয়াছেন ইহা বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যাইত না। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রবর্ত্তক। সাগরিকা, সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, বলাকা, জীবনদেবতা, সিন্ধুপারে, অনন্তপ্রেম প্রভৃতি কবিতার ধ্বনিগৌরব বাঙ্গালা কবিতার অমূল্য সম্পদ। কত কত দিন এই বিষয় লইয়া সময় কাটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই ছিল একশ্রেণীর আলোচনা। কিন্তু যখন গভীর আলোচনার প্রবৃত্তি

জাগিত তখন রস, ধ্বনি প্রভৃতি-আলোচনার বিষয় হইত। মনে আছে এক দিন জীবনদেবতার আলোচনায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল।

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি' অন্তরে মম।"

অন্তরতম কে ও আমি কে? সমালোচকগণ কত প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি অর্থে দেহ নহে। দেহটী উপাধিমাত্র। সুতরাং আমি অর্থে জীব। আত্মা, বুদ্ধি ও মন লইয়া জীব। তাহা হইলে অন্তরতম কে? আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম,

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ॥"

সর্ব্বদাসংযুক্ত, তুল্যনামবিশিষ্ট দুইটী পক্ষী একই বৃক্ষে বাস করে। একটী বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল (সুখ ও দুঃখ) ভোগ করে, আর,

"অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি"

অন্যটী ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। এই দ্রষ্টাই অন্তরতম জীবন দেবতা, পরমাত্মা। বন্ধুবর ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন অনেক দিনের সন্দেহের আজ মীমাংসা হইল।

'গুরুদেবের শ্রেষ্ঠ কবিতা কোনটী এই সম্বন্ধেও অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইয়াছিল. ধ্বনি গৌরব না থাকিলেও রসই যখন কবিতার প্রাণ তখন উর্ব্বশীর অপূর্ব্ব শব্দ নির্ব্বাচন ও শব্দবিন্যাস (diction) মানসসুন্দরীর "কল্পনার স্বর্গীয় জ্যোতি," তাজমহলের "নিত্য উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস সকরুণ আকাশ" প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া "বিদায়ের অভিশাপ" শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

গুরুদেবের কোন কবিতায় ইংরাজী কবিতার ছায়াপাত হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম "ইংরাজী কবিতা বেশী পড়ি নাই, কিন্তু মনে হয় 'বিজয়িনীর' সঙ্গে **Lyly'র Cupid and Campaspe** এর তুলনা করা যাইতে পারে। বন্ধুবর বলিয়াছিলেন "ভাবের ছায়ামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু 'বিজয়িনী'তে কামের পরাভব আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়। কামের অশ্রুত্যাগ করা ব্যতীত আর উপায় ছিল না?

Tennysonএর **De Profundis** কবিতাটী তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'যেন উপনিষদের ছায়া তাহার উপর পড়িয়াছে,' এই কথা তাহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি।

আজ জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়া মনে যে দুঃখ জাগিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার নয়। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাকে গীতার একটী ব্রহ্মবিদ্যা

সংস্করণ লিখিতে অনুরোধ করেন। তিন বৎসর পরে সেই বিষয়টী আজ প্রস্তুত হইয়াছে। কাগজেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। হয়ত ছয়মাসের মধ্যেই পুস্তক প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাঁহার হাতে দিতে পারিলাম না। ইহাই পরমদুঃখের বিষয়।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের অনেক অধ্যায় অনেকেই রচনা করিবেন কিন্তু তাঁহার মানসিক সম্পদের বিষয় সকলে অবগত না থাকিতে পারেন। সেজন্য অতি সংক্ষেপে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইংরাজী, বাংলাও সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষতঃ কালিদাসের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা হইতে তিনি কখন বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই। উপযুক্ত স্থলে তিনি উপযুক্ত উত্তর দিতে সর্ব্বদা বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। এই brilliant repartee কতস্থানে দেখিয়াছি তাহা বলা যায় না। সরকারী নানা বিভাগে কাজ করিবার পর আবার যখন বিচার বিভাগে আসিলেন তখন একজন বন্ধু রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আইন টাইন মনে আছে ত ;" তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেন—

"তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।"

হংসগণ যেমন শরৎকাল উপস্থিত হইলে মানস সরোবরে যায়, মহৌষধি যেমন রাত্রিকালে স্বতঃই দীপ্তিমান হয় তেমনি—ইত্যাদি অর্থাৎ কার্য্যকালে জন্মবিদ্যা অর্থাৎ পূর্ব্বে আলোচিত বিদ্যা আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

তাঁহার জীবনের বজরা কখন খাল, কখনও বিল, কখনও বা নদীপথে যে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, জীবনে কখনও তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। সমাজের প্রধান সমস্যাই জীবিকা সমস্যা তাহা তিনি ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন। ধর্ম্ম মানুষ মাত্রেরই আচরণীয় কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করা চলে না তাহা তিনি বুঝিতেন। সুতরাং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তিনি সাধারণকে জীবিকা অর্জ্জন চেষ্টা কিসে সফল হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন। কুটির শিল্প, কৃষি প্রতিষ্ঠান, ফলের বাগান প্রভৃতি তাঁহার কথায় আরম্ভ করিয়া অনেকেই ফল পাইয়াছেন। এই উপলক্ষে সরকারী সাহায্যও তিনি অনেকস্থলে দিতে পারিয়াছেন। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই। গুরুদেবের কথায় তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।"

জীবনে তিনি সর্ব্বদাই এই সত্য পালন করিয়াছেন। "অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়" দিকে দিকে তাঁহার কর্ম্মধারা ধাবিত হইয়াছিল। এমন কোন

শুভ কর্ম্ম তাঁহার গোচরে আসে নাই যাহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল না। এমন কোন যোগ ছিল না যাহা পরহিতে সংঘটিত হয় নাই, এমন কোন পদার্থ ছিল না যাহাতে সার্ব্বজনীন ভাব ছিল না, এমন কোন ভাব দেখা যায় নাই যাহা শ্রেয়ঃ পথ অনুসরণ করে নাই, এমন কোন শ্রেয়ঃ ছিল না যাহার প্রতি তাঁহার চেষ্টা ধাবিত হয় নাই, এমন কোন চেষ্টা ছিল না যাহা জয়শ্রীমণ্ডিত হয় নাই। এই প্রকার আদর্শে তাঁহার জীবন অনুপ্রাণিত ছিল।

তাঁহার পরলোকে গমন শিশির বিন্দুর সমুদ্রে গমনের ন্যায় অনন্তে মিশিয়া যাওয়া এই বিষয় চিন্তা করিলে ঋষিবাক্য মনে আসে। প্রার্থনা করি যেন নামরূপ হইঁতে মুক্ত হইয়া তাঁর ব্রহ্মে বাস বিহিত হয়।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ
স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

যশোহর। শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ

বন্ধুপ্রাণ সুকুমার

পরম কল্যাণীয়াসু

মা পুষ্প তোমার প্রেরিত সুকুমারের জীবনী ও তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। নানা কারণে উত্তর দিতে দেরী হল। আমার হাতটা এখনও কষ্ট দিচ্ছে ওঠাতে নামাতে পারিনা তাই splint টা এখনও সম্পূর্ণ খোলে নাই কতদিনে এ বন্ধন দশার মোচন হবে জানিনা। এরই জন্যে কোথাও যেতেও পারিনি। বিনোদ বাবুর মুখে তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদ পাই। তুমিযে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি একত্রকরে একটা সংক্ষিপ্ত কর্ম্মবিবরণী ছাপিয়ে শ্রাদ্ধের দিন সবাইকে দিয়েছ এতে আমার যে কত আনন্দ হয়েছে তা বলবার নেই। এই স্মৃতি তর্পণই প্রকৃতশ্রাদ্ধ। আমি জানি তুমি ও শান্তনু তোমাদের বাবাকে কতখানি ভালোবাসতে কতটা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে। অত দুঃখের মধ্যেও শেষ সময়ে তোমাদের অক্লান্ত সেবা পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন ও মৃত্যুর পরেও সেই অমর ধাম থেকে নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছেন। প্রবাসী ও বসুমতীতে তোমার বাবার বিষয় লিখেছে দেখেছি তুমি যে তাঁর একটী সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশ কর্ব্বে ইচ্ছে করেছ তাতে অত্যন্ত খুসী হয়েছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার একার্য্যে সম্পূর্ণ সফলতার জন্যে।

আমার কাছ থেকে তোমার বাবার চরিত্রের বিশেষত্ব মূলক কিছু চেয়েছ, তা আমি আর কতখানি তাকে জেনেছি। তাঁর সহপাঠিদের কাছথেকে আশাকরি তুমি অনেক কিছু পাবে। বিশেষতঃ বিনোদবাবু বিনয় ও গুরুদাস বাবুর কাছ থেকে। একটা তাঁর বিশেষত্ব যা-আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে সে তার বন্ধুবৎসলতা আমাদের সঙ্গে তার যেন একটা প্রাণের টান ছিল। কোনও বন্ধু বিপদে পড়লে তারজন্যে সুকুমার সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিল। পৃথ্বীনাথের মৃত্যুর পর যেভাবে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য করেছে সেটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমান।

আমি নিজে জানি মাসে মাসে নিজে প্রভূত টাকা দিয়েছে। অসুখে বিসুখে প্রাণদিয়ে তাদের সাহায্য করেছে। আবার বন্ধুদের কাছে টাকা আদায় ক'রেও ওদের সাহায্য করেছে। অন্য বিশেষত্ব হচ্ছে যখন সে কাজটি কর্ত্তে নিজের ইচ্ছেয় লেগে গিয়েছে সেকাজটি যাতে সর্ব্বতোভাবে সফল হয় তার জন্য কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। নিজের সুবিধে, অসুবিধে, স্বাস্থ্য, কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি নেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়ে উঠে। তার ছাত্র জীবনের কথা বিশেষ কিছু আমি জানি না বিনোদবাবু আর বিনয়এর কাছে তুমি অনেক কিছু সংগ্রহ কর্ত্তে পারবে আশাকরি।

তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

Secretary. Indian
Central Jute Committee. (রায়বাহাদুর) শ্রীগিরীশ চন্দ্র সেন।

Upright Sukumar

I consider it a great privilege to be called upon to offer my homage to the memory of my esteemed friend, Late Sukumar Chattopadhaya. He was truely a great man in every sense of the term. I first met him when I was very young in service and what impressed me at first sight was the great warmth and sincerity of his character. After the first few words I felt I was in the presence of a loving and sympathetic friend who had both discernment and understanding. Since then I met him often and with closer acquaintance came greater respect, love and affection for the man no less than for the officer in him. In those

early days of my service career there were but few men in service who thought for the country and the people in a spirit of service and Sukumar Babu was one of these noble few. Simple in habits, unostentatious in behaviour, his heart was always pining for the opportunity to do good to his fellow-men and this objective he pursued unfalteringly throughout his life undeterred by the criticism of officious superiors or by the scoffing of cynically minded brother officers. It was this burning zeal to serve his fellow men which led him to renounce the coveted position of Inspector-General of Registration of undivided Bengal and to seek retirement long before it was due. I saw him after this at Santiniketan, where among simple and homely environments he was giving of his best freely and spontaneously for rural uplift work. In that setting he seemed to me to be very much like the Rishis of old, whose sole aim was to do good to humanity. Providence whose ways will remain a mystery to mortals did not give him the full measure of happiness in life. But if love and devotion for the common man and a life lived in the spirit of a true Karma yogin count for anything, then surely he has earned eternal bliss in Heaven. May his soul rest in peace."

Private Secretary to the Governor of West Bengal. **Susil kumar Mukherji**

Exemplary Sukumar

I have been asked to write a brief note for inclusion in the memoir which is being prepared in Commemoration of Rai Sukumar Chatterjee Bahadur. I am glad to do so because when I first met him fifteen years ago he made upon me a very remarkable, impression which nothing in my subsequent knowledge of him has led me to modify.

substantially. He was then Subdivisional officer of Gopalgunge; and in charge of this rather remote and backward Subdivision he showed qualities which I believe were throughout life his outstanding characteristics. It was not only that he was conscientious, competent and unsparing of effort : he was then and throughout his life inspired by genuine and practical sympathy for the 'under privileged,' by complete integrity of character, by a rejection of any but the loftiest ideals and by a great repugnance to cant and humbug. For his principles he was prepared to fight without yielding, possibly, at the cost of being thought 'awkward' or unaccommodating; and in the pursuit of his ideals I believe that he took no thought for personal comfort or aggrandisement : his ambition was all for the improvement of his fellow-country men's standards of economic welfare and of moral and Spriritual values. I do not know what material effect his life work has had upon Bengal : but he was a man of convictions and character and he conducted his life in such a way that shining examples can be gathered from it by those who in the new India aim at bringing Bengal to the measure of her full stature.

7 Kings wood court — A. E Porter.
Maiden head. U. K. — (Retired, I. C. S)

Social worker Sukumar

Sukumar was my friend from boyhood. Both of us were in the Midnapore Collegiate School in the nineties of the last century. He was two years my junior in age as well as in the school class and it was a cruel irony of fate that he has been taken away while I am still left in this harsh world to draw my breath in pain to tell his story. As

far as I remember I was in the first class corresponding to the Matriculation class of now-a-days and he was in the third class, when our acquintence first began. It ripened very soon into intimacy. At that time the late Mrs. Annie Besant, the head of the Theosophical society of India, wielded a tremendous influence over all sections of the people of Bengal, the old as well as the young. By her charming eloquence and closely reasoned writing, she had been successful in bringing about a revival of faith in all that is best in the Hindu religion amongst the educated Indians. We, too, succumbed to this healthy influence. In those days the boys in the school classes were an extremely heterogenous mixture, the ages ranging from fourteen to twentyfour in the first class and twelve to twenty two in the third class. Tender children with their shining morning face jostled with hardy youths at times 'bearded like the pard'. I think it was one of the latter, a very serious young gentleman at our class, who started a weekly meeting to discuss moral and religious subjects and who gloried in the very apposite appellation of Nrishinha or the man-lion. Both Sukumar and myself were members of this religious coterie, and while I was more or less a silent listener, one of the 'also rans' I noticed here for the first time how enthusiasm in everything good was a marked feature of Sukumar's character from his very boyhood. He took a very active part in these discussions on morality and theosophy and would quote couplets from Hitopodesha, the Pancha-tantram and sometimes even the Gita to prove his point.

We met again in Calcutta, I had just passed my B. A. from the Presidency College. I was a resident of Eden Hindu Hostel and was reading for the M. A. Sukumar came to join the third year class in our College and became my room-mate in my hostel. We passed a very pleasant

year together. Like the planets his soul had the faculty of attracting congenial souls to its orbit and being attracted to theirs again in its turn. He became great friends with the best men of his year, Rajendraprasad, Benoy Sarkar and others. Like many of us he came under the influence of Satish Mukherjee of the "Dawn" the self less bachelor patriot of those days and an indefatigible silent worker amongst the college youths. By nature Sukumar was extremely social and could adapt himself to all sorts of people. At times you would see him in the company of romantic youngmen with long love-locks a *la tagore* In fact he was a great admirer of Gurudeva from his College days and was what we used to call them in those days, a *Raibie.* Again you would meet him in the company of a marry band of youngsters on pleasure bent, talking of the theatre, actors and actresses, restaurant and other paraphernalia of the gay world. As he was a great mixer, the list of his acquaintances was notable, not only for its arithmetical contents but also as regards the variety of types they represented. In 1908, when I first came to Calcutta to read for B. A, the idea of encouraging Swadeshi in trade was already gaining ground. A swadeshi store had been opened at Bowbazar by J. Chowdhury. There was however, no indication there of any movement, secret or open, designed to fight the foreigner and wrest the country from his rule. In some out of the way corner of the vast metropolis Sukumar must have come across a band of patriotic youths who were even then planning to start a secret society for bringing about an armed revolution. He told me that boxing, sword playing and shooting were being regularly taught at French Chandernagore to a number of young men visiting the place once a week from Calcutta, One day he informed me about a meeting to be held at a College in North Calcutta and requested me to accompany

there. At that time there was an institution called the Central College near the Star Theatre.

The principal was a gentleman named most inaptly as Khudiram Bose (*Khudi* means small), for he took an extreme delight in using English words of learned length and thundering sound and loved to imitate the great Cham of English literature in everything. Sukumar took me to this place. I found soon boys at the gate looking carefully into the faces of the visitors and then letting them pass. Sukumar apparently was known to them for we found no difficulty as regards entrance. We went up to the second floor and found some twenty young men sitting on benches in a classroom. One of them, I was told, was to read an essay about the Sepoy Mutiny. A slim youth with eager sparkling eyes went up to the desk and began delivering the piece he had written. His theme was that the Sepoys were the first Indian patriots who had raised the flag of rebellion against the British and that we must follow their footsteps. He was Barin Ghosh, to rise one morninig like Byron to find himself famous as the leader of the young conspirators and patriots of the Alipore Bomb case. Both of us were very much attracted by the noble idea of freeing our country from foreign yoke. After appearing in the M. A. in November. 1904, I returned to Midnapore. Bhupen Dutt, a brother or Vivekananda, came here next month and enlisted me along with some others as member of the secret society, started in 1904 to fight the British. We took a solemn oath on the Gita to obey the dictates of our leaders and to further the cause of freedom in all possible ways and wrote our names on a piece of paper with blood drawn from our finger pricked with the point of a sword. Sukumar had already been initiated and became a member before me. It was our firm determination at that time to devote our lives to the sacred cause of our beloved motherland but fate had decreed otherwise.

In 1905 Lord Curzon had introduced the system of

appointment in the Bengal Civil Service (Executive) through nomination from the Calcutta University and from district officers. I was appointed Deputy Magistrate in 1905 through the University while Sukumar, two years later entered our service through nomination from the district. We were not to serve the country through bombs and revolvers but to dedicate ourselves to the services of the people on behalf of the British Government.

And right well did Sukumar serve his poor country men throughout his career. Ever enthusiastic in his burning desire to promote the good of the people, he joined the Co-operative Department. As an Assistant Registrar he worked hard for Central co operative Banks and village societies. while at Naogaon in Rajshahi he organised special jute weaving societies amongst the cultivators who were thus able to supplement their meagre income from land by selling 'asans' and other necessary articles made from jute fibre. He went to the Punjab to study the village improvement societies which were functioning there and came back with many new ideas which he introduced in Bengal. In Birbhum and Bankura he started numerous societies for improving the old tanks and used them for irrigating arable lands,. For want of re-excavation these old tanks which served a very essential purpose in the economic life of the village and were a valuable asset to the people were lying not only useless but had become the breeding ground of disease. Sukumar took up the work with his characteristic energy and succeeded with the help of those societies in clearing the silt deposited in the course of centuries from many of these tank's and recreating them again as useful channels of irrigation.

His work as Sub-divisional Officer was of the highest order. With the training of a bureaucrate he had the rare sympathy and selfless zeal of an ideal democrat, a real servant of the people. With many of our so-called public

servants, it is a matter of the utmost difficulty for an ordinary man of middle class, not to say of a '*chasa*' to come to his presence and represent any grievance direct to him. In India under the British rule the law's delay and the insolence of officer had become proverbial. In the begining of the present century when we were in office, the custom of *Dallies* to high officials was in great favour. In the words of Sir Ali Baba the *Dallies* in the profuse East were the visiting cards of the meagre West. Elia in his incorrigibly punning vein speaks of *presents* endearing *absents*, but with our '*huzoors*' dressed in a little brief authority, presents were necessary to remind him of your presence at his door. Not to speak of the Red *Chaprashi* and the pussy *Peshkar*, as the Bengali saying goes, even the little lizard in the courtroom was agape for a tip. But with Sukumar, it was not the case of the poor villager loitering under the baniyan tree for an anxious peep at the *Hakim's* face, but the Magistrate himself going to his hut in an obscure hamlet and sitting in his charpoy to listen to his quaintly worded complaint and give him redress, then and there. By his charm of manners and pursuasive eloquence Sukumar could mould the people according to his will and form them into compact groups with a sense of descipline and determination to carry out projects of local improvement As S. D. O of Gopalganj at Faridpur he was successful in his efforts to have many waterways cleared of the water-hyacinth pest with the help of the local inhabitants. They also excavated some very useful *khals* under his guidance. He became the head of the Registration Department but as a District Officer he could have rendered invaluable assistance both to the Government and to the public. Promotion, however, in our service was seldom the reward of merit and honesty and was, in the majority of cases, earned by members in whom these two factors

were conspicuous only by their absence. In fact Sukumar had a great disqualification in that he could not crook the pregnant hinges of the knee towards those in whose hands lay advancement.

He retired from government service before serving his full term. The dry-as-dust routine work of the Inspector General of Registration was too stale, flat and unprofitable to satisfy his aspiring soul, eager to employ his God-given talents on some useful work by which the masses will benefit. As I have mentioned before he was a great admirer of Gurudeva. He had drunk deep from the embrosial fount of Rabindranath's poetry, You could detect its cultural aroma and spiritual essence in his very breath. He had a sonorous voice and could declaim for hours page after page of Tagore's poetry to our delight and edification. He therefore decided to retire prematurely from government service and join the *Sreeniketan* at Bolepur. It was pure labour of love with him to work for rural uplift in Co-operation with Gurudeva and his band of unselfish desciples at Santiniketan.

After Gurudeva's death he left Sriniketan and worked for some times as Executive officer in charge of Bhatpara Municipality. Then he entered Government service again and was appointed Deputy Director Rural Development Department. Here again he was entrusted with work in which he had specialized before, viz, the re-excavation of silted tanks in Bankura and Birbhum. He succeeded in resuscitating many of those old irrigation reservoirs. Even a few months before his death he went to Noakhali on behalf of the Hindu Mahasaba for relieving the distress of the people who had sufferred at the hands of the Mohameddan *goondas* during the communal disturbances there.

Practically he died in harness, labouring all his life, whe-

ther in government service or as a non-official volunteer and social worker for the good of the people. His life provides all of us and specially the younger generation with a high and noble ideal which should be followed by those who seek the real welfare of the masses. In his life here his body and mind knew no rest. May his soul now rest in peace.

(Rai Bahadur) **Amal Krisna Mukherji**

Idealist Sukumar

Dear Mrs. Mukherji.

Your letter which came this morning, brought me my first news of your father's death. I am very sorry to hear of it, and I offer you all my sympathy. It was only the other day that I was thinking of writing to him and asking for the history of his doings as Executive Officer at Bhatpara.

Although in earlier years he was in the same station with me, I did not get to know him well until late in his service, and even then it was on semi-official matters that we talked , of his private life I knew practically nothing. This was precisely;because he was so absorbed in his ideas for the betterment of things in Bengal that he had no time ot speak to me of himself or other things. Public health and the improvement of living conditions in the small towns were the topics in which he sought from me information and, sometimes advice, when I was Secretary in the Local Self Government Department. He wished to do too much quickly, people resist improvements that are strange to them or come too quickly even if they are not actually interested, as some are, in retaining that which should be remedied : but if he could have brought about the changes

of which he spoke it would have made a very much better Bengal. Yet, interesting though these talks were to me at the time, there was nothing in them that I can reproduce now fifteen years later. After he retired it was some years before I saw him except casually. I remember how once when I was on tour and returning to Chinsursh from Suri, he came down to Bolpur station to see me—an incident which my wife has always remembered. Later when he went to Bhatpara, he frequently came in to see me. In particular he discussed his schemes for composting town refuse; that was a thing which to most seems of small importance but which, as he realished, might have been the begining of a great reform Did he succeed ? I broke down and had to leave India before he could say. What I was afraid of, was that the Ministry would not support him if he did his work efficiently and honestly, as I am sure that he would. He was a fine character and I respected him greatly.

It grieves me that I am not able to help you with memories of him such as you wish, if time did not press some might come back to me.

Field House — Yours sincerely
Headington Hill, Oxford — H. P Townend (Retired I.C.S).

Practicalman Sukumar

Dear Mrs. Mukherjee,

Your letter of 12th Dec. only reached me to-day, as it was forwarded by air from England. I am afraid therefore, that my reply will not reach you in time to be of any use for the book that you are writing. Yes, I knew your father very well, and like every body who knew him, had a very high regard for him. He was an idealist and a practical

man as well. Like all idealists, he had his moments of disappointment and feelings, of frustration. Particularly his work in the Co operative Department disappointed him as regards results. It would probably have been a more successful department if it had been managed on the lines approved by your father. He had a shrewd sense of actualities, and had a preference for what was practical and attainable. The last work in which he helped me considerably was in organising the operations in West Bengal under the Bengal Tanks Act. He worked very hard at this, inspite of failing health.

It was always a pleasure to meet your father and listen to his views. He had always something worthwhile to say on every conceivable subject, and he expressed himself very beautifully.

His death was a great loss to the Province, and in perpetuating his memory you are undoubtedly rendering a public service. With best regards, Yours very sincerely

Asmara. Claus M. Martin.
Eritrea. (Retired. I. C. S)

Enthusiastic Sukumar

Dear Mrs Mukherji

I am deeply greaved to learn of the death of your father, my colleague and friend Rai Bahadur Sukumar Chatterjee of which your letter is to me the earliest news. Living in a small English village as I have been for nearly ten years, I often in thinking of the villages and country towns of Bengal, once more convince myself that the periods of your father's and my service in which we were in direct contact with village people were the happiest and most satisfying to ourselves. Your father I am sure would agree

and so would Rai Bahadur Binod Bihari Sarkar who was kind enough to remember me to you.

Sukumar Chatterjee was a man who was enthusiastic for the welfare of the country folk, and unsparing of himself in their service.

My wife joins with me in sending our deep sympathy with his family.

Yours sincerely,

Launton. Harold Graham.
Bicester, Oxon. (Retired. I. C. S.)

কর্ম্মযোগী সুকুমার

(মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত)

জীবনের যত কাজ সাঙ্গ হ'লকি আজ
পেয়েছ কি তব ভগবানে
পেয়েছ আঘাত যত দুঃখ বেদনা শত
এখনও কি বিঁধে আছে প্রাণে?

সারাটি জীবন ধরি যত কাজ গেলে করি
পূর্ণতা পেলে কি আজ সবি
কর্ম্মের দিবস শেষে সন্ধ্যা এল অবশেষে
অস্ত গেল কর্ম্ম দীপ্ত রবি।

বিশাল ও হৃদিগেহ ভরা ছিল যত স্নেহ
দিয়েছ সবারে প্রাণ ভরে
কর্ত্তব্য করেছ তুমি দেশবাসী মাতৃভূমি
দুঃখী যত সবাকার তরে
তোমারে বুঝিতে কেহ পেরেছে পারেনি কেহ
তার তরে ছিলনাক দুখ
দিয়ে গেছ দুই হাতে দেবার আনন্দে মেতে
দানসুখে তৃপ্তি ভরা বুক
করে গেছ যাহা তুমি নহ তার ফলকামী
গীতার দৃষ্টান্ত তুমি কর্ম্মযোগী বীর

তাই তব প্রাণভরা শান্তি রাজে দুঃখহরা
কর্ত্তব্যে অটল তুমি সাধনায় ধীর।
যেখানে গিয়াছ আজ সেখানে কি আছে কাজ
তোমা লাগি চেয়ে ছিল পথ
পৃথিবীর দেহ ত্যাজি অমরায় গেলে আজি
দেবতা পাঠায়ে দিল রথ
এখনও দূর থেকে দুখীদের দুখে শোকে
পাঠাইবে তব আশীর্ব্বাদ
সেথা হতে দেখিবে কি প্রাণ দিলে যার লাগি
পূর্ণ যদি হয় সেই সাধ।

শ্রীউর্ম্মিলা দেবী

কর্ম্মবীর সুকুমার

সুকুমারের কৈশোরের শেষ ও যৌবনের প্রারম্ভ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। ঐ সময়ে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ ক'রে বাংলার ছাত্রসমাজ দুইটি প্রভাবে প্রভাবিত ছিল, স্বদেশী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য। এই দুই প্রভাব সুকুমারের মনকে তার প্রথম যৌবনে যে গড়ন দিয়েছিল জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তার বদল হয় নাই। তার মনে যে দীপ জেলেছিল পরিণত যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে ও তার শিখা অস্তিমিত ছিল। বার্দ্ধক্য বলছি বাঙ্গালী জীবনের পরিমাপের পাটীগণিতে। তার মনে কখনও বার্দ্ধক্য আসেনি। আর মনের প্রৌঢ়ি তারুণ্য শরীরেও জড়তার কর্মহীনতা আসতে দেয়নি।

শিক্ষা শেষে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের মত জীবিকার জন্য সুকুমার রাজ সরকারে কাজ নিয়েছিল। বিদেশী রাজসরকারের কাজের সুখ দুঃখ, তার সাংসারিক অসুবিধা ও অপরিসর কর্ম্মক্ষমতার বাধা নিষেধের গভীর পীড়া তখন ভারতবাসীর গা সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের রাজশাসনের অবস্থা তার পূর্ব্বযুগের অবস্থা ও ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের সম যুগের অবস্থা থেকে তখন এক ভিন্নরূপ নিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালীর মনে যে দেশপ্রীতি ও বিদেশীর অধীনতার বিরুদ্ধতা এনেছিল তাকে দমনের স্বাভাবিক ইচ্ছায় বিদেশী শাসকের রুদ্রমূর্ত্তি তখন প্রকট; তার ধূর্ত্ত মনের কাজ চলছে বাঙ্গালীকে দিয়ে বাঙ্গালীর এ মনকে পিষে মারার ফন্দি আবিষ্কারে। এর-ই এক ফন্দি হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ও বিভেদ আনা। এ ফন্দি ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়ার দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ এ দেশে প্রয়োগ করেছে, এবং যাবার সময় এর সুপরিণত তিক্ত ফল ভারতবাসীকে গলাধঃকরণে বাধ্য ক'রে গেছে। বিদেশী রাজশাসনের অঙ্গ হ'য়ে রাজসরকারে কাজের যে সাধারণ অস্বাভাবিকতা

তার চেয়ে বহুগুণে নিদারুণ এই অস্বাভাবিকতার মধ্যেই সুকুমারের সমস্ত সরকারী কর্ম্মজীবন কেটেছে। প্রথম যৌবনের স্বদেশ প্রীতি, দেশের কাজে মনের আকাজ্ক্ষা, এতে নিঃশেষে গুড়ো হ'য়ে উড়ে যাবার কথা। কিন্তু সুকুমারের যৌবন প্রারম্ভের মনকে এ অবস্থার চাপও পঙ্গু করতে পারেনি। বিদেশী শাসনের ইস্পাতের কাঠামোর মধ্যেও দেশের কোনও হিতের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যখনই মনে হ'য়েছে তার চেষ্টায় তার শ্রান্তি ছিল না। কখনও অল্প কিছু ফল হ'য়েছে, অনেক সময়ই চেষ্টা নিষ্ফল হ'য়েছে। চেষ্টার ত্রুটিতে নয়, অবস্থার বিরুদ্ধতায়। সরকারি কাজ থেকে অবসর নিয়ে দেশের নানা কাজে নানা ভাবে সে নিজেকে ব্যাপৃত এমন কিব্যস্ত রেখেছিল। মন শরীরের কথা চিন্তা করতে দেয় নি।

কিন্তু জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে, সাংসারিক ও অব্যবহারিক সমস্ত কাজকে ব্যাপ্ত ক'রে এবং অতিক্রম ক'রে ছিল তার মন, সাহিত্য ও রসের দিকে উন্মুখ চিন্তার দিকে উন্মুক্ত মন। আমাদের যুগের বাঙ্গালীর এই মন প্রধানত রবীন্দ্রনাথের দান। সুকুমার তাঁকে বলতো গুরুদেব, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের মতো। তাঁর এ দান সুকুমার নিয়েছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়। এ গ্রহণের আনন্দ তার মনে যে সরসতা এনেছিল শত সাংসারিক কাজের রুক্ষতা কখনও তার লাঘব ঘটাতে পারেনি। এ আনন্দে তার কর্মের জগতে কর্মাতীত লোকের স্পর্শ লেগেছিল। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষ কর্মব্যস্ত। চারিদিকে বহু কর্মের ডাক। সে ডাক সুকুমারের মনে স্বভাবতই পৌঁছেছিল। কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ সাড়া দেবার আর সময় হয়নি। দেশ যে তার সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যে সেবাকর্মের দাম কেবল কর্মের মূল্যের চেয়ে বেশী তা আমরা যারা তার অন্তরঙ্গ ছিলাম তারাই জানি।

১২৫ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

দেশসেবক সুকুমার

সুকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, ৩২ বৎসর পূর্ব্বে। সেই পরিচয় কালে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

বিদেশী গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়াও যে দেশের সেবা করা যায়, সুকুমারের জীবন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অকৃত্রিম স্বদেশ হিতৈষণার জন্য আমি তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতাম।

Service শব্দের অর্থ সেবা, Public servant যাঁহারা তাঁহারা জনসাধারণের সেবক। বিদেশী শাসনের অধীনে কিন্তু অধিকাংশ Public Servantই আপনাদিগকে জনসাধারণের প্রভু বলিয়া মনে করিতেন। অনেকে

যে এখনও করেন না, তাহা নহে। এই সকল কর্ম্মচারী আপনাদিগকে উপরস্থ কর্ম্মচারীর সেবক বলিয়াই মনে করিতেন ও করেন, এবং তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনেই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইত ও হয়। সুকুমার কখনও ভোলেন নাই যে, তিনি জনসাধারণের সেবক। দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময় স্বীয় পদ মর্য্যাদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি স্বকীয় বুদ্ধি ও কার্য্যপটুতা, দেশের অজ্ঞ ও দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধনে নিযুক্ত করিতেন এবং অন্যকেও সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করিতেন। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার সেচপুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার ও কৃষির উন্নতির জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ঐ দুই জেলার অধিবাসীগণ তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। সমবায় বিভাগে তিনি যখন কাজ করিতেন, তখন মৃতপ্রায় সমবায় সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে মনোভাব লইয়া তিনি উক্ত বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বিভাগের কর্ণধারদিগের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব ছিল। ফলে তাঁহার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। তিনিও হতাশ হইয়া উক্ত বিভাগ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষার যে কল্পনা তিনি প্রণয়ণ করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে সাধারণের শিক্ষা আজি বহুল পরিমাণে উন্নত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই।

ঐকান্তিকভাবে দেশের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে চাকুরীর কাল পূর্ণ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই সুকুমার অবসর গ্রহণ করেন। যে ইচ্ছা লইয়া তিনি সমবায় বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে যে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়া তাহার সহকারী রূপে পল্লীসংস্কারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক কোলাহলে মুখরিত আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর একান্ত অভাব। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক লোকের কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া দুঃসাধ্য। সরকারী কাজ করিবার সময় লোকহিতকর কার্য্যে যাঁহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবার ইচ্ছা আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগের মধ্যে দেখা যায় না। সে ইচ্ছা যদি তাঁহাদিগের থাকিত, তাহা হইলে সুকুমারের প্রতিভা, কার্য্যপটুতা ও স্বদেশ হিতৈষণা দেশের কাজে ব্যবহার করিবার জন্য আমাদের জাতীয় সরকারের আগ্রহ দেখা যাইত।

দেশপ্রিয় পার্ক রোড। (রায়বাহাদুর) শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাহিত্যপ্রাণ সুকুমার

"সমুদ্রে মিশিলে নদী, বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে।" 'উৎসর্গ রবীন্দ্রনাথ'

আমরা যখন কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন কর্ম্মজীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। পরশাসিত রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষয়িষ্ণু মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই। তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন ক্ষয়িষ্ণু বঙ্গপল্লীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা চেষ্টায়।

বর্ত্তমানে খ্রীষ্টীয় শতকের তৃতীয় দশকের প্রথমেই মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ সুরু হয়। এই আন্দোলনে অভূতপূর্ব্ব পল্লীজাগরণ দেখা দিল। আন্দোলন ক্রমশঃ দমিত হইল বটে কিন্তু পল্লী আর ঘুমাইল না। অধিকন্তু স্বাধীনতা স্পৃহা তীব্রতর আকারে কতিপয় যুবকের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া তাহাদিগকে প্রতিহিংসার পথে লইয়া গেল। এই যুবকগণ কর্ত্তৃক শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীগণ একে একে নিহত হইতে লাগিলেন। ভারত সমস্যার সমাধান কল্পে তখন নানাবিধ আয়োজন চলিতে লাগিল। লণ্ডনে পর পর তিনটি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স বসিল। ঠিক এই সময়ে বাণিজ্যচক্রের নিম্ন আবর্ত্তন সুরু হইল। দ্রব্যমূল্য অসম্ভব কমিয়া গেল। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কমিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ফলে কৃষক-সমাকুল পল্লীর দুরবস্থার অবধি রহিল না। পল্লীবাসীর জীবনযাত্রার প্রণালী বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। পল্লীবাসী দেনার চাপে ডুবিতে লাগিল।

এই সময় পল্লী উন্নয়নের নিয়মিত ও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হয়। স্যার জন এণ্ডারসন তখন বাংলার কর্ণধার। তিনি নানা কারণে এইদিকে মনোযোগ দিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন তাঁহার সুগভীর পল্লীপ্রেম লইয়া এই সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে প্রাণবন্ত ও সফল করিতে বিশেষ যত্নবান হন। তিনি সমবায় প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্গদেশে যাঁহারা সমবায় প্রথাকে পল্লী উন্নয়নের কাজে লাগাইয়াছেন তিনি তাঁহাদের অগ্রণী।

পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে তিনি খুব আগ্রহশীল ছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বাংলার একটি ক্ষয়িষ্ণু জেলা' এই নামে বাঁকুড়া জেলার পল্লী অঞ্চল সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সুকুমার বাবুর ইচ্ছা ছিল তিনি বা অন্য কেহ বাংলার প্রতি জেলা সম্বন্ধে এইরূপ তথ্যবহুল প্রবন্ধ লেখেন। তিনি নিজে বীরভূম জেলা সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অন্য জেলা সম্বন্ধে

এইরূপ প্রবন্ধ তিনি নিজেও লিখিতে পারিলেন না বা অন্য কেহও লিখিল না বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত তখন 'প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা' সংগঠনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাব শ্রীনিকেতনের ভার লইবাব জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পেন্‌সনের কয়েক বৎসর বাকী এবং তাঁহার বেতন মাসিক ১২০০৲ টাকা। শ্রীনিকেতনেব কাজে তাঁহার মিলিবে মাসিক ১০০৲। তথাপি তিনি এই আমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। রাজসম্মান এবং উচ্চ ও ক্রমবর্দ্ধমান বেতন পরিত্যাগ করিয়া পল্লীসেবায় দারিদ্র্য বরণ কবিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। শ্রীনিকেতন তাঁহার উৎসাহে বর্দ্ধিত হয়। এই সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রবীন্দ্র-সঙ্গ পরিপুষ্ট পল্লী-সংগঠনে উৎসর্গীকৃত দিনগুলি অর্থস্বল্পতা সত্ত্বেও পরমৈশ্বর্য্যময় ছিল। এই সময়ের অনেক কথা তিনি পরবর্ত্তী কালে মহা উৎসাহেব সহিত আমাদিগকে বলিয়াছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য এবং কালিদাস সাহিত্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কণ্ঠস্থ ছিল। কি আবেগ ও আনন্দের সহিতই না তিনি অনবরত রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। এই কবিদ্বয়ের সংস্পর্শে জড়প্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত শ্লোকটিকে যে আবেগভরে তিনি আবৃত্তি করিতেন তাহা আজও আমাব কানে বাজে,

অমুং পুবঃ পশ্যসি দেবদারুং।
পুত্রী কৃতোহসৌ বৃষভধ্বজেন॥
যো হেমকুম্ভস্তন নিঃসৃতানাং।
স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ॥ (রঘুবংশম্)

শ্রীনিকেতন হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি পুনরায় সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন তখন বৎসরে একটি বৃক্ষ-রোপন দিবস পালন করিতে জনসাধারণকে তিনি বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন।

একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি দমদম গোরাবাজারের নিকট একটি গোল্ডমোহর গাছ লাগাইয়াছিলাম? রক্তপুষ্প সমৃদ্ধ বৃক্ষটি দেখিয়া ট্রেণ হইতে যাত্রিগণ একদিন আনন্দিত হইবে, ইহাই ছিল আমার আশা।

'গুরুদেব' হীন শ্রীনিকেতনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেশীদিন থাকিতে পারেন নাই। শ্রীনিকেতন ত্যাগ করিয়া তিনি বাংলা সরকারের পাট বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত হন। তখন আমি ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর সেক্রেটারী। পাটের কুটীর শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য

তখন তাঁহার কি আগ্রহই না দেখিয়াছি। আমাকে চিঠি লিখিয়া, আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমাকে ঐ কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমাকে একদিন দিনাজপুর লইয়া যান। শিলং মেলে আগাগোড়া তাঁহার সুমধুর কালিদাস আবৃত্তি শুনিলাম। সে অদ্ভুত সারাদিবসব্যাপী আবৃত্তি কখনও ভুলিতে পারিব না। দিনাজপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থলে পাটের কুটীর-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে কয়েকটি সমবায় সমিতি আমরা গঠন করিয়াছিলাম; কেন্দ্রীয় পাট সমিতির পরীক্ষাগৃহে এই সময়ে পাটকে পশমায়িত করিয়া সোয়েটার প্রস্তুত হইতেছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই পশমায়িত পাট দ্বারা তাঁহার কন্যার সাহায্যে একটী সোয়েটার প্রস্তুত করাইয়া রাজেন্দ্রপ্রসাদকে উপহার দেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহপাঠী এবং তখন ভারতবর্ষের কৃষিমন্ত্রী। পাটের সোয়েটারের প্রচারের প্রতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে তিনি কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন বাংলার স্বাভাবিক কুটীরশিল্প পাটবয়ন, খদ্দর নয়।

পাট বিভাগের কাজ ত্যাগ কবিবার কিছুদিন পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুকুর উদ্ধারের কাজ গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে এদেশে বহু পুকুর ছিল, পুকুর হইতে সেচ হইত, মাছ হইত। পুকুরগুলি মজিয়া গিয়াছে। সরিকি গোলযোগে কেহ আজ সেগুলির মেরামত করে না। ফলে কৃষির বিশেষ অবনতি হইয়াছে। সরকার পুকুরগুলিকে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ব্যয়ের কতক অংশ মাছ চাষ করিয়া এবং বাকী অংশ সহজ কিস্তিবন্দীতে আদায় করিয়া লইবেন। এই কাজ সংগঠনের ভার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেওয়া হয়। মনের মত কাজ পাইয়া কিছুদিন তিনি সানন্দে এই কাজ করিয়াছিলেন।

এই সময় তিনি একটি রবীন্দ্র পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। আমরাও উহার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু উহার প্রাণ ছিলেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। রবীন্দ্র সাহিত্য তাঁহার নখদর্পণে ছিল। পদ্য এবং গদ্য অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই বলিতেন, "গুরুদেব যে কত বিষয়ে লিখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। গুরুদেবের সমস্ত লেখা পড়িয়া যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন তাঁহার যদি একটা বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করা যায় তবে বড় ভাল হয়। কাজটা সময় এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ। কয়েকজন গবেষক কয়েক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে কাজ করিলে তবে কাজটী সম্পন্ন হইতে পারে।"

একদিন 'উৎসর্গের' কথা হইতেছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন উৎসর্গে একটী অত্যন্ত বেদনাতুর কবিতা আছে। পরমাত্মীয় বিয়োগের

সুগভীর ব্যথা ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া কবিতাটী আবৃত্তি করিলেন,

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্ দিগন্ত ঢাকি
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে, ওগো
আমরা খাঁচার পাখী,
হৃদয় বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ?
চির দিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?
চির দিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি ?
তোমা পানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখি। ইত্যাদি।

আবৃত্তি সমাপনান্তে বলিলেন, "আমার ধারণা গুরুদেব স্ত্রী বিয়োগে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি কিন্তু বলিয়াছিলেন যে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুতে কবিতাটি লেখা হইয়াছিল। উৎসর্গের পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে এই কবিতাটিকে জগদীশচন্দ্র বিষয়ক কবিতাটির পরেই স্থান দেওয়া হইয়াছে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শেষের দিকে কিছুদিন আমার বাসস্থলের সন্নিকটে বাস করিয়াছিলেন। তখন দিনের মধ্যে বহুবার সহসা আসিয়া আমাকে বাহির হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতেন। আমি সকালে নিমের দাঁতন দিয়া দাঁত মাজি। ইহা তিনি অনেকদিন দেখিয়াছেন। ইহার পর প্রায়ই তিনি তাজা নিমের ডাল আনিয়া আমাকে দিয়াছেন। আমার চার বৎসর বয়স্ক ভাইপো দীপু তাঁহাকে কতবার বলিয়াছে, "আপনি এই তো আসিয়া গেলেন আবার আসিয়াছেন কেন ?" দীপুর সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব ছিল। আমি বাড়ীতে না থাকিলে দীপুর সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়া যাইতেন।

একদিন রাত্রে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহসা আসিয়া উপস্থিত। রাত্রে তাঁহার ডাক শুনিয়া মনে করিলাম হয়তো কোন জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। আমি নীচে নামিতেই বলিলেন, "কালিদাসের মধ্যে 'বাণী'র কথাটী অনেক জায়গায় পাচ্ছি। 'বেতস' কথাটি কোথাও আছে কি ?" এই বলিয়া 'বাণীর' শব্দযুক্ত ৫।৬টি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। 'বেতস' কথাযুক্ত দুইটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করিতে পারিয়াছিলাম।

"আত্মা সংরক্ষিতঃ সুষ্টৈঃ বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ (রঘুবংশম্)
"ভো বয়স্য, যদ্ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিম্
আত্মনঃ প্রভাবেন, নম্ন নদী বেগস্য ?"
(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ২য় অঙ্ক)

শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাখুসী হইয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন রবীন্দ্র পাঠচক্র হইতে 'রবীন্দ্র সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব' নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একজন গবেষক নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি নিজেই এজন্য চাঁদা সংগ্রহে নামিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ হইল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। একটি নির্ব্বাচনী সংসদ নিযুক্ত হইল। সংসদে ছিলেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ডেপুটি কালেক্টর শ্রীনীহার চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বর্ত্তমান লেখককেও ইঁহারা সঙ্গে লইয়াছিলেন। এসব কাজে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। সংসদ কয়েকজন প্রার্থীর মধ্য হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাসকে এ কার্য্যের ভার দিলেন। কিছুদিন দাস মহাশয় এ কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজটী সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযুক্ত দাসের এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মৃত্যুবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিল। 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন। একবার রবীন্দ্র পাঠচক্রের আহ্বানে 'ব্যাপ্টিষ্ট মিশন' হলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি অনুষ্ঠিত হয়! সে সভায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আবৃত্তি আজও কানে বাজিতেছে।

চারিদিকে কত শত দেখা শোনা আনা গোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায়
দিনগুলি প্রতি পাতে খুলিতেছে জীবনের
নূতন অধ্যায়
তুমি শুধু একপ্রান্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি,
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া
বক্ষ উঠে দুলি।

তাঁহার 'প্রতীক্ষা' যে এত শীঘ্র শেষ হইবে তাহা তখন কে ভাবিয়াছে ?
রবীন্দ্রনাথ কালিদাসে মসগুল চিরানন্দময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্রের

এই দিকটি বড়ই মধুর। তাঁর চরিত্রের মহত্বও ছিল অসাধারণ। কচুরি পানা সাফ করিতে, পুকুরের পঙ্কোদ্ধারে, পাটের কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবিত করিতে নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া দাঙ্গা নিপীড়িত হিন্দুদের সাহায্য করিতে, বৃদ্ধ বয়সে বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জেলার বহুমুখী উন্নতি সাধনে তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না। এ সমস্ত কাজে প্রাণপাত করিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১২০০৲ টাকার মাহিয়ানার পাকা সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ১০০৲ মাসোহারা লইয়া শ্রীনিকেতনে যাইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আমি বিলাত, আমেরিকা ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ঘুরিয়া দেশে ফিরি। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন আমাকে ঐ সমস্ত দেশের সম্বন্ধে লিখিতে উৎসাহিত করেন। পরে যখন প্রবাসীতে ধারাবাহিক রূপে "বিমানে ভূপ্রদক্ষিণ" প্রবন্ধগুলি বাহির হইতে লাগিল তখন তিনি আমার লেখার প্রশংসা করিয়া মিহিজামের রোগশয্যা হইতে আমাকে একাধিক চিঠি দিয়াছেন। মৃত্যুশয্যাযও তিনি প্রবন্ধগুলি পড়িবার আগ্রহ প্রকাশ করিযাছেন, যদিও তখন পড়িবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

শেষ বয়সে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেক পারিবারিক ঝঞ্ঝাটে নিপতিত হন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তিনি ছিলেন সদানন্দময়, সর্ব্বদা পরোপকারতৎপর, গীতার "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ" কথাটির জীবন্ত উদাহরণ।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহজগতে নাই। তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি অনাবিল চরিত্র, নিরলস কর্ম্মপ্রচেষ্টা সুগভীর পল্লীপ্রেম এবং রবীন্দ্র-কালিদাসে অগাধ অধিকার। তিনি নিজের দুঃখে টলিতেন না, পরের আনন্দে আনন্দিত হইতেন। ইহার যে কোন একটি গুণ অধুনা বিরল এই গুণাবলীর একত্র সমাবেশ আর দেখিব না।

১৪৪ হরিশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা

শ্রীবিনয় ভূষণ দাসগুপ্ত
(সেক্রেটারী ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট)

দেশপ্রেমিক সুকুমার

আমি যখন কলিকাতায় হিন্দু হোষ্টেলে থাকিয়া হিন্দুস্কুলে পড়ি তখন সুকুমারবাবুও হিন্দু হোষ্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেন। শ্রীবিনয় কুমার সরকার রায় বাহাদুর অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) ৺মনোরঞ্জন মৈত্র (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রভৃতিও সেইসময়ে হিন্দু হোষ্টেলে

থাকিতেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেন। ইঁহারা সুকুমার বাবুর সহপাঠী কিনা বলিতে পারি না। এখনও মনে আছে, হিন্দু হোষ্টেলের একতলায় ৪৩ নং ঘরে আমি থাকিতাম। আবার মেজদাদা ৺অনাথ নাথ মিত্র ৪৪নং. ঘরে থাকিয়া হিন্দুস্কুলে পড়িতেন। মনোরঞ্জন মৈত্র মহাশয় আমার ঘরে থাকিতেন। হিন্দু হোষ্টেলে আমি বয়সে সকলের চেয়ে ছোট ছিলাম সেইজন্ত সকলে আমাকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন।

অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে প্রথম কলিকাতায় আসিলে যে অবস্থা হয় আমারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দুহোষ্টেলের ও হিন্দুস্কুলের আভিজাত্য দেখিয়া ভ্যাবাচাকা লাগিত। রোজ বিকালে বনমালী যখন নানাবিধ খাদ্য পরিপূর্ণ ঝুড়ি লইয়া আসিত তখন বনমালীর ডাকের অন্ত থাকিত না। আমি মনে করিতাম ইহারা রোজ কত টাকার জলখাবার খায়। বনমালীর কথা এখনও আমার মনে আছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সহিত আমি বেশী মিশিতাম না, সেইজন্য সুকুমারবাবুর সহিত তখন তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই।

বহুদিন পরে চাকুরী জীবনে বাঁকুড়ায় সুকুমার বাবুর সহিত দেখা হয়, তখন ৺গুরুসদয় দত্ত সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সুকুমারবাবু সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কৃষ্ণ গোপাল ঘোষ (লর্ড সিংহের ভাগিনেয়) বিষ্ণুপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহোদয় বাঁকুড়ায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে গিয়াছিলেন। আমিও সেই সময় কৃষি বিভাগের প্রচার বিভাগে নিযুক্ত ছিলাম এবং কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষে আমাকেও সেইখানে যাইতে হইয়াছিল। আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর সংবাদপত্রে একটি বিবরণী পাঠানো হয়। গুরুসদয় দত্তের বাংলোতে সুকুমার বাবু, কৃষ্ণগোপালবাবু এবং আমি উপস্থিত থাকিয়া সেই বিবরণী প্রস্তুত করি। এই উপলক্ষেই সুকুমার বাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল। বাঁকুড়ায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমার লিখিত একটি প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। এই প্রদর্শনীর সফলতা বহুলাংশে সুকুমার বাবুর উপর নির্ভর করিয়াছিল।

ইহার বহুদিন পরে সুকুমার বাবু ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। আমি তখন ফরিদপুর জেলায় কৃষিকর্ম্মচারী ছিলাম। সেইসময় হইতে সুকুমারবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। কয়েক বৎসর পরে আই. জি. রেজিষ্ট্রেশনের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি Deputy Development Commissioner এর পদে পুনর্নিযুক্ত হন। আমিও সেই সময় ঐ বিভাগে অন্য শাখায় Deputy Development Commissioner এর পদে নিযুক্ত ছিলাম। বলাবাহুল্য যে সেই সময় আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় হইয়া উঠে। আমার

অসুস্থতাবশতঃ আমি যখন অফিসে যাইতে পারি নাই তখন তিনি কয়েকবার আমার বাড়ীতে আসিয়া ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত কখন যে 'আপনি'র পরিবর্তে 'তুমি' সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা আমার ঠিক মনে নাই; তবে সেই বাল্যকালের 'খোকা' ডাকের কথা মনে উদিত হইয়া আমাকে পরম তৃপ্তি প্রদান করিত। হিন্দু হোষ্টেলে সুকুমারবাবু আমাকে 'খোকা' বলিয়াই ডাকিতেন।

সরকারী কাজে সুকুমার বাবু কিরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা সরকারী মহলই বিশেষভাবে জানেন এবং অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর মুখে সুকুমারবাবুর কার্য্যদক্ষতার কথা শুনিয়াছি। সুকুমারবাবুর কাজ আমি ভিন্ন চোখে দেখিতাম। আমার মনে হইত দেশের উন্নতি কল্পে তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন এবং সেই সম্পর্কেই তাঁর কাজের পরিমাণ বেশী ছিল যেকাজ তিনি না করিলেও পারিতেন। যাহাকে দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হয়, যাহাতে জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ে, যাহাতে পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য-শিক্ষার উন্নতি হয়—তারজন্যই তিনি মনে প্রাণে চেষ্টা করিতেন এবং ইহার জন্য অনেক পরিকল্পনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বয়স্কদিগের শিক্ষার জন্য অগ্রণীদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন। হাজামজা পুকুর খাল প্রভৃতি সংস্কারে তাহার প্রচেষ্টা অধিক ছিল। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মত তাঁহার পদমর্য্যাদার অহঙ্কার ছিল না। অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে তিনি সহকর্মী হিসাবেই দেখিতেন এবং সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিতেন। এখানে একটা সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তিনি যখন Inspector General of Registration ছিলেন তখন আমি আমার একজন বন্ধু Sub Registrar এর বদলীর জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি আমাকে উত্তর দিয়াছিলেন, 'দেখেন, I don't want any intermediary between me and my Sub Registrars. Rest assured, I know his case and it will be properly and adequately dealt with without any recommendation from you or any one else. কৃষি উন্নয়ন বিভাগে যখন একসঙ্গে কাজ করিতাম তখন এমন দিন ছিল না যে তিনি আমার অফিস ঘরে না আসিতেন এবং বিভাগীয় কাজের সকলপ্রকার সমালোচনা না করিতেন। সেই সময় আমার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও বিশ্বাস লক্ষ্য করিতাম। শিক্ষায় চরিত্রে মিষ্ট ব্যবহারে ক্ষমায় দেশপ্রেমিকতায় পরোপকারিতায় তিনি সকলকেই আকৃষ্ট করিতে পারিতেন। যে সকল গুণের দ্বারা মানুষ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তিনি সেই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। পরকে কি করিয়া আপন করিয়া লইতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। আমার বাড়ির পাশেই তাঁহার এক ধনী নিকট আত্মীয় থাকেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে

যখনই আসিতেন তখন আমার বাড়িতে যে কেবল আসিতেন তাহা নহে, বাড়িতে ঢুকিয়াই বলিতেন, দেবেন, এক পেয়ালা চা দাও। অথচ তিনি তাঁর আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইলে চা জলখাবার ইত্যাদি নিশ্চয় পাইবেন জানিতেন। আমার বাড়িতে এক পেয়ালা চা চাহিয়া খাওয়াতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি আমাকে আপনার লোক বলিয়াই 'মনে করিতেন। কৃষি উন্নয়ন বিভাগে তাঁহার ও আমার সমান পদ ছিল, কিন্তু আমি কখনই তাহাকে সমান ভাবিতে পারি নাই বরাবরই সকল বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতাম এবং তদনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করিতাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানুষের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা দরকার তাহা তাঁহার ছিল। এখানে একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯৪৫ সালেব এপ্রিল মাসের শেষে অবিভক্তবাংলায় তদানীন্তন লাটসাহেব Mr Casey যখন কৃষি উন্নয়ন বিভাগ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন উক্ত বিভাগের ডিরেক্টর Mr Ishaque ছুটিতে ছিলেন। সুকুমার বাবুর উপর বিভাগের যাবতীয় দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। Mr Casey-র আগমন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার ভার আমার উপর পড়ে। আমি তখন অসুস্থ ছিলাম। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুকুমার বাবু বলেন যে আমাকে Mr. Casey কে প্রদর্শনীর যাবতীয় বিষয়বুঝাইয়া দিতে হইবে। সেই সময় বিভাগীয় দুইজন Secetary Mr S Basuএবং Mr Subimal Dutt উপস্থিত ছিলেন। Mr. Casey প্রদর্শনী দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং সেই সময় আমি Mr. Caseyকে বলিয়াছিলাম যে বৃহদাকার এইরূপ একটি স্থায়ী প্রদর্শনী কলিকাতায় স্থাপিত হওয়া দরকার। Mr. Casey তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং বলেন Send your Scheme direct to me, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে আমার মত কর্ম্মচারীর সোজা তাঁহার নিকট scheme পাঠাইবার ক্ষমতা নাই। আমি একটী পরিকল্পনা উপরওয়ালাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু কিছুই ফল হইল না। সুকুমার বাবু Mr, Ishaqueকে লিখিয়াছিলেন এবং বিভাগীয় সকল কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে বলিয়াছিলেন, 'He is Deben, who has not only saved the department from destruction but also enhanced its prestige and importance also.' আমার সম্বন্ধে এইরূপ লেখার দ্বারা ইহা কি প্রমাণ হয় না যে, তিনি যে প্রশংসা নিজে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহা নিজে গ্রহণ না করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার উপর অর্পণ করিলেন। ইহার দ্বারা কি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল না ?

তিনি সাহিত্যিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি প্রখর ছিল। বহু ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত কবিতা

তিনি এই বৃদ্ধবয়সে অনায়াসে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার সার্ভিসের সকল কর্ম্মচারীর মুখেই শুনিয়াছি—তিনি ইংরাজী যেমন লিখিতে পারিতেন অনেকেই তাহা পারিতেন না। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর মুখে সুকুমার বাবুর ইংরাজী লেখার দক্ষতার কথা শুনিয়াছি।

স্বাধীনচিত্তে এবং দেশপ্রেমে তিনি যে সাধারণ অপেক্ষা অনেক উচ্চে ছিলেন তাহা তাঁহার Inspector General of Registration-এর পদ হইতে পদত্যাগ করা এবং অতি সামান্য বেতনে শান্তিনিকেতনে চাকরী গ্রহণ করায় প্রমাণিত হয়। পল্লী উন্নয়ন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আমার ক্ষুদ্র পত্রিকা 'খাদ্য উৎপাদন'কে তিনি সহকারী পল্লীউন্নয়ন বিভাগের মুখপত্র করিবাব পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মানুষমাত্রকেই তিনি ভালবাসিতেন। দুঃস্থ ও আতুরের প্রতি তাঁহার মমতা অসীম ছিল। তিনি গুণীর আদর করিতে জানিতেন। পরনিন্দা পরচর্চ্চা তাঁহার কোষ্ঠীতে ছিল না। তাঁহার মন ও বক্ষ প্রশস্ত ছিল, নীচতা আদৌ ছিল না। তাঁহার সবল দেহে বলিষ্ঠ মন বর্ত্তমান ছিল। সংসারের প্রবঞ্চনা বা ক্ষতির দ্বারা তিনি মোটেই বিচলিত হইতেন না। তাঁহার মনকে এই সমস্ত অবস্থার উর্দ্ধে রাখিতে শিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না মানি যেন ক্ষয়"—

এই কথাটি তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ছিল তাঁহার পারিবারিক এমন ঘটনা ছিল যাহাতে মানুষ ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে কিন্তু সুকুমার বাবু অবিচলিত মনে ও অসীম ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার সকল কর্ত্তব্য করিতে পারিতেন। পারিপার্শ্বিক উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

সুকুমার বাবু সম্বন্ধে আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় আর বেশী কিছু লেখা সম্ভবপর হইল না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে আমার মত অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন। এবং তাঁহার মৃত্যুতে দেশ অকালে একজন দেশ-প্রেমিককে হারাইয়াছে।

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার প্রতি তাঁহার যে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা ছিল তাহা সজীব হইয়া থাকিবে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

১৭৫।এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, (রায়বাহাদুর) **শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিত্র**
কলিকাতা।

চিরঞ্জীবতু সুকুমার

৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি নানা ব্যাপারের আলোচনায় ও কার্য্যে সহযোগীতায় এমন ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন যে আমি নিজেকে তাঁহার সহকর্ম্মী বলিয়া মনে করিতাম। অক্লান্ত কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন তিনি। এবং সমবায় আন্দোলনই হউক, রবীন্দ্র চর্চ্চাই হউক বা বয়স্ক শিক্ষার সংগঠনই হউক—তাঁহার উৎসাহ ছিল অপরিসীম এবং উদ্যম ও অধ্যবসায় আমাদের অনেকের চেয়ে বেশী।

দেশ সেবায় জন্য আকুতি ও যোগ্যতা তাঁহার যাহা ছিল তাহার তুলনা সহজে মিলে না; কিন্তু দেশবাসী তাহার পূর্ণ সুযোগ নানা কারণে পায় নাই। স্বাধীন ভারতে ভরসা করি তাঁহার মত লোক আরও আদৃত হইবে।

চরিত্র মাধুর্য্যগুণে তিনি অনুপম ছিলেন। আপনার করিয়া লইতেও তাঁহার ক্ষমতা ছিল অনন্যসাধারণ—। তাঁহার অকৃত্রিম ও গুণমুগ্ধ সুহৃদ ৺সুধীর কুমার লাহিড়ীর কাছে কতবার তাঁহার কর্ম্মক্ষমতার প্রশংসা শুনিয়াছি। সমবায় আন্দোলনের ইংরাজী ও বাংলা মুখপত্রে তাঁহার প্রবন্ধগুলি ছড়ান আছে। সেগুলির দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

শ্রীনিকেতনে বয়স্ক শিক্ষার জন্য যে সরল বাংলায় সাপ্তাহিক তিনি প্রকাশ সুরু করেন—তাহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনার জেলা বাঁকুড়ার প্রতি তাঁর টান কে না জানে? আশা করি তাঁর গুণমুগ্ধ জেলাবাসী একদিন কোন যোগ্য জনপ্রতিষ্ঠান দ্বারা তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবে। কত না কাজে তাঁহার কথা আমরা স্মরণ করি—কত না বিষয় তাঁহার উপস্থিতি পরামর্শ ও উদ্দীপনার অভাব অনুভব করি। এখনও প্রাতঃভ্রমণের সময় আচমকা মনে পড়ে, কি ভাবে তিনি ডাক দিতেন এবং কত স্নেহে, কত সমস্যা ভোরের স্নিগ্ধ পরিবেশে হাতে তুলিয়া লইবার দায়িত্ব বুঝাইতেন। বাংলার পুনর্গঠনের যে কোন কাজই আমরা করি, তাঁহার কল্যাণ হস্ত ও সেবারত মন যে তাহার পিছনে আছে তাহা জানি।

"চিরঞ্জীবতু সুকুমার"

সেক্রেটারী পাবলিক সার্ভিস কমিসন — শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮১ কারবালা ট্যাঙ্কলেন

কাঙ্গালের ঠাকুর সুকুমার

চাকুরী ক্ষেত্রে আমার সহিত সুকুমার বাবুর পরিচয় যশোরে। তিনি ছিলেন ষ্ট্যাম্প ডেপুটী কালেক্টার আমি সাব রেজিষ্ট্রার। ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে মতা-

মত নিয়েই তাঁর সহিত আমার প্রায়ই লেখালেখি হইত। কাগজ পত্রেই তিনি আমাকে চিনিতেন। মৌখিক আলাপ ছিল না। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যেন দত্ত আমার ছিল বিশেষ বন্ধু—তার বাড়ীতে সুকুমার বাবুর সহিত আমার প্রথম দেখা। সত্যেন আমায় পরিচয় তাঁহাকে দিল; তিনি ওমনি বলিয়া উঠিলেন আপনি আপনার মত বিদ্যে ষ্ট্যাম্পের উপরেই নষ্ট করিতেছেন—আপনার লেখায় সাহিত্য আছে। ইংরাজীতে বলিলেন "Your report reads like literature" আপনার নিশ্চয়ই লেখা টেখা অভ্যাস আছে।" আমি এর কয়েক দিন পরে আমার বাংলা লেখা দু একটা প্রবন্ধ তাঁহাকে পড়াইয়া শুনাই। তিনি আমাকে সেই দিনই তাঁহার সহকর্মী মিষ্টার জে, কে, বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং যশোরে যাতে একটা স্থায়ী সাহিত্য সম্মিলন স্থাপিত হয় তার ব্যবস্থা করেন। সামনেই পূর্ণিমা তাঁহারই চেষ্টা ও উদ্যোগে যশোরে স্থাপিত হইল "পূর্ণিমা সম্মিলনী"

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তিনিই ছিলেন অথচ রাম বিষ্ণুর মধ্যে তিনি কিছুতেই থাকিতে চাহিলেন না। পদের কাঙ্গাল তিনি ছিলেন না। মিষ্টার জে কে বিশ্বাস হইলেন সম্মিলনীর সভাপতি। আমি হইলাম সম্পাদক। সুকুমার বাবু রহিলেন সাধারণ সৈনিক। কবিতা পাঠ আবৃত্তি প্রবন্ধ লেখায় ছিল ইস্কুল কলেজের ছেলের সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতা। সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে তিনি যে সময় আবৃত্তি করিলেন কবিতা 'সাসারামে শের সাহের সমাধি দর্শন সভাস্থ লোক স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল। কবিতাটি তাঁহারই রচিত (৮পৃষ্ঠা দেখুন)

তারপর তিনি ভার দিলেন আমাকে যশোরের 'আলোক' পত্রিকা পরিচালনায়। কার কোন বাগান? তাতে কি তরি তরকারি ফলে তার আয় ব্যয় হিসাব নিকাশ ঐ পত্রিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিত। বেকার সমস্যা পল্লীর উন্নতি পল্লী মনানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ কাগজের লক্ষ্যবস্তু ছিল। তিনি নিজে আগাগোড়া প্রবন্ধগুলি দেখিয়া বাছিয়া দিতেন প্রকাশ ও প্রচারের জন্য। সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন চাকুরীর অবসর সময় অন্যায়ভাবে নষ্ট করিবেন না দেশের সেবা সমাজের সেবা যে যেভাবে পারেন করিবেন। তারপর যশোরে তিনি যে পর্য্যন্ত ছিলেন আমি ছায়ার মত তাঁহার পার্শ্বেই থাকিতাম। (তাঁর সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি, তিনি যে সময় আমাদের বিভাগীয় কর্ত্তা, ইনস্পেক্টার জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন হইয়া কলিকাতায় আসেন সেই সময় হাওড়া অভিভাষণে। সেই অভিভাষণের কিছু এখানে উদ্ধৃত করিলাম)

"My heart only leaps with joy to welcome you in our midst, as the head of our department. I had the fortune

to be able to come under your personal touch while at Jessore. It was a pleasure to sit by your side and hear of the very many valuable advice, the kindwords of consolation which you had so lovingly and ungrudgingly given me to bear on life's worries troubles and anxieties. In Jessore Assoociation, to think of you alone is an absurd reality with me, with you the shadow of a figure big and stalwart as that of a mighty and intelligent giant stealthily marks its appearance before me. And he is Babu Khitinath Ghosh a well known writer and the engineer of the JessoreDistrict Board. His name may be out of place here, but in recollecting you he is simply irresistible, so inseparable was your union with him. Days after days evenings after evening I have watched with interest the erudite discourse which you used to hold with him on diverse topics touching the mortal world beneath and glorious heaven above, culture, commerce, Science Civilization nothing could be leftout of your all pervading knowledge, in that rich acadamic discussion. I have seen the two currents—one as acute and strong as that of quick and deepcutting Megna, and the other as wide, overflowing grand and voluminous as that if the river Padma—black and white mingling together to form one vast ocean of thoughts and ideas. It was pleasant only to plunge in that solemn and holy confluence.

Your wonderful memory at this pretty advanced age in quoting and chanting verses—cantos by cantos, chapter by chapter from Kalidas, Bhababhuty, Homer Shelly, Byron, Dickens, Chaucher, Bankim Chandra Rabindra nath, Saratchandra on one side, Upanishad Gita Chandi, the Bible on the other would amaze, nay even perplex any student of modern Psychology.

It is not possible here within such a small and narrow compass to narrate the various qualities of your head and heart—the manifold activities which your life had been

pledged to elevate mankind. It must be a volume to depict them in details. One so rich with ideas so liberal in views, so scholarly in attainments, so sympathetic in behaviour is rare amonst men. * * * "

সত্যই সুকুমার বাবুর মৃত্যুতে দেশ তার একটা উজ্জল রত্নহারা হইয়াছে।

* * (বঙ্গানুবাদ) "আপনাকে আমাদের মধ্যে আমাদের বিভাগীয় সর্ব্বোচ্য কর্ত্তা হিসেবে অভিনন্দন জানাতে আজ আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো আপনার ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসতে যখন আপনি ছিলেন যশোরে। আপনার পাশে বসে জীবনের দুঃখ কষ্ট অশান্তির বোঝা বইবার সামর্থ লাভ করতে আপনার মূল্যবান উপদেশ স্বস্তির বাণী কত ভালো লাগতো! যশোর স্মৃতিতে আপনাকে একক ভাবে ভাবতে আমার বাস্তবকে অস্বীকার করতে হয়। আপনার সঙ্গে সঙ্গেই অলক্ষ্যে ভেসে ওঠে আমার সামনে আঁর একটি বিরাট পুরুষ যিনি ছিলেন বিদ্যার একখানি জাহাজ, তিনি আর কেউ নন, যশোর জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার খ্যাতনামা লেখক ক্ষিতিনাথ ঘোষ। তাঁর নাম উল্লেখ এখানে হয়তো অসামঞ্জস্যের হতে পারে কিন্তু আপনাকে স্মরণ করতে তিনি অবশ্যম্ভাবী ভাবে অনতিক্রমনীয়, এমন অভেদ্য মিল ছিল আপনার তাঁর সঙ্গে। দিনের পর দিন সন্ধ্যার পর সন্ধ্যায় আমি কত উৎসুক ভাবে লক্ষ্য করেছি আপনাদের গবেষণা পূর্ণ আলোচনা কত বিভিন্ন বিষয়ে, নিম্নে মরণশীল পার্থিব বস্তু উর্দ্ধে গরিমাময় উজ্জল আকাশ সম্বন্ধে।

কৃষি কর্ষণ ব্যবসা বাণিজ্য সভ্যতা বিজ্ঞান সহযোগ অসহযোগ কিছুই বাদ ছিল না আঁপনাদের অসীম জ্ঞানের গণ্ডীতে। আমি দেখেছি যেন দুইটী স্রোতস্বতী, একটি ভীতি প্রবণা প্রখরা বেগবতী মেঘনা, অপরটি শান্তধীরা, অনন্ত বিস্তৃতা কুলছাপানো বিরাট জলবাহী পদ্মা কৃষ্ণা ও শ্বেতকায়া পরস্পর মিলিত হচ্ছে জ্ঞান ও ভাবধারার এক সীমাহীন সমুদ্র রচনা করতে। সেই পূত পবিত্র পুণ্যসঙ্গমে ডুব দিতে মন কতনা আনন্দে আপ্লুত হতো—

• আপনার অদ্ভুত শক্তি স্মৃতি, এমন পরিণত বয়সে কালিদাস ভবভূতি, হোমার, শেলী, বায়রণ, ডিকেনস, সেক্সপীয়ার, চসার, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এক-দিকে উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, বাইবেল অপরদিকে। আপনি অনর্গল ভাবে সর্গের পর সর্গ অধ্যায়ের পর অধ্যায় যখন আবৃত্তি করতেন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ও বিস্ময়বিহ্বল হয়ে যেতো। মানব সাধারণের উন্নতিকল্পে আপনার কর্মময় জীবনের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা আপনার বিশিষ্ট গুণাবলী এই সামান্য অভিভাষণে চিত্রিত করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তার পূর্ণ পরিচয় দিতে হলে

একখানা বিরাট পুস্তক লিখতে হয়। ভাবের এত ঐশ্বর্য্য মতবাদের এত উদারতা শিক্ষা দীক্ষায় এত কৃতিত্ব আচরণে এত প্রাণভরা সহানুভূতি মানুষের মধ্যে বিরল।"

আমার ঐ অভিভাষণে যে তাঁহার বিষয় একবর্ণও অত্যুক্তি ছিল না আজকের শ্রদ্ধাঞ্জলির সহিত তাহারই প্রমাণ দিয়া বিদায় লই। সত্যই সুকুমার বাবুকে হারাইয়া দেশ একটি উজ্জ্বল রত্ন হারা হইয়াছে।

৩৪ বি, রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রীট শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

প্রতিভা উজ্জ্বল সুকুমার

মা পুষ্প।

আমি তোমার পিতাঠাকুর সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা লিখিয়া দিতে বলিয়াছ। তোমার পিতার সহিত যখন পরিচয় হয় তখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র B. A পড়েন। হিন্দু হোষ্টেলে থাকেন। F. A তে তিনি কম্পিট করিয়া ছিলেন। আমি আগাগোড়া বহরমপুর কলেজেই পড়িয়াছি। বোধহয় তাঁহার দুই বছর সিনিয়ার ছিলাম। তোমার ঠাকুরদাদা মহাশয় বহরমপুরে সিনিয়ার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সুকুমার ছুটি হইলেই বহরমপুরে যাইতেন। ক্রমে আমাদিগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা হয়। শিক্ষার বিস্তার যাহাতে হয় বিশেষ করিয়া স্বল্প শিক্ষিত লোকে যাহাতে সৎসাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে সেদিকে তাঁহার গোড়া হইতেই ঝোঁক ছিল। তখন একজন সবজজ বাবু বহরমপুরে ছিলেন তিনি তাঁহার F. A. পরীক্ষার্থী পুত্রকে কোচ্ করার জন্য গৃহ শিক্ষক খোঁজ করিতে ছিলেন। এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন আমারই তিন বন্ধু তোমার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার সহপাঠী পরে কটক কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিশাস্ত্রী এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন এম, এ। ইহাদের তিনজনকে দুইমাস ধরিয়া ছেলেটিকে পড়াইতে হইয়াছিল সবজজবাবু ইহাদের পারিশ্রমিক ১০০ দিয়াছিলেন। সেই টাকা দিয়া বই কিনিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া ঠিক করিয়াছিলাম বাজে উপন্যাস কিনিয়া এ টাকা নষ্ট করা হইবে না। প্রথম বারে যে বইগুলি আসে আমিই সেগুলি কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনি। জীবনচরিত ইতিহাস ভ্রমনকাহিণী প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়াছিলাম। লাইব্রেরীর নাম হইয়াছিল 'বঙ্কিম লাইব্রেরী' এখনও বহরমপুর গোলবাজারে

আছে। এই কোচ করার পূর্ব্বেই আমার বন্ধু তিনজন এম এ পাশ করেন বলিয়া আমার মনেহয়।

আর একটি কথা বলিয়াই এ পত্র শেষ করিব। সে এক সরস্বতী পূজার দিনের স্মৃতি। আমরা তখনও কলেজ ছাড়িয়া বাহির হই নাই। যতদূর মনে আছে খুব প্রত্যূষে তোমার পিতার সহিত আমি বন্ধুবর অধ্যাপক বিনয় সেন তাঁহার অগ্রজ স্বর্গত প্রতীজকুমার ও আমাদের বন্ধু নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী একসঙ্গে বাহির হইয়াছিলাম। আমাদের ওখানে সহর ছাড়াইয়াই পল্লী অঞ্চল মাঝে আর সহরতলীর বালাই নাই। উকিল পাড়া হইয়া চালতা বিলের পাশ দিয়া আমরা মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলাম।

তোমার পিতার স্মরণশক্তি চির দিনই প্রখর। সেদিন কি মনে হইল জানিনা আমাদের সেই চলার পথে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশ' নামক কবিতাটি স্থকুমার আবৃত্তি করিয়া শুনাইল। সে স্থানটি, সেদিনকার যাঁহারা সঙ্গী ছিলেন সকলেই যেন চক্ষুর সমক্ষে দেখিতেছি। স্থকুমারের সেই অপূর্ব্ব অনবদ্য কণ্ঠস্বর ওযেন সেই "হাজার হাজার বছর গিয়াছে কেহতো কহেনি কথা" কানে আজও বাজিতেছে। অমন স্থন্দর উচ্চারণভঙ্গি অমন শ্রুতি মধুর আবৃত্তি আর কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সেদিন বাস্তবিকই বাগ্‌দেবীর এক নূতন প্রকাশ আমার অনুভূতির মধ্যে আসিল। ইহার পূর্ব্বেও এ কবিতাটি আমি শুনি নাই। ইহার পরেও আর কেহ কোনও দিন তেমন করিয়া শুনায় নাই। তোমার পিতার বহু মূল্যবান মনিরত্নের ন্যায় প্রচুর গুণের সমাবেশ ছিল। তাহার একটিও আজকাল দুর্লভ একত্র এরূপ সংযোগ দেখাই যায় না। তাহার দু একটির মাত্র পরিচয় আমি দিলাম। বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন। একটি ইংরাজীতে লেখা অপূর্ব্ব প্রবন্ধ ও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার এ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ ও প্রস্তাব লিখিত আছে তাহা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিলে দেশ ও দশের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। স্নেহবদ্ধ

৭। ৩৭। বি পণ্ডিতিয়া রোড শ্রীগুরুদাস সরকার

৪৮ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি যথা সময়েই পেয়েছিলাম। কাজে অসম্ভব ব্যস্ত থাকি বলে লিখব লিখব বলেও আর লেখা হয়নি। তাছাড়া এদিক সেদিক ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করতে হয়। আশা করি সেজন্য কিছু মনে করবে না।

সুকুমার বাবুর জীবনী লিখছো জেনে বিশেষ সুখী হলাম। তোমার এ উত্তম সার্থক হোক। তাঁর সঙ্গে কিছুকাল একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। একসঙ্গে অনেক জায়গাতেই গিয়েওছিলাম। কিন্তু আমার নিজের তরফ থেকে কিছু লেখা হয়ে উঠবে বলেতো মনে হচ্ছে না। তার কি খুব প্রয়োজন আছে? তুমি নিজে তাঁর জীবনেব যে তথ্য জানো তা একত্র করে লিখলেই তো আমার মনে হয় এ জীবনী ষোলআনা সার্থক হবে। বই শেষ হলে অবশ্যই পড়ে দেখব।

তাঁর মত লোকের শেষ জীবনের অশান্তির কথা মনে হলে সত্যই বড কষ্ট হয়। ত:ব যিনি চির দিনের জন্ম শান্তি লাভ করেছেন, শুধু তাঁর শেষ জীবনের কথা স্মরণ করে আমরা যেন অকাবণ অশান্তি বোধ না করি। ইতি শুভার্থী

তোমাকে স্নেহাশীষ জানাচ্ছি।

সেক্রেটারী দামোদর ভ্যালী করপোরেশান সুধীর সেন

মহাপুরুষ সুকুমার

১৯২১-২২ সালে বাঁকুড়া জেলায় আবগারী ইনস্পেক্টর থাকাকালীন আমার সহিত শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আলাপের সুযোগ হয়। তখন শ্রীগুরুসদয় দত্ত বাঁকুডা জেলায় কালেক্টর ছিলেন এবং ইনি সদর-মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নন্‌কোঅপারেশনের আন্দোলনে দেশে ভীষণ চাঞ্চল্য ও চাকরী ত্যাগের সাডা পডিয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে বাঁকুড়া ওয়েশলিয়ান কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅনিলববণ বায় প্রফেসারি ত্যাগ করে কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দিয়েছিলেন এবং এখন পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে আছেন। আমি ঐ সময়ে চাকুবী ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভ্য হয়েছিলাম। যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় নিজের দুর্বলতার জন্ম চাকুরীতে নিযুক্ত হই, সেই সময় দেশের কার্য্যে (বিশেষ করে চরকা কাটা ও সেই সুতাতে কাপড বুনা ইত্যাদি) আত্মনিয়োগ কবার আগ্রহ হওয়ায় এবং কেমন করিয়া চাকুরীতে থাকিয়াও দেশের কাজ করা যায় সেই সম্পর্কে পরামর্শ করাব জন্ম এই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যের সহিত আমার উদ্দেশ্য মিলিল ও আমার সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত হইল। ইনি সেই সময় বাঁকুড়ার বয়ন শিল্পোন্নতির জন্ম বাঁধ' পুষ্করিণী ও শুভঙ্করের দাড়া প্রভৃতির সংস্কারেব দ্বারা কৃষির উন্নতি ও মৎস্য চাষের উন্নতি-কল্পে যে আপ্রাণ ও আন্তরিক চেষ্টা, শ্রীগুরুদাস দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে করেছিলেন তাহা এখনও আমার মনে খুব উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত আছে এবং আমাকে তাঁহার আত্মা এখনও আকর্ষণ করিতেছে মনে হয়। এ বিষয়ে তাঁহার জীবনব্যাপী যে ব্যাকুল ও আগ্রহ এবং যাহা তাঁহার জীবনের শেষ

মুহূর্ত পর্য্যন্ত একমাত্র খোরাক যোগাইয়াছিল, তাহা বাকুড়াবাসী কেহই বোধহয় ভুলিতে পারিবে না। *এ সম্বন্ধে তাঁর শেষ পত্র তাং ২৭শে মার্চ, ১৯৪৮ সাল যাহা আমাকে লিখেছিলেন তাহা এতৎসহ পাঠাইলাম। ঐ সময়ে তাঁহার কোর্টে আমাদের আবগারী বিভাগের বেআইনী মদের মোকদ্দমারও বিচার হইত এবং সেই বিচারের রায়েতে আসামীর অপরাধের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য মদের শক্তি ও মূল্য নির্দ্ধারণ যে সূক্ষ্মভাবে করিয়া দেখাইতেন তাহাতে অসীম প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। হাতের লেখা এত সুন্দর ও প্রাঞ্জল খুব কম লোকের হয় এবং মনের সরলতা যেন তারমধ্যে ফুটে বেরুত। তারপর অনেকদিন চাকুরী ব্যপদেশে ছাড়াছাড়ি হয় ও পরে ১৯৩১-৩২ সালে পুনরায় রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমায় আমরা মিলিত হই। তখন উনি সেখানে এসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, ওখানের গাঁজা কাল্টিভেটার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রায় ৩।৪ হাজার চাষী লইয়া গঠিত এবং ইহা ভারতের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম সমবায় প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহার কার্য্য অতি সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল এবং সমবায় সমিতি দ্বারা দেশের যে কি উপকার হয় ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইত। ভারতের বহু জায়গা হইতে আদর্শ সমবায় কার্য্য দেখিবার জন্য এখানে অনেকে আসিতেন। ঐ সময় শ্রীসুকুমার বাবু এই স্থানের গাঁজা চাষীদের ও পাট চাষীদের উন্নতির জন্য কি ভাবে পরিশ্রম ও আন্তরিক চেষ্টা করিতেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। গাঁজা সোসাইটীর একজন ডেপুটী চেয়ারম্যান জনাব কালিমুদ্দিন আমেদ তখন ছিলেন। একজন আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এই সোসাইটির কার্য্য দেখাশুনা করিতেন। সেই চাষীরা প্রায় সবই মুসলমান ছিলেন। সুকুমার বাবু এই চাষারা গাঁজা চাষ ছাড়া যাহাতে অন্য ফলের চাষ, হাঁস, মুরগীর প্রতিপালনাদি করিয়া সমবায় প্রথাতে নিজের গ্রামের উন্নতি করিতে পারে সে বিষয়ে চাষাদিগকে উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতেন ও তদ্দারা তাহাদের মন প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ওখান হইতে বিদায়ের সময় যে ভোজ দিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিল তাহা এখনও আমার মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। তাঁর সহিত ডেপুটী চেয়ারম্যানের প্রায়ই ঝগড়া হইত। তিনি চাষাদের ভাগ্য নিয়ন্তা হইয়াও এবং সমবায় সমিতির সুযোগ পাইয়াও কেন তাহাদের চাষের উন্নতির চেষ্টা করিতেন না এই তাঁর ছিল অনুযোগ। সেই অনুযোগ আজ কার্য্যে ফলিয়াছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ নওগাঁর গাঁজা লয় না এবং যাহারা গাঁজা চাষ করিত তাহারা এখন প্রায় বেকার। যদি তারা সেই সময় হইতে অন্য চাষের উন্নতির জন্য সমবায় প্রথাতে চেষ্টা করিত, তাহাদের এই দুর্গতি হইত না। আমাকে তিনি ওখানের সমবায় বয়ন সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন ও উক্ত কার্য্যে তাঁর উপদেশে বেশ উন্নতি করিতেও

সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনি সমবায় প্রথাদ্বারা দেশের উন্নতির জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন ও আমাকে উক্ত পুস্তকাদি পড়িতে উৎসাহিত করিতেন। Punjab Peasants প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল পুস্তক তাঁহার অনুপ্রেরণায় আমি পড়িয়াছি ও তাঁর গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। সুন্দরবনে গোসাবা অঞ্চলে হ্যামিল্টন সাহেবের চেষ্টায় ও অর্থে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির ইনি অন্যতম উদ্যোক্তা এবং রবীন্দ্রনাথ এঁর কার্য্যে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়নের কার্য্যে নিয়োগ করেছিলেন। এঁর স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার অনেক পৃষ্ঠা অনর্গল জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া যাইতেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্য ও উপনিষদাদির শ্লোক অনর্গল বলিয়া যাইতেন। তাঁহার বিষয় গুণের কথায় আমি লিখে বলতে পারি না। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর মত সরল দেশহিতৈষী পণ্ডিত লোক অতি বিরল। এঁর জন্মদিনে এই মহাপুরুষের আত্মার শান্তিকল্পে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি

১৯২ ঠাকুরবাড়ী রোড — শ্রীগজেন্দ্রনাথ কর

স্বদেশ প্রাণ সুকুমার

স্বদেশপ্রাণ সুকুমার বাবুর সহিত আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। আমাদের দেশ একই জেলায় ও কর্ম্মজীবনে আমরা অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত ছিলাম। তাঁর শিক্ষা জীবনের পরিচয় আমি অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি কোন না কোন দেশহিতৈষী বা সামাজিক উন্নয়ন কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন। তখন হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে আমার একটী উচ্চ ধারণা ছিল। কর্ম্মস্থলে তিনি অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমি যখন বারাসতে এস,ডি, ও, ছিলাম তখন তাঁহাকে দেখি ইনস্পেক্টার জেনারেল অব রেজেষ্ট্রেশানরূপে। তিনি বারাসতে গিয়াছিলেন নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা লইয়া। সেখানে প্রায়ই তিনি যাইতেন। তিনি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর সহিত এমন ভাবে মিশিতে পারিতেন যে তাঁহার বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনা খুব ভালো ভাবেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিল। যখন তাঁহার সে কার্য্য বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল তখন তাঁহাকে দেখিলাম পল্লীগ্রাম উন্নয়নরত অবস্থায়। আমি যখন ২৪ পরগনায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম তখন তাঁহার পল্লী উন্নয়নের কর্ম্মশক্তি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে সৃহরে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি

গ্রাম হইতে নিভৃত গ্রামান্তরে অক্লান্তভাবে ঘুরিতে লাগিলেন পল্লীমাতার দুঃখমোচন করিতে। পল্লী সংগঠন কর্ম্মে যখন তিনি বিশেষ ব্যস্ত তখন আবার পুষ্করিণী সংস্কারের কার্য্যেও অমিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের এত বিভিন্ন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকা সত্বেও তিনি নিজ স্বদেশের কথা মোটেই ভুলিয়া যান নাই। তিনি বাঁকুড়া জেলার যে প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দেশের উন্নতিকল্পে তাঁহার দান অভূত পূর্ব্ব। শেষ জীবনে তিনি কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন এবং বলিলে অত্যুক্তি হয় না তিনি কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করেন। শেষ বয়সের এই কঠোর পরিশ্রম তাঁহার সহ্য হইল না। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। সেই স্বাস্থ্য তিনি পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। বাংলাদেশ তাঁহার একটি সুসন্তান হারাইল। তিনি অদ্ভুত ধীসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, অনুপম সরল ও অত্যন্ত উদার হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ বহুলোক আজও তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করে। তাঁহার পুণ্যময় আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

ডেপুটী রিলিফ কমিশনার
২৪ সুরেনঠাকুর রোড।

(রায়বাহাদুর)
শ্রীশম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায়

সুরুলের সুকুমার

৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী লিখবার মত সামর্থ্য আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের নাই। তাঁকে বুঝবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁর স্নেহ আমি তাঁর সাথে পরিচয়ের পর হতে সহোদরের মত শেষ দিন পর্য্যন্ত পেয়েছি। সেজন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় মেদিনীপুর কলেজে। I. A. পরীক্ষায় কলেজ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য তিনি স্বর্ণ পদক পান। সেই সময়েই তাঁর সহিত আমার প্রথম পরিচয়। পরে তিনি যখন S.D.O. Birbhum, পদে সিউড়ীতে আসেন তখন তাঁহার সহিত আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সুযোগ হয়। আমি বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। তিনি দৃঢ়চেতা ও সৎসাহসের জন্য সকলকেই অল্প সময়ে করায়ত্ত করে ফেলতেন। গরীব দুঃখীর ওপোর নজর ছিল তাঁর সর্ব্বদাই, দীন দুঃখীর সঙ্গে সরলভাবে মেশা—তাদের সঙ্গে সমভাবে মিশে নিজেকে সুখী মনে করতেন। আবার তাদের দুঃখের দিনেও অনুরূপ মিশে তাদের বুক ভরা দরদ দিয়ে তাদের দুঃখ হালকা করতেন।

কিছুকাল তিনি সরকারী চাকুরীর খাতিরে বীরভূম ছেড়ে অন্যত্র চলে

যান। পুনরায় তিনি ১৮৩৮ সালের নভেম্বর মাসে বীরভূমে ফিরে আসেন এবং বিশ্ব ভারতীর শ্রীনিকেতনের সহ সচীবের পদ গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৩৮ হইতে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও সৎসাহস বিশ্বভারতীর কর্ণধারদিগকে বহুভাবে বিব্রত করিয়া তোলে। পরে বহু ঘৃণ্য চক্রান্ত তাঁহাকে বিশ্বভারতীর সংস্পর্শ ছাড়িতে বাধ্য করে।

বিশ্বভারতীতে থাকাকালীন তিনি নিকটবর্ত্তি গ্রাম সমূহে জল সেচের উন্নতি সাধনে যত্নবান হন। এবং বহু পুষ্করিণি গভর্ণমেণ্টের পয়সায় সংস্কার করান যাহার ফলে-শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, এবং আজও চাষীরা তাঁর কাছে ঋণী। পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমূহে রাস্তা মেরামত ও নূতন বহু রাস্তা তাঁর সময় প্রস্তুত হয়। বহু Night School. তিনি চাষীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ২।১টি পাঠাগার, ব্যায়ামাগার ও থিয়েটার ক্লাবও তিনি চাষীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিজে থেকে চালু করে দিয়ে গেছেন। বহু স্বাস্থ্য সমিতিও তাঁর সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতীর বৃক্ষরোপন উৎসবকে তিনি গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দেন এবং বৃক্ষরোপনের উপকারিতা বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। আজো তাই গ্রামের মধ্যে সেই উৎসব সমভাবে চলে আসছে। তাঁর কর্ম্মজীবনে বীরভূমকে তিনি যা দান করে গেছেন বীরভূম তার জন্য চির'দিন কৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের পদ্ধতি ও কর্ম্ম শক্তি সবই ছিল বিচিত্র তাঁকে বুঝতে আমরা পারতাম না, কেবল আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম—এতো সদগুণের একত্র সমাবেশ কি করে সম্ভব হয়। তিনি আমার পরম শুভার্থী বন্ধু ছিলেন। যখন তিনি সুরুল শ্রীনিকেতনের সচিব পদ অলঙ্কৃত করেন তখন তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হত। তাঁর মত সদাশয় নিরহঙ্কারী সুহৃৎ ব্যক্তি জগতে খুব কমই দেখা যায়। তাঁর মন ছিল উদার তাঁর হাস্যভরা প্রতিভাব্যঞ্জক মুখখানি সর্ব্বদাই আমার মনে হয়। তাঁকে দেখলেই প্রাণ থেকে সকল অশান্তি দূর হত মন ভরে উঠতো কতনা আনন্দে পূর্ণ হয়ে। তাঁর সকল অকপট স্নেহময় কথাতে সকলের প্রাণে শান্তির বাতাস বয়ে যেত।

সুরুল গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের লোকেরা তাঁকে গুরুর মত ভক্তি করতো বন্ধুর মত ভালোবাসতো। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে তারা তাঁর কাছে গিয়ে প্রাণ খুলে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতো। তারা তাঁকে তাদের পরমাত্মীয় বলেই জানতো। অপরের দুঃখে তাঁর মন গলে যেত—অপরের দুঃখে তাঁর চোখ থেকে বরষার মত অশ্রু পড়তে আমি নিজে দেখেছি। তিনি গরীবের বন্ধু ছিলেন প্রত্যহ গরীবদের বাড়ী নিজে গিয়ে তাদের অভাব অভি-যোগের কথা শুনতেন এবং প্রাণপাত করে তাদের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা

করতেন। কিসে লোকের মঙ্গল হয় কি করে লোকের দুঃখ দূর হয় এই ছিল তাঁর অহোরাত্র চিন্তার বিষয়। তিনি দীনের বন্ধু ছিলেন তাদের জন্ম তাঁর প্রাণে ছিল অকপট ভালোবাসা। অমন কর্ত্তব্যপরায়ণ ধার্ম্মিক ও দেশপ্রেমিক কর্ম্মী আজ কালকার যুগে একেবারেই বিরল। চাষিদের জমির সেচের জন্ম তিনি অনেক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়ে দিয়েছেন গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্ম করেছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রম। তাঁর এ অকাল মৃত্যুতে আমাদের জীবন শূন্য হয়ে গেছে। তাঁর স্মৃতি আমরা কখনও ভুলতে পার্ব্ব না। এখানকার সকলেই সকাল সন্ধ্যায় তাঁর স্নেহভরা সৌম্য মূর্ত্তিখানি স্মরণ করে থাকে। তাঁর এ বিয়োগ ব্যথা আমাদের সকলকেই আচ্ছন্ন করেছে।

সুরুল শ্রীকান্তিভূষণ সরকার।
শ্রীনিকেতন।

পরহিতব্রতী সুকুমার

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদাসু—

মা লক্ষ্মি, তোমার পত্রখানি পাইযা আনন্দময়ের দিকে চাহিয়া এইমাত্র জানাইতেছি যে,—যে পূতচরিত মহাত্মার প্রতি আমার বহুদিনের অকপট ভক্তি সঞ্চিত ছিল তাহারই মধুর স্মৃতি জাগরূক হইয়া আজ আমাকেও ভাব বিভোর ও বিরহ বেদনায় কাতর করিয়া ফেলিল। তোমার পিতার পূর্ণ জীবনী লেখার আয়োজন চলছে জেনে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আবার যখন জানলাম তাঁর মত অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষের উপযুক্ত বিদুষী কন্যার দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ পুস্তকের প্রথমার্দ্ধ লিখিত হইয়াছে তখন সেই আনন্দোন্মাদনার মাত্রা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গুণগ্রাহী সুধী পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব্বতোমুখী দেশপ্রেমের প্রোজ্জ্বল আচরণাবলীর বিবরণ সমূহ পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়া ভবিষ্যৎ দেশ মাতৃকার সন্তানগণের নানাভাবে মন ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করিবে আশা করি। এবং ইহাই তাঁহাদের উদার অন্তঃকরণ প্রসূত পবিত্র চেষ্টার যেন পুরস্কার। দেশের যাঁহারা প্রকৃত বিরাট পুরুষ, যাঁহারা সত্য শিব সুন্দরের উপাসক ও মহাত্মা, তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদনে তাঁহাদের নিত্য প্রশান্ত চিত্তে ক্ষতি বৃদ্ধি বা হর্ষ বিষাদের কোন রেখাপাত হয় না সত্য, কিন্তু সেই বরণীয় ও স্মরণীয় পুরুষদের শ্রদ্ধাতে ও স্মরণে জাতি নিজে বড় হইয়া উঠে। এই শ্রদ্ধা ও বন্দনার প্রয়োজন আছে কেবলমাত্র জাতির চরিত্র গঠনের জন্তই। সত্য ও জ্ঞানমূর্ত্তি ব্রহ্মের বিবর্ত্তন এই পরিদৃশ্যমান বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্বের

প্রতি জীবে পরম প্রেমময়ের মহাকর্ষণের শাশ্বত স্থিতি উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের প্রায় প্রতিটি ব্যবহারের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করিয়া চলিতেন, আজ তাহা স্মরণ করিয়া বস্তুতই বিস্ময় বিমুগ্ধ হইতেছি।

সর্ব্বামঙ্গলপ্রসূ পরাধীনতার দাবদগ্ধপীড়িত এই দেশে সেই সর্ব্বশোষণকারী বৃটীশের রাজকর্ম্মচারীর পদে থাকিয়াও তিনি যে সমস্ত বিভিন্নমুখী জনহিতকর কার্য্যাবলীর সাধনে,—তৎকাল প্রচলিত কুটিল আইনের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া,—দৃঢ়ব্রত ছিলেন তাহা ভাবিয়া আনন্দ পুলকিত হইতেছি।

ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবিকই তিনি আমাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায়ই ভাল বাসিতেন এবং সেই সুযোগে আমি তাঁহাকে যেমন বুঝিয়াছি কেবলমাত্র তাহারই ছায়াপাত করিলাম।

মা আমি লেখক নহি, আমার মন্তব্য মাত্র। না জানাইলে আমি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইব এই আশঙ্কায় এই পত্রখানি লিখিয়া শেষ করিলাম। করুণাময় তোমাদের পিতৃহারা প্রাণে পরমজ্ঞানোজ্জ্বল শান্তি বারি সিঞ্চন করিয়া প্রসাদিত করুন এইমাত্র তাঁহার নিকট আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ হালদার
পোঃ সারেঙ্গা; বাঁকুড়া তোমাদের কাকাবাবু।

"পল্লীবন্ধু সুকুমার"

১৯৪১ সনের পূজার ছুটিতে বাড়ী যাওয়া হইল না। হোষ্টেলের অন্যান্য সকলেই নিজেদের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। একদিন সকাল বেলা সন্তোষ-কুমার রায় ওরফে সন্তোষদা (শ্রীনিকেতনের কার্পেণ্ট্রি শিক্ষক) আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও শ্রীনিকেতনের অফিসে একটি কার্য্য সূত্রে শ্রদ্ধেয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন, যদিও পূর্ব্বে শ্রীনিকেতনের ছাত্র হিসাবে তাঁহার সহিত খানিকটা পরিচয় ছিল। তারপর শ্রীনিকেতনে থাকা কালীনই গ্রামের কাজে তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। সেইসময় সুকুমারবাবু একটি পাঞ্জাবী যুবকের দ্বারা শ্রীনিকেতনে মৌমাছী চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা সেই যুবকটির নিকট হইতে মৌমাছী চাষ প্রণালী শিক্ষা করিতাম।

তিনি শ্রীনিকেতন থেকে চলে আসার কিছুদিন পরে আমাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে লিখেন। সেই সময় হইতে এই দীর্ঘ ৭।৮ বৎসর তাঁহার পাশে

থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ ও চিন্তাধারা এত বৈশিষ্টপূর্ণ ও নিজস্ব ছিল যে তাহা সাধারণ লোকের কল্পনাতীত। দিনের পর দিন লক্ষ্য করিয়াছি প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় তাঁহার সেই মহান ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে তাঁহার দেবতুল্য চরিত্রের সত্যকার রূপদান করা যায় না।

তিনি ছিলেন সত্যকারের কর্মবীর ও ত্যাগী। গীতার বাণী-অনাশ্রিত কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ॥ (অর্থাৎ কর্মফলের অকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যিনি কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী তিনিই যোগী)—তাঁহার মধ্যে জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি চাইতেন তাহার সহকর্মীগণ ও অধিনস্থ কর্মচারীগণ নিজেদের নির্দিষ্ট কার্য্যের মধ্য দিয়াই হউক বা অন্যভাবেই হউক সাধ্যমত কিছু জনহিতকর কাজ করেন। এবং সকলকেই সেইভাবে অনুপ্রাণীত ও উৎসাহ দান করিতেন। নানা প্রকার অজুহাতে তাঁহাকে কাজে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। কারণ তিনি যে কাজে নিজে কৃতকার্য্য না হইতেন বা যাহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিত সেইরূপ কোন কাজ কাহাকেও করিতে বলিতেন না। কর্মভীরু ব্যক্তিরা সেইজন্য তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। তাঁহার স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিল যে কাহারও সহিত ৩।৪ বৎসর পর দেখা হওয়া মাত্র ঐ ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে যে একটা সামান্য কাজের কথা বলিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন। সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা একমাসও স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। আমি জানি জনৈক কর্মচারী তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত ও তাঁহার অবস্থান সম্বন্ধে আমার নিকট প্রায়ই অনুসন্ধান করিত। অথচ কোন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত না। আমি একদিন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে সে বলিল "আমাকে রায় বাহাদুর কয়েকটি পুকুরের তীরে পেয়ারা গাছ রোপন করিতে বলিয়াছিলেন। বৎসর দেড় এ পর তাঁহার সহিত দেখা করিলে আমাকে সাদরে বসতে বলিলেন ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করিলেন। তারপরই বলিলেন "কতগুলি পেয়ারা গাছ পুতেছ?" আমি ত অবাক, কিসের পেয়ারা গাছ? আর পুঁতবই বা কোথায়? আমার এই অবস্থা দেখে তিনি বলিলেন "এরই মধ্যে দেখেছি সব ভুলে বসে আছ অমুক পুকুরের তীরে যে পেয়ারা গাছ পোঁতাতে বলছিলাম তাহার কী করেছ? তখন সমস্ত জিনিষটা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখনকার মত পরিত্রান পাবার জন্য বলিলাম "পেয়ারার চারা যোগাড় করতে পারি নাই"। ভেবেছিলুম এবারকার মত বেঁচে-গেলুম। কিন্তু পরক্ষনেই দেখি তিনি এক ভদ্রলোককে চিঠি লিখে দিয়েছেন, আমাকে কিছু পেয়ারার চারা সরবরাহ করিবার জন্য।

চিঠিটি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলাম। তারপর আজ পর্য্যন্ত আর দেখা করিবার সাহস পাই নাই। দেখা হলেই ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

তিনি ছিলেন সত্যকার কর্ম্মযোগী, কাজকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসিতেন। তাঁহার জনহিতকর কার্য্য প্রণালী কাগজে কলমে বা সভা-সমিতির বক্তৃতামঞ্চে সীমাবদ্ধ থাকিত না। শ্রীনিকেতনে থাকাকালীন দেখিতাম বিশ্বভারতীর আশে পাশের গ্রামের সাওতাল ও অন্যান্য চাষী মজুরেরা তাঁহার নিকট পরম আত্মীয়ের ন্যায় নিজেদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিত। দিনের পর দিন শীত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষাকে উপেক্ষা করে তিনি সাইকেল চড়িয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া সাঁওতাল ও অন্যান্য দরিদ্র পল্লীবাসীদের অভাব অভি-যোগের সুরাহা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় দেখেছি রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে কোন চাষীকে দেখিয়া তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট তর-কারীর ফলন চাষ খরচ এবং তাহা হইতে লাভ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিতেন। পরের দিনই যাহাতে ঐ নির্দ্দিষ্ট তরকারীর উন্নত ধরণের চাষ হয় সেই সকল প্রণালী চাষীদের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতেন। চাষীটিকে অল্পসময় অপেক্ষা করাবার জন্য দরকার না থাকলেও তাহার নিকট হইতে তরকারী কিনিতেন ও পরক্ষণেই কোন বন্ধুবান্ধব বা স্থানীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। শেষ রোগ শয্যায় শায়িত থাকিয়াও অসহ্য যাতনার যখনই একটু উপশম হইয়াছে তখনই আমাকে কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতে বলিতেন তারপর মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া সরকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ও স্থানীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে যাহাতে বাঁকুড়ায় ভেড়িয়ালদের মধ্যে উন্নত ধরণের কম্বল বয়ণ প্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়, তাহাদের পানীয়জলের ও শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, শুভঙ্কর ও বিড়াই খালের খনন কার্য্য ত্বরান্বিত করা হয়, ও বন সংরক্ষণের কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, ইত্যাদি সম্বন্ধে বলিয়া যাইতেন। তাঁহারই চেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার বাঁকুড়ার উপরোক্ত দুইটি সেচ পরিকল্পনাকে প্রথম তালিকায় স্থান দেন ও সেই অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করেন এবং বাঁকুড়ায় বন বিভাগের একটি আঞ্চলীক অফিস স্থাপন করেন।

এই প্রসঙ্গে বাঁকুড়ার জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি যে রংপুর থাকাকালীন সুকুমার বাবুকে সেখানকার স্থানীয় পল্লীবাসী মুসলমান চাষীগণ দেবতার মত শ্রদ্ধা করিত ও তাহাদিগকে দারিদ্র ও মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য আল্লার প্রেরিত মহামানব বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা বলিত "আমাদের উপর আল্লার অসীম দয়ার ফলেই বর্ত্তমান হাকিমের মত একজন আমাদের পরমাত্মীয় মঙ্গলার্থীর আগমন হইয়াছে। আমাদের অভাব অভিযোগ নিজে আসিয়া শুনা দূরে থাক ইহার পূর্ব্বে দারগা ছাড়া

কোন সরকারী কর্মচারীর পদার্পণ আমাদের গ্রামে হয় নাই। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় হাকিমেরাই আমাদের স্থায় পল্লীবাসী দরিদ্র চাষীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। আমরাও শহরে গিয়া অভাব অভিযোগ জানানোতো দূরের কথা, হাকিমের দর্শন লাভের চেষ্টা করিতেও সাহস পাইতাম না।" উপরোক্ত ভদ্রলোক তখন রংপুর মাদ্রাসার প্রধান মৌলবী ছিলেন।

সুকুমার বাবু, কাহারও মধ্যে কোন বিশেষ গুণের বা শক্তির অনুসন্ধান পাইলেই, তাহাকে সেই গুণ ও শক্তি জনহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য দিনের পর দিন উৎসাহিত করিতেন। এবং সেই কার্য্যের সফলতার জন্য জনসাধারণের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থার ভার তিনি লইতেন।

তিনি গ্রামকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। গ্রামের প্রত্যেকটী ধূলিকণা তাহার নিকট পবিত্র ছিল। গ্রামের অধিবাসীদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী মহলকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার বন-সংরক্ষণ ও বন-বর্দ্ধনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ভাবে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই দুই জেলায় যে ভাবে বন জঙ্গল নষ্ট করা হইতেছে, তাহাতে আগামী ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যেই যে তাহার ফলস্বরূপ অনাবৃষ্টি ও বর্ষারজলে বিধৌত মৃত্তিকার নিম্নস্থিত প্রস্তরের আবির্ভাবের ফলে জেলাদ্বয়ের একটা বড় অংশ মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে, তৎপ্রতি জেলাবাসীদের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসছিলেন। এবং প্রত্যেক বর্ষার প্রারম্ভে উপরোক্ত জেলাদ্বয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেন। উদ্দেশ্য ছিল যে এই উপলক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তত একটি বৃক্ষ রোপণ করিবে। নিজের শরীরকে অবহেলা করিয়া দিনের পর দিন তিনি গ্রামোন্নয়ন-কাজে পরিশ্রম করিয়া যাইতেন এই বিষয়ে কাহারও বারণ শুনিতে তিনি রাজী হইতেন না। শেষ যাত্রায় বাঁকুড়াতে আমাকে একদিন বলিলেন "সীতানাথ তোমার সাইকেলটি ভাল আছে? অনেকদিন যাবত সাইকেল চড়িনা।" আমি বুঝলাম সাইকেল চড়িয়া পাশের কোন গ্রামে যাইতে চান। আমি যদি বলতাম "আপনার শরীর বিশেষ ভাল নয়। এই অবস্থায় সাইকেল চড়া কী ঠিক হবে?" তখনই আমাকে বলিতেন "আমার শরীর ভাল কি খারাপ তাহার তুমি কী জান? তুমি ডাক্তার নও।" কাজেই সাইকেল চড়া হইতে বিরত করিবার জন্য আমি বাধ্য হইয়া বলিলাম "আমার সাইকেল ভাল নাই।" শেষের দিকে কলিকাতায় থাকা কালীন বৈকাল বেলা যখন কোথায়ও যেতেন, আমি তখন প্রায়ই সঙ্গে থাকিতাম। বাসে ট্রামে যেতে যেতে রাস্তার ময়লা, চিমনীর ধোঁয়া, রান্নার ধোঁয়া প্রভৃতি দেখিয়া বিরক্তি

প্রকাশ করিতেন। আর বলিতেন "কলিকাতা শহরে কী মানুষ থাকতে পারে ? গ্রামে কোথাও এই সব নাই তাহার পরিবর্তে আছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য চারিদিকে বিস্তারিত। গ্রামকে অবহেলা করার পাপ এই সকল শহরে পুঞ্জীভূত হইয়াছে।" তিনি আমাদের সেই প্রাচীন যুগের আদর্শ গ্রামের জন্যই সারা জীবন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন. যে গ্রামগুলি হইবে ধনধান্যে পরিপূর্ণ, আত্মনির্ভর শীল, সকলে উপভোগ করিবে অটুট স্বাস্থ্য ও সার্ব্বজনীন আনন্দোৎসব। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই বিশ্বভারতীতে গিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই মহান আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কবিগুরুও তাঁহাকে কিরূপ ভালবাসিতেন ও তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার বিভিন্ন গুণগ্রাহী বন্ধু কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে। আর একজন আত্ম-ভোলা কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী যে সুকুমার বাবুকে খুব ভাল বাসিতেন ও তাহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তিনি হইলেন দীনবন্ধু সি এফ এণ্ড্রুজ। শ্রীনিকেতনে থাকাকালীন দেখিয়াছি এণ্ড্রুজ সাহেব প্রায়ই শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীনিকেতনে (প্রায় একমাইল) পায়ে হাটিয়া আসিতেন। এবং সুকুমার বাবুর সঙ্গে আলোচনায় নিয়োজিত হইতেন। সুকুমার বাবুও শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুসময় এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে না কাটিয়ে ফিরিতেন না। তিনিও এণ্ড্রুজ সাহেবকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। পরে পথে যেতে যেতে এণ্ড্রুজ সাহেবকে যেখানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে সেখান দিয়ে যাবার সময় তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে কোনদিন দেখি নাই। কঠিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও যাহাতে যথাযথ দিবসে এণ্ড্রুজ সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী উৎযাপিত হয় তার জন্য রেভারেণ্ড বিলাস চন্দ্র মুখার্জীকে বার বার স্মরণ করাইয়াছেন। এবং উপরোক্ত অনুষ্ঠান ঠিক ভাবে বিলাসবাবুর দ্বারা উৎযাপিত হইয়াছে শুনিয়া অসহ্য রোগ যন্ত্রনার মধ্যেও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। একদিন সংবাদপত্রে দেখিলেন যে কোন একটী পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান এণ্ড্রুজ সাহেবের "Progress of Religion" বইটী প্রকাশ করিয়াছে। সেই দিন হইতে প্রত্যেকদিন আমাকে বইটী খরিদ করিয়া আনিবার জন্য বলিতেন। কিন্তু ডাক্তারের কোন বই পড়তে নিষেধ থাকার দরুণ তিনি সেই বইটী আর পড়তে পাইলেন না। তিনি যে ঘরে রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন সেই ঘরে তাঁহার স্বহস্তে বাঁধান একটি এণ্ড্রুজ সাহেবের ভাল ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও আমাকে বলিলেন ঐ ছবিতে একখানা মালা পরাইয়া দিতে। আমি সেইমত একখানা মালা পরাইয়া দিলাম।

তাঁহার ভালবাসা ও দানের মধ্যে কোনরকম কৃত্রিমতা বা বাহ্যিক

আড়ম্বরের স্থান ছিল না। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে। তিনি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মোটেই লক্ষ্য করিতেন না। কিন্তু অন্য কাহারও কোনরকম তিলমাত্র অসুবিধা বা অযত্ন হইতে দিতেন না। অনেকেই তাঁহার এই উদারতার অপব্যবহার করিতে ছাড়িত না। শেষ যাত্রায় যখন বাঁকুড়া যান তখন তাহার একটা চাকর তাহাকে বলে :—"বাবু রাতে মশা কামড়াচ্ছে" আমি তখন বাঁকুড়া সহরেই ছিলাম। পরদিন সকালে তাঁহার নিকট গেলেই আমাকে বলিলেন :—"সীতানাথ দরবারীর জন্য একটি মশারী কিনে দিও।" আমি বলিলাম "মশা তো লাগছে না। তাছাড়া দরবারীর মশারীতো একটা রয়েছে কল্‌কাতায়।" আমাকে ধমক দিয়ে বলিলেন :—"কলকাতায় তো আমি আজই যাচ্ছিনা—তাছাড়া ও যখন বলছে মশায় কামড়াচ্ছে—মশারী কিনিয়া না দিলে ও আবার পড়বে ম্যালেরিয়ায় "আমি বলিলাম আচ্ছা কিনে নিয়ে আসব।" আর একদিন সকলে যেতেই আমাকে বলিলেন :—"দরবারীর নাকি ঠিকমত হজম হচ্ছে না।" বল্লুম :—"খাবার হয়ত কোন গোলমাল হয়েছে এখানে ভাল হোমিপ্যাথি ডাক্তার আছে ঔষধ এনে দিচ্ছি ভাল হয়ে যাবে।" বল্লেন না, হোমিওপ্যাথি ঔষধে ওর বিশ্বাসই নেই। ওকে দুর্গাদাস বাবুর (ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, এম বি) নিকট নিয়ে যাও।" সারাদিন দরবারীর শরীর পরীক্ষা, পায়খানা পরীক্ষা ও ঔষধ কেনায় কাটল। পরদিন হইতে দরবারীর ইনজেক্‌সন লওয়া সুরু হইল। কাহারও কোন অসুখ হইয়াছে জানিতে পারিলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তিনি প্রত্যহ সকালে অঙ্কুরীত ছোলা বা মুগ খাইতেন এবং সেখানে যে থাকিত তাহাকে খাইতে বলিতেন। অনেক সময় আমাকে সাময়িক পেটের গোলমাল থাকা সত্ত্বেও ছোলা মুগ খাইতে হইয়াছে। কারণ আমার পেটের গোলমাল হইয়াছে জানিতে পারিলে তখনই নিজেই হয়ত আমাকে নিয়ে ডাক্তারের নিকট হাজির হইবেন।

তিনি যে কত দুঃস্থ পরিবার গরীব ছাত্র, ও বেকার যুবককে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন ও করিয়াছেন তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। আমার উপর আদেশ ছিল বাঁকুড়ায়, তাঁহার পিতার আমলের একটি বৃদ্ধা ঝিকে ও তথাকার একটি ছাত্রকে মাসে মাসে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা, তাঁহার পক্ষ থেকে দিবার। তিনি বাঁকুড়া যখন যাইতেন তখন আমাকে ঐ বাবদ একটি চেক্ দিয়া আসিতেন। উপরোক্ত বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তাহার ছেলেরা বৃদ্ধার শ্রাদ্ধের টাকাও সুকুমার বাবুর নিকট হইতে পেয়েছে। উপরোক্ত ছেলেটীকেও তিনি বাঁকুড়া গেলেই নির্দ্দিষ্ট টাকা ছাড়া ও টাকা দিয়া আসিতেন। নানারকম কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক মাসে টাকাটা ঠিক সময় মত দেওয়া

হইয়াছে কিনা আমার নিকট পত্রযোগে খোঁজ লইতেন। তাঁহার সান্ত্বনা বাণী এতই প্রাণস্পর্শী ও বৈশিষ্টপূর্ণ ছিল যে তাহা সাধারণের কল্পনাতীত। ১৯৫২ সনে বাঁকুড়ায় থাকাকালীন আমার সংসারের শেষ বন্ধন ছোট ভাই মারা যাওয়াতে খুব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সময় শ্রদ্ধেয় সুকুমার বাবুর প্রত্যেকটী পত্র পড়েই মনে হয়েছে যে কোন্ দেবলোক হইতে শান্তির বাণী বর্ষিত হচ্ছে।

আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীর কৃষির, কুটীর শিল্পের অনাবাদি জমির বনসংরক্ষণের ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আরও প্রকট হইয়াছে। এই সঙ্কটময় সময়ে তাঁহার ন্যায় একজন পল্লীহিতৈষী কর্মযোগীর তিরোধানে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তিনি যে আদর্শকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহার সফলতার দ্বারাই বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গকে বর্তমান সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ করা যাইতে পারে। সরকার ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার উপরই তাহা নির্ভর করে। আমাদের বর্তমান সরকার নিশ্চয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে কৃপণতা করিবেন না।

শ্রীসীতানাথ বণিক্

ব্রতীশ্রেষ্ঠ সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

কতো লোক আসে, কতো লোক যায় কাঁদাইয়া, হায়, কতো সংসার,
কতো ফুলমালা শুকাইয়া যায়; কে রাখে সঠিক হিসাব তার?

এরি মাঝখানে হয়তো একটি সোনার মানুষ আসিয়া, হায়,
যাবার বেলায় সকলের বুকে বড় ব্যথা দিয়ে চলিয়ে যায়;

তাঁহার বিরহে কেঁদে ওঠে মন, চোখ ফেটে ঝরে নয়ন জল;
ক্ষণে ক্ষণে বুকে জাগে হাহাকার, অকারণে মন কাঁদে কেবল।

আবর্তন বিবর্তনশীল জগতে মানুষের আবির্ভাব তিরোভাব চিরাচরিত প্রথা। নিজ নিজ ইতিকর্তব্য শেষ করে সংসার থেকে বিদায় গ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ লোকেরই নাম নিশানা কালের স্রোতে ভেসে যায়। ইহারা নিজেদের জন্যই যেন এসেছিলেন এবং নিজেদের জন্যই জীবন ব্যয় করে চলে যান। এদের বিয়োগব্যথা মানব সমাজে তেমন অনুভূত হয় না। কিন্তু এমন লোকের আবির্ভাবও হ'য়ে থাকে যাদের বিয়োগব্যথা মানব সমাজে অপূরণীয়।

আজ আমরা যাঁর কর্মবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছি, তিনি ছিলেন ব্রতীশ্রেষ্ঠ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বাংলা মায়ের একজন কৃতি সন্তান এবং নীরব কর্মী। নিজে নাম জাহির চেষ্টা না করলেও তিনি বাংলা ও ভারতের সুধী সমাজে সুপরিচিত। কর্মজীবনের বেশীর ভাগই তিনি রাজকার্যে ব্যয় করেছেন। তথাপি সুযোগ সুবিধেমত তাঁর গণসেবার প্রেরণা রাজকার্যের ভেতর দিয়েও আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের একজন নামজাদা সদস্য। সুদক্ষ বিচারক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। শাসন সংরক্ষক হিসাবেও তিনি ছিলেন পক্ষপাতশূন্য ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক।

তাঁর কর্মজীবনের শেষভাগে কতিপয় বছরের জন্য তাঁর সঙ্গে আমাদের মেলামেশার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি তখন ডিপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার। আমরা তখন তাঁকে অফিসার হিসাবে যতটা চিনেছি পল্লী উন্নয়নের গুরু হিসাবে তার চেয়ে অধিক চিনেছি। স্বনামধন্য হাফিজ সৈয়দ মহম্মদ ইসহাক, আই, সি, এস্ সাহেবের সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে তিনি ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার পদগ্রহণ করেন। ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্ব ও জনহিতকর কার্যে প্রেরণার দিক দিয়া শ্রীহট্টের মৌলভী আবদুল করিম বি, এ, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ রায় বাহাদুর কে, সি, রায় এবং ডাঃ ওয়েষ্টের (ইঁহার প্রত্যেকেই মতানৈক্যের জন্য গবর্ণমেন্ট চাকুরীতে ইস্তাফা দেন) সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে। চাকরীজীবী হলেও তাঁর ভেতরে সৎসাহসের অভাব ছিল না। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না।

সমাজ সেবা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাই, সমাজ সেবার ভেতরে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা তিনি বরদাস্ত করতেন না। ইহাতেই তাঁহাকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে তাঁর ভেতরে প্রভুভক্তির অভাব ছিল। আমরা উহার প্রতিবাদ করি। তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব বিলিয়ে দিয়ে "হাঁ হুজুরের দলে" মিশিবার মত মেজাজ ধারণ করিতেন না। কাজ না করে বাইরের নাম কেনা তাঁর অভীষ্ট ছিল না তাই সরকার প্রদত্ত খেতাব ও মেডেলগুলি পরিত্যাগ করতে তিনি মোটেই দ্বিধাবোধ করেন নি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ কুসংস্কার বর্জ্জিত ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন।

পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে তাঁর স্বদেশ বাৎসল্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যে একমাত্র বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই জাতীয় নিরক্ষরতা বিদূরিত করা যাবে না। তাই বয়স্কদের শিক্ষার আশু ব্যবস্থারও যে যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে তা

তিনি বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। বয়স্কশিক্ষার পরিকল্পনায় তাঁর দান বিরাট ও বিপুল। সহজতর প্রণালী অবলম্বনে যাহাতে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তার কতকগুলি উপায় তিনি উদ্ভাবন করে গেছেন। "পড়ার বই" পুস্তিকাখানি বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর কীর্ত্তি সৌধরূপে বিরাজ করবে।

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করাও তাঁরই পরিকল্পনা। জ্বালানী কাঠের পরিকল্পিত অভাবও তাঁর চিন্তা ধারার বাইরে থাকতে পারে নি। বৃক্ষরোপন সপ্তাহে যাহাতে জ্বালানী কাঠের বৃক্ষও রোপিত হয় তার উপদেশও তিনি দিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে রোপিত নানাবিধ ফলের গাছের প্রতি দেশের দৃষ্টি আপাততঃ আকৃষ্ট না হলেও দেশ অদূর ভবিষ্যতে উহা উপলব্ধি করবেই করবে। সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই দূরদর্শিতা ভবিষ্যৎ বাংলার প্রচুর কল্যাণ সাধন করবে।

পুকুর সংস্কার ও সেচ পরিকল্পনা তাঁর অন্যতম অবদান। দরিদ্রের অন্ন জলের সংস্থান ছিল তাঁর আর এক চিন্তা। জীবনধারণের পক্ষে আহার্য্য উৎপাদন অপরিহার্য্য। দেশের নেতৃবৃন্দ ইহা বুঝে থাকলেও স্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করার মত অনুভূতি তাঁদের ভেতরে সম্যক্ জাগ্রত হয় নি। যা হোক্ এই অন্নসঙ্কটের যুগে কর্ণধারগণ তাঁর ব্যাপক সেচ পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতে সাগ্রহে অনুধাবন করবে বলে আমরা আশা রাখি। তিনি আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে পঙ্কিল জীবনজালে বাংলার জাতীয় জীবন আশু ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই তিনি পুরাতন পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার করার আর এক পরিকল্পনা রেখে গেছেন। ইহা দ্বারা কৃষি ও স্বাস্থ্য—উভয়েরই ব্যবস্থা করেছেন।

কৃষককুলের মঙ্গল বিধান তাঁর জীবনের আর এক মহান ব্রত ছিল। তিনি ধনী গৃহের সন্তান হয়েও দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে পরম দরদ ও শ্রদ্ধার সাথে নানা বিষয় আলাপ আলোচনা করতেন। বরিশালের আল্‌কাজউদ্দিন নামক জনৈক দরিদ্র কৃষক কর্ম্মীর সঙ্গে তাঁর অকপট আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে তাঁর সহৃদয়তা ও মহত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তিনি আলীশান অট্টালিকায় বসবাস করলেও তাঁর নাড়ীর টান ছিল পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র পর্ণকুটিরের দিকে। সমবায় ভিত্তিতে কৃষককুলের মঙ্গলের জন্যও তিনি কিছু বিধি নিয়ম প্রবর্ত্তন করে ছিলেন। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তবে আমরা তাঁর চরণারবিন্দে এই প্রার্থনাই গাইতাম,

"ওরাই দেশের আসল মানুষ, ওরাই মোদের কৃষকদল ;
ওরাই মোদের আশার আশা, ওরাই মোদের বুকের বল।
ওদের সেবাই দেশের সেবা, ওদের ভালই দেশের ভালো ;
দরদ দিয়ে ওদের বুকে আবার আশার প্রদীপ জ্বালো।

ও মরমী-ও মরমী-দরদ ভরা তোমার প্রাণ ;
ওদের মুখে ফুটিয়ে-তোল হাসির সঙ্গে আশার গান ;"

আর্ত্তের সেবায় তাঁকে প্রাতঃস্মরণীয় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রধান শিষ্য বলা যেতে পারে। আর্ত্তের সেবায় মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়, ইহা তিনি ভালরূপে অনুভব করে ছিলেন। তিনি জানতেন যে মানুষের সেবাই নারায়ণের সেবা। শেষজীবনে দুঃস্থের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তারই ফলে তাঁকে অচিরে মৃত্যু বরণ করিতে হয়।

আজকাল আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্ক খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু তাঁর জীবনে ইহার বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীলাভ করেও ধর্ম্মকে ত্যাগ করেন নি। তিনি জানতেন যে ধর্ম্মহীন শিক্ষা কুশিক্ষা। সাধারণ বেশভূষা তিনি পছন্দ করতেন। চাপকান পরিধান করায় তিনি গর্ব্ব অনুভব করতেন।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং দেশময় সংগঠনের একটা বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছে। এমনি সময় তাঁর মত যশোনির্লোভ কর্ম্মবীরের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু ওপারের ডাক সে প্রয়োজনের ধার ধারে না। দুর্ভাগ্য বাংলার। তাই বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বাংলার কর্ত্তব্য পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। আমরা মনে করি তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

তাঁর পরিজনবর্গকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে একটা কথা তাঁদের কাছে বলবার আছে তিনি তাঁদের কাছ থেকে ১৯৩৮ সালেই বিদায় নিয়েছিলেন। যে দিন তিনি মাসিক ১২০০ টাকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেদিন থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি যে পরিকল্পনাটি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে দিয়ে গিয়েছেন তাও তাঁদের জন্য নয়। উহাও বাংলার আপামর সাধারণের জন্য। সুতরাং হিসাব করলে দেখা যায় যে পল্লীবাংলার ক্ষতির পরিমাণ তাঁদের চাইতে ঢের বেশী। কারণ তাঁর পরিজনবর্গের চেয়ে তাঁর ভক্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক। উপসংহারে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সাথে সুর মিলিয়ে আমরা হতভাগ্য ভক্তকুল অযুত কণ্ঠে এই শোকগাথাটি গাহিয়া আজকের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করব—

সহিতেই হবে এ বেদনা বুকে—মুছিতেই হবে চোখের জল ;
দেবতার এ যে নিঠুর লীলা—নিয়তির এ যে নিঠুর কল।

পরম ব্যথার আঁধারের মাঝে—সবারি আসে বরষ কালো,
তারি মাঝে ফোটে নবীন জীবন—জীবনের চির নবীন আলো।
কঠিন শোকের আগুনে কেনরে আশার মুকুল পুড়িয়া যায় ?
এ মহা 'কেন'র কে দেয় উত্তর ? কে দেয় মধুর সান্ত্বনা হায় ?
তবু সহিতেই হবে এ বেদনা বুকে, মুছিতেই হবে নয়ন বারি ;
বাহিতেই হবে জীবনের বোঝা—সফল করিতে ইচ্ছা তাঁরি।

রেঞ্জ ইনসপেকটার, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এম্, এ, আজিজ
ময়মনসিং

বাঁকুড়ার সুকুমার

দাদামশাই আমাদের ছেড়ে যাবার পর প্রায়ই দেখেছি যেখানেই তাঁর কথা হয় সেইখানেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর সুপ্রচুর স্তুতিবাদের মধ্যে একটি বিশেষ কথা—লব্ধপ্রতিষ্ঠ সত্যের গরিমায় বারে বারেই ভাস্বর হয়ে উঠে। কথাটি—"বাঁকুড়া ও সুকুমার।" পরস্পরের জীবনে পরস্পর রক্তমাংসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ বলেই ওঁর সম্বন্ধে কথাটা এত স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করা নিকষ সত্য এবং সত্যিকারের নিকষ সোনার বর্ণচ্ছটায় এতো বড়ো বিস্ময়কর। কিন্তু এই কি তাঁর একমাত্র পরিচয় ? স্বীকার করি 'সুকুমার' কথাটির একটা নিজস্ব তাৎপর্য আছে, আর তাইতেই বাঁকুড়ার সঙ্গে ওঁর যা সম্পর্ক তাতে ঐ তাৎপর্যটুকু কী পর্যন্ত যে মহিমান্বিত—কী পর্যন্ত যে সার্থক তা নির্ণয় করার প্রয়াস পাচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু 'সুকুমার' হিসেবে সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যে আদর্শ হওয়া উচিত—বাঁকুড়ার প্রতি তাঁর যথা কর্ত্তব্যে তার কী তিনি করতে পেরেছেন ? কী পর্যন্ত যে তিনি করতে পারতেন—আর কী তিনি করে যেতে পারেন নি, এর হিসেব নিকেশ করবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারাই বাঁকুড়ার প্রত্যেকটি ধূলিকণার সঙ্গে তার সুকুমারের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুর সম্পর্ক যারা প্রত্যক্ষ করেছে ঐকান্তিক ও নিকটতম সান্নিধ্যে, তাঁর অনবসর ব্যক্তিজীবনের উচিৎ বিশ্রম্ভালাপে, কর্মজীবনের দায়িত্বানুশীলনের প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ; আর তাঁর ধ্যানমার্গের উজ্জ্বল সুসমৃদ্ধ বাঁকুড়ার বাস্তব বিগ্রহদানের একের পর এক রচনা শৈলীতে চিত্রকরের দীপ্ত তুলির মুখে, ভাস্করের অপরূপ শিল্পপ্রতিভায়। তাই—তাঁর কর্মজীবনের সহযোগী ধর্ম জীবনের সোদর-আত্মা, মর্ম-জীবনের নর্মসখা যারা তারাই এ পরিচয় দিতে পারবে প্রকৃষ্টতররূপে। ব্যক্তিগত পরিচয় বাহ্যিক ভব্যতা ছাড়িয়ে যেখানে নিবিড়তর হতে নিবিড়তমতে পরিণত না হয়েছে—সেখানে মন্দিরের বাইরের

চরিত্রের গৌরব, মেধাবী বিরাটত্ব, আন্তরিক শিল্প সৌন্দর্য সবই বহি-ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ভিতরের রহস্য অনুদ্ঘাটিতই থেকে যায়। কল্পনায় হয়ত তা অনুধাবন করা যায় তবু বাস্তব যোগসূত্রের শৈথিল্য সেখানে অনিবার্য। দাদামশাই-এর যারা বাইরের পরিচয়ই পেয়েছে তারা তাঁর ব্যক্তিত্বের দুর্গপ্রাকার সমুন্নতিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছে; পরাধীন ভারতের নামকরা রাজপুরুষের মধ্যে আদর্শ দেখে বিভ্রান্ত হয়েছে, বাঙালী ঘরের হিন্দু সন্তানের মধ্যে পাশ্চাত্য তৎপরতা সুশৃঙ্খল জীবন অনুসৃত আচারের নিয়মনিষ্ঠায় সঙ্গে ও দেশীয় সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ধারায় সম্যক কৃতবিদ্য এক 'রায়বাহাদুরের' অন্তরে আর্য ঋষির বৈদিক প্রজ্ঞা আর উদার্যকে একবৃন্তে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্‌ও অনেকে হয়েছে—কিন্তু কজন দেখেছে তাঁকে—হতাশার আঁধার রাতে একলা পাগোল জীবনের একতারাতে বৈরাগীর সুর চড়িয়ে যখন ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছে অশ্রুজলের বন্যায়? এই বাঁকুড়ার উষর মরুতে মরূদ্যানের স্বপ্ন নিয়ে জাগ্রৎ সুকুমারকে, কজন দেখেছে তাঁর বিনিদ্র রজনীর প্রহর গণনায়—জলভরা চোখের নির্নিমেষ আত্ম-তর্পণে? এ দেখা যে দেখেছে—দেবতার হাতে উৎকীর্ণ মন্দিরের বহিরঙ্গ বাণীই শুধু তাঁকে বলে দেয় নি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত" জলদমন্দ্রস্বরের অন্তর্দেশের কথাও কানের ভিতর দিয়ে মরমে তার পথ খুঁজেছে"—মম ব্রতেতে হৃদয়মস্তু।"

কিন্তু সর্বশ্রেয়ঃ বিস্ময়ের সমাবেশ এইখানেই—"সে দেশের কথা এদেশে কহিলে মরমে লাগয়ে ব্যথা"—কারণ সেখানে যাঁর অধিষ্ঠান—তাঁর স্বরূপ ধ্যান করতে পারে এমন তো 'লাখে না মিলয়ে এক।' আমি তাঁকে একবিন্দুও বুঝতে পারিনি। কতবার মনে হয়েছে:—তিনি আমারই দাদামশাই, একান্ত ভাবেই আমার নিজের, তাঁর মধ্যে রয়েছে আমার স্নেহান্ধ পিতা, স্বর্গীয়া মায়ের অমৃত-নিস্যন্দিনী পিযূষ-নির্ঝর, রয়েছে আমার অগ্রজের প্রদীপ্ত বাসনা আমাকে 'মানুষ' করে তোলার। পরক্ষণেই দেখেছি-এ বিশ্বাস আমার ভুল: তিনি কারো একার ছিলেন না, বিশ্বজগৎ যখন তাঁকে ডেকেছে তখন কেউই তাঁর আপন-পর ছিল না, তাঁর বিধাতা যখন তাঁতে জেগেছে তখন সব ঠাঁই-ই ছিল তাঁর ঘর। তাঁর বুকের কতখানি জায়গা আমি নিতে পেরেছি"—এই আনন্দে বুকটা যখন আমার ভরে উঠেছে সব চাইতে বেশী, তখনই দেখিছি এ আনন্দের গর্ব নিয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে আত্মীয় বান্ধব, স্বজন প্রতিবেশী সকলকেই, যাঁরা তাঁর এতটুকুও সান্নিধ্যে এসেছে। বাঁকুড়ার সমবায় আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক সভায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় শান্তিনিকেতন হতে। সেদিনের ধুতি চাদর পরিহিত এক খদ্দরধারীকে দেখে বিস্মিত জনতা প্রশ্ন করেছিল—"আমাদের সুকুমার বাবু?" তাদের অন্তরের কোন্‌ গভীর হ'তে এ প্রশ্ন

উৎসারিত হয়েছিল আজ যেন তার সন্ধান পেয়েছি। উত্তরে বলতে ইচ্ছে করে সুকুমার বাবু তো শুধু আমাদেরই নন, বাংলার দরবারে এই অনগ্রসরতম জেলার দীনতম ভিখারী তিনি, ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সকাশে বাংলার সুকুমার বাবু তিনি, আন্তর্জাতিক সমাচারে ভারতের গ্রামোন্নয়ন কর্মী শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন সচিব রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন সুকুমার বাবু তিনি।' আজ আরো জেনেছি, প্রাচীন ও অর্বাচীন বিদ্যাভিমানীর দ্বারে নিরক্ষর বয়ঃপ্রাপ্তের অস্বীকৃত শিক্ষাধিকারের দাবী দাওয়ার সত্যাগ্রহী তিনি, মাটির রিক্ততা যাদের ঐহিকের সম্বল, দেবতার নিষ্করুণ চোখে তাদের তরে দু'ফোঁটা অশ্রু আনার তপস্বী তিনি। ভারতের 'মাটিতে দেবতার মানুষের হয়ে একদা কৌশুলী করতেন যাঁরা, ব্রাত্যের হয়ে যাঁরা রক্ত নিতেন তাঁদেরই স-গোত্র এই গোত্রহীন সুকুমার। কিন্তু তবু অন্তরঙ্গভাবে পার্থিব সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ওতঃপ্রোত থাকলেও এদের বাঁধন তাঁর জীবনে কোন দিনই সত্যতা পায়নি। তিনি ছিলেন সত্যই মুক্তপুরুষ, মৈত্রেয়ীর দলের লোক, "যেনাহং নামৃতস্যায় তেনাহম্ কিম্ কুর্যাম্"—এই ছিল তাঁর অন্তরের কথা, অর্থাৎ 'বীতরাগ' ঋষি। মহামুনি কণ্বের চিত্তবৈক্লব্য তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি বলেই আজ একথা বলা যায় যে, 'তিনি আমাদের ছিলেন না, এই এই পৃথিবীরই কেউ তিনি ছিলেন না, দেবতার দূত তিনি, আদর্শের জ্যোতির্লোকে আজীবন শুধু পাখাই ঝপটিয়েছেন; কঠিন মাটির শিরায় যেখান তীব্র বিষের উদ্গীরণ সেখানে কোথায় তাঁর পক্ষপাত? কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় এও কি তাঁর সত্যিকারের পরিচয়? না—সংস্কারের চোখে তাঁর উপর আবার বিকৃতি আরোপ করছি ঋষিত্বের মোহে পুড়ে! কারণ এই আমিই তো দেখেছি একটা সামান্য গাছের ততোধিক সামান্য একটা ডাল ভাঙলে অন্তঃসত্ত্বের ব্যথায় বিধুর হয়েছেন তিনি, মানবীয় আন্তরিকতায় এ অন্যায়ের প্রতিকারের তিনি খুঁজেছেন প্রয়াস; মনে হয়েছে 'এ ব্যথা তো শুধু মানুষকেই সম্ভবে!' কেন না

অশ্বত্থ শাখার

প্রান্ত হ'তে খসি' গেলে জীর্ণতম পাতা
যতোটুকু বাজে তার ততোটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি বাজে!"

তাই বলেছিলাম ওঁকে আমি বুঝতে পারিনি একটুকুও।

জানি জীবন তাঁর কাছে সুখপ্রদ ছিলনা, তাঁর দিকে চেয়ে কতবার মনে হয়েছে "His was a soul in a gitation" কে যেন, সেথায় বলতে চেয়েছে 'I fall upon the thorns of life I bleed।" যাঁরা তাঁর জীবনেতিহাস

জানেন তাঁরা বলেন 'জগৎকে তিনি দেখে গেছেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।" অবিশ্বাস করি না, কিন্তু বিশ্বাসই বা করি কী করে? তাঁরই মুখে যখন শুনেছি কেমন অচেতন মনে তাঁকে বলতে তাঁরই গুরুদেবের বাণী

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি সেথা
তোমার আদেশে।"

তাঁর মুখে একথা শুনেছি বলেই বলছি না, তবু বৈষ্ণবের আখরের মতো বেদের 'সূক্তের' মতো এও কী তাঁর জীবনের একটা সত্য নয়? জানি, তিনি নিষ্ঠুর কোনদিন হ'তে পারেননি; জানি না হয়তো পেরেও থাকবেন কিম্বা হয়তো দুটোই সত্য কোন্ অদৃষ্ট ভবভূতির অসাধারণ সৃজন শিল্পে। তাই মানুষের কিনা বলতে পারি না, আমার বোধগম্যের বাইরে তিনি, আমি শুধু বুঝেছি এতটুকুই এমন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে ঝড় বাদলের আঁধার রাতে পথ চলতে হয় নি—ভবভূতির শ্রীরামকেও।

এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী
বাঁকুড়া-ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি

শ্রীনন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রাবস্থায় সুকুমার

সে আজ ৪৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এবং সুকুমার মেদিনীপুর কলেজ হইতে F. A. (বর্ত্তমান I. A.) পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসি। পূর্ব্বে অবশ্য কোন পরিচয় ছিল না। একদিন ক্লাশ বসিয়াছে, এমন সময় দ্রুত পদক্ষেপে নূতন জুতার মশ্‌মশ্‌ শব্দ করিয়া একটি সুদর্শন বালক ক্লাশে প্রবেশ করিল। জুতার শব্দে সকলেরই সেইদিকে দৃষ্টি পড়িল। আমারও পড়িল। সেদিনকার ক্লাশ শেষে হিন্দু হোষ্টেলে ফিরিবার সময় দেখি ঐ বালকটিও হোষ্টেলেই যাইতেছে। কলেজ হইতে হিন্দু হোষ্টেলে যাইতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বালকটির নাম সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। F. A. পরীক্ষায় Third হইয়াছে এবং Scienceএ প্রথম স্থান অধিকার করায় Scienceএর Duff Scholarship পাইয়াছে। তাহার ৩।৪ দিন মধ্যেই পরিচয় আলাপ হইল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই জানিলাম নামেও সুকুমার চেহারাতেও সুকুমার এবং অন্তঃকরণের দিক দিয়া আরও সুকুমার।

অতঃপর ক্রমশঃই তাহার দিকে উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইলাম এবং উভয়ের

মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই প্রগাঢ় সৌহার্দের স্থিতি হইল। সুকুমার থাকিত দোতলায় এবং আমি থাকিতাম একতলায়, কিন্তু দিনের মধ্যে অন্ততঃ ৩.৪ বার আমার ঘরে সে আসিত। তাহার পর চারি বৎসর কাল আমরা ঐ হিন্দু হোষ্টেলেই ছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে তথায় আমাদিগের বহু ছাত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল। অনেকেই এখন খ্যাতনামা। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, বিচারপতি মজুমদার মহাশয় প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

তৎকালীন রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হইয়া পড়িয়া লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার ফলে M. A. পরীক্ষায় সুকুমার তেমন ভাল স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। বিনয় সরকারের মত ছাত্র যিনি B. A. পরীক্ষায় English এবং Historyতে উভয় বিষয়েই 1st. Class 1st. হইয়াছিলেন তিনিও M. A. পরীক্ষায় 2nd. Classএ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি চিরকালই একটু পিছিয়ে পড়া দলের লোক, সেজন্য ঐ সব আন্দোলনে তাহাদের ন্যায় অত তীব্রভাবে জড়িত হইতে পারি নাই। আমিই প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সুকুমার এবং বিনয়কে ২।৩ ঘণ্টা আটকাইয়া রাখিতাম এবং পাঠ্য-পুস্তকগুলি তাহাদিগকে পড়াইয়া শুনাইতাম। নচেৎ হয়ত তাহারা পরীক্ষাই দিত না।

যাহা হউক, বিনয় সরকার ক্রমশঃই আগাইয়া চলিলেন এবং আমরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিলাম। সুকুমারের পিতা ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং সরকারী কর্মচারী। তিনি সংবাদ পাইয়া একদিন হোষ্টেলে আসিয়া সুকুমারকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া গেলেন এবং আমাকেও বলিয়া গেলেন যেন বেশী দূর না গড়ায়। ফলতঃ বেশীদূর গড়াইল না এবং সুকুমার শুধু পিতৃ আদেশে Bengal Civil Serviceএর Executive Departmentএ চাকুরী গ্রহণ করিল। ঐ চাকুরী তাহার পক্ষে আজীবন একটা সমস্যাই ছিল, যদিও চাকুরীতে তিনি ক্রমশঃই উন্নতির পথে উন্নীত হইয়া শেষ পর্যন্ত I. G. of Registrationএর পদে বহাল হইয়াছিলেন। তথাপি চাকুরী জীবন তাহার কোনদিন ভাল লাগে নাই। এবং শেষ পর্যন্তঃমেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার বহুপূর্বেই তিনি অর্থ ও উচ্চপদ তুচ্ছ করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত শ্রীনিকেতনে চলিয়া যান। সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনের মধ্যে তিনি কখনও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন নাই। সরকারও তাঁহাকে ষোল আনা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য তাঁহাকে Executive Departmentএ উচ্চপদ না দিয়া bypass করিয়া Registration, Village welfare, Tanks Excavation

ইত্যাদি harmless departmentএর উচ্চপদে বহাল রাখিতেন বলিয়া মনে হয়।

সুকুমারের সহিত বহুবারই আমার মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু সেই পাঠদশায় যে অমায়িকতা তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল তাহা শেষ জীবন পর্য্যন্ত আমি অক্ষুণ্ণই লক্ষ্য করিয়াছি। জীবনের তিক্ততা তাহার স্বভাবের মাধুর্য্য কোনদিনই নষ্ট করিতে পারে নাই।

হিন্দু হোষ্টেলে থাকাকালীন সে আমাদিগের সকলেরই প্রীতিভাজন ছিল এবং বহু ছাত্রই তাহার সরল ব্যবহারে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইত।

পাঠদশাতেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি সুকুমারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তখন রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজ পান নাই, তাঁহার কবি যশ দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে নাই। কাজেই এদেশে তত খ্যাতি তিনি পান নাই। তথাপি তখনও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা কম ছিল না। আমাদের সুকুমার তাহাদের একজন। সুকুমারের স্মরণশক্তিও ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। রবিঠাকুরের পদ্য ত অনেকেই আবৃত্তি করিতে পারিতেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য পদ্য সুকুমার যেরূপ বিশুদ্ধভাবে মৌখিক আবৃত্তি করিত তাহা বিস্ময়ের বস্তু। তখন অধ্যাপক মোহিত সেনের একটা রবিঠাকুরের সংস্করণ ছিল। সুকুমার তাহারই এক খণ্ড হইতে আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইত। ক্রমে আমার ন্যায় ছাত্রগণও একটু আধটু কাব্যামোদী হইয়া পড়িল। রবিঠাকুরের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহা এরূপ পরিণতি লাভ করে যাহা তাহার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণের নিকট অনেক সময় বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইত।

এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুকুমার হোষ্টেল ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং আমিও B. L. পাস করিয়া কৃষ্ণনগর চলিয়া যাই। ঐ ছাড়াছাড়ি হওয়ার পূর্ব্বে সুকুমারের বিবাহ হয়। সুকুমারের পিতা তখন বহরমপুরে থাকেন। বিবাহ হয় বাঁকুড়া হইতে। বাঁকুড়ায় তাহাদিগের পৈতৃক নিবাস। ঐ বিবাহ উপলক্ষ্যে আমি বাঁকুড়ায় যাইয়া এক পক্ষাধিক কাল তথায় ছিলাম। তাহার সহিত শেষ দেখা তাহার নৈহাটীর বাসায়।

এই বয়সে যখন পূর্ব্বের ভাবনা চিন্তাহীন দিনগুলির কথা মনে পড়ে তখন সুকুমারের সহিত আমার যে বন্ধুত্ব ছিল তাহার বিষয় স্মরণ করিয়া একদিন সুকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের যে কয় লাইন আমাকে শুনাইয়াছিল তাহার আবৃত্তি করিয়া শেষ করিব :—

"বাল্যকালে যাহাদের ভালবাসিয়াছ, যৌবনে যাহাদের সহিত অত মেলামেশা করিয়াছ, প্রৌঢ়কালে তাহাদের কয়জনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ

হয়? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে কয় জন বাঁচিয়া থাকে? তখন সবই যায়, থাকে কেবল সেই বাল্য ও যৌবনকালের স্মৃতি। কিন্তু সেই স্মৃতিটুকু কত মধুর!

১৩।১ রামচাঁদ দত্তর লেন, কলিকাতা শ্রীবরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

ক্ষমাসুন্দর সুকুমার

বন্ধুবর ৺রায় বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। বাল্যবন্ধু স্মৃতি অতি উপাদেয়, অমৃত হইতেও তৃপ্তিকর। তাই অতি আগ্রহে আমি সেই পুরানো স্মৃতির পুনঃ আরাধনা করিতেছি। সে আজ ৪৫ বৎসরের কথা।

আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে পড়ি ১৯০৪ ইংরাজীর প্রথম ভাগে, সুকুমার বাবু তখন কৃতী ছাত্র। প্রেসীডেন্সী কলেজে তিন বিষয়ে অনারস্ লইয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্য ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতে আসেন। তখন তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তিনি ৫৪ নং রুমেও আমি ৫৭ নং রুমে থাকিতাম। ঐ সময় আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হয়।

সুকুমার বাবু অতি সরল ও সুন্দর প্রকৃতির যুবক ছিলেন। তিনি নামেও যেমন সুকুমার ছিলেন দেখিতেও তেমনি প্রিয় দর্শন বুদ্ধি উজ্জ্বল সুকুমার ছিলেন। তাঁহার সকলের প্রতিই অগাধ প্রীতির ভাব ছিল বন্ধুমহলে সকলকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালোবাসিতেন অমন আন্তরিকতা বড় দুর্লভ। তিনি সদা স্পষ্টবাদী ছিলেন কিন্তু ব্যঙ্গভাবে বা রূঢ়ভাবে বা রাগ প্রকাশ না করিয়া বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিতেন। আমি ছাত্র বয়সে একটু গম্ভীর ছিলাম তাই আনন্দময় সুকুমার হাস্যরসের অবতারণা করিয়া আমাকে মুরুব্বী বলিতেন। শেষ অবধি ১৯৪৬ সালে তিনি যখন ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভ্‌মেণ্ট স্কীমএর ডিপুটী সেক্রেটারী রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত হইয়া হুগলী সার্কিট হাউসে থাকিতেন এবং আমিও সিনিয়ার ডেপুটী কালেকটার ও এ্যাসিষ্টেণ্ট সিভিল ডিফেন্স কমিশনার হইয়া কার্য্য করিতাম তখনও তিনি আমায় এইচ, আর, অথবা মুরুব্বী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সেরূপ সরল সুমধুর ঐকান্তিকতা আজকাল বড় বিরল। তিনি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট এ রাজসাহী ডিভিশানে এ্যাসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার থাকার সময় আমি কুড়িগ্রামে সাবডিভিশানের অফিসার থাকায় ঐখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটির উন্নতির জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। পরে যখন ভাটপাড়া

মিউনিসিপ্যালিটির চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হন সেই সময় আমি ২৪ পরগণার এ, আর, পি ডিপুটী কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়া ব্যারাকপুরে মিলিটারী এরিয়াতে বাস করিতাম। তাঁহার অদম্য উৎসাহ অতুলনীয় কার্য্যতৎপরতার জন্য ২৪ পরগণার A. R. P. কন্ট্রোলার নৃসিংহ রঞ্জন মুখার্জি মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি অনারারি চীফ ওয়ারডেন অব ভাটপাড়া সাব এরিয়া হন এবং অতি সুদক্ষভাবে ১৯৪২।৪৩ সনে যুদ্ধের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট নিজে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। ঐ সময় জাপানীরা দু একবার ঐ শিল্প প্রধান অঞ্চলে বোমা ফেলে কিন্তু সুকুমার বাবু অতি দক্ষতার সহিত রিলিফ সেণ্টার অর্গানাইজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে আদর্শ ও অনুকরণীয়। তিনি ছোট কালের স্পষ্টবাদীতা ও ন্যায়পরায়ণতা কখনও ত্যাগ করেন নাই। তজ্জন্য অনেক সময় নিজের চাকুরীর ক্ষতিও স্বীকার করিয়াছেন। পরের দুঃখে তিনি অত্যন্ত কাতর হইতেন। যে সকল অল্প বেতনের কর্ম্মচারীরা তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিল তাহারা তাঁহার পরিবারভুক্ত হইতেন। তাহাদের দায়ে অদায়ে তিনি প্রাণপণ করিতেন, তাহাদের অভাব ও অসুবিধায় নিজে গিয়া বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করিয়া তাহাদের ছেলেরও আত্মীয় বর্গের চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সমবায় বিভাগের কার্য্যে তিনি অতি সুনিপুন ছিলেন গত যুদ্ধের সময় "অণুং বহুকুর্ব্বীত" (খাদ্য উৎপাদন বাড়ানর প্রচার) এ তিনি প্রকৃষ্ট ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া অতি সুন্দর কাজ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরহিত-ব্রতে রত থাকিয়া তিনি সরকারী কর্ম্মচারীরূপে আপ্রাণ দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। নিজ স্পষ্টবাদীতার জন্য এবং উপরিস্থ কর্ম্মচারীদের ভালমন্দ সমস্ত প্রস্তাবে সায় না দিয়া তিনি অনেক সময় নির্ভিকতার ও তেজস্বীতার অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনিকেতন সচিব থাকা কালীন ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এবং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আজকাল উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের তো কথাই নাই। সাধারণ কর্ম্মচারীরাও অনেকেও তাঁহা-দিগকে সাধারণের সেবক মনে করেন বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপে প্রতিপন্ন হয় না—সুকুমার বাবু সদা সর্ব্বদা সাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের অভাব ও অসুবিধা জানিয়া তাহার নিরাকরণ কল্পে সচেষ্ট থাকিতেন।

নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরার্থে সম্পাদন করা তাঁর কর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে তিনি বিশেষ সফলতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন আমরা বন্ধুবর্গ তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা নির্ভিকতা কর্ম্মনিষ্ঠা ও অক্লান্ত জনসেবার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম ও তাঁহার বন্ধুত্বের গৌরবে গৌরব বোধ করিতাম।

তাঁহার কর্ম্মজীবনকে তিনি সাধনব্রতে আনিয়া ত্যাগ নিষ্ঠা স্নেহ ও কর্ত্তব্যের

নূতন অনুক্রবনীর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এই স্মৃতিতর্পণে ৪৫ বছর পর তাঁহার স্মারক লিপি করিতে আমি তাঁহার বাল্যবন্ধুত্বের দাবীতে গৌরব বোধ করিতেছি। অনেক সময় ধর্ম ও সামাজিক আলোচনায় উভয়ে সময় কাটাইয়াছি। তিনি ঔদ্ধত্য ও অকৃতজ্ঞতাকে ত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা প্রতিশোধ নিতেন। (Noble Revenge) অন্যায়ের প্রতিশোধেও কাহাকে আঘাত দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহার বহু দৃষ্টান্ত তিনি জীবনে দেখাইয়াছেন। নিকটতম আত্মীয়ের কাছ হইতে প্রচুর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য পাইয়াও তিনি নিজ কর্ত্তব্য হইতে কখনও চ্যুত হন নাই আমি বন্ধুভাবে তাঁহার আত্মার শাশত শান্তিকামনা করি। মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। ওঁম শান্তি ওঁম শান্তি ওঁম শান্তি।

১।এ দেওদার ষ্ট্রীট শ্রীহৃদয় রঞ্জন সেনশর্ম্মা

আদর্শবাদী সুকুমার

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯২১ সনের শেষভাগে। আমরা উভয়েই তখন বাঁকুড়া জেলাতে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলাম। তিনি বাঁকুড়ার সদর মহকুমার মহকুমা কর্ম্মচারী ছিলেন। পরিচয়ের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মধুর ব্যবহার ও সহৃদয়তা আমায় বিশেষ আকৃষ্ট করে এবং আমাদের সম্বন্ধ উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আমার চাকুরীর প্রথমভাগে তাঁহার নিকট হইতে আমি যথেষ্ট সদুপদেশ পাইয়াছিলাম। যাহা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমি বাঁকুড়া ছাড়িবার প্রায় ছয় বৎসর পর পুনরায় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁয় তাহার সহিত একত্র মিলিত হই। এই স্থানে আমরা উভয়ে পাশাপাশি তিন বৎসর কাল বসবাস করিয়াছিলাম। যখন আমরা বিভিন্ন স্থানেও সরকারী কাযে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় তাঁহার সহিত আমার পত্রলাপ হইত। এই সকল পত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও গভীর অনুসন্ধিৎসার সম্যক পরিচয় লাভ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় আমি সেই পত্রগুলি রাখিতে পারি নাই। অনেক সময় আমরা একত্র সফর করিতাম এবং এই সুযোগে আমি তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহত্বের যথেষ্ট প্রমান পাইয়াছিলাম। তিনি একজন অক্লান্ত কর্ম্মী ও নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। দেশসেবায় সেই যুগে যতটুকু সম্ভব তাঁহার অবদান কোন অংশে কম ছিল না। সরকারী কর্ম্মের মধ্য দিয়া বিভিন্ন জনহিতকর প্রচেষ্টা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। অনেক অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি তাঁহার জীবনে কখনও এই আদর্শভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য পরোপচিকীর্ষা। তিনি অনেক দুঃস্থ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য

করিতেন তাহা আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি। আমাদের গরীব ভাইদের জন্ত উমেদারী করিতে তাঁহাকে অনেক সময়েই দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন উদার চিত্ত এবং সম্পূর্ণ নিরহংকার। তাঁহার সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে তিনি ছোট বড় সকলের সঙ্গে সমব্যবহার করিতেন চাকুরী জীবনে তাঁহাকে নির্ভিক ভাবে নিজ জ্ঞানে বিশ্বাস মত কাজ করিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

অবসর প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি সরকারী কার্য্য ছাড়িয়া দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে স্বর্গীয় কবিগুরুর আহ্বানে শ্রীনিকেতনে যোগদান করেন। পরম পিতার নিকট তাঁহার আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করিতেছি এবং পরলোকে তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

একসাইজ কমিশনার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল — শ্রীরণজিৎ চৌধুরী
১০২ বি মনোহর পুকুর রোড

অক্লান্তকর্ম্মী সুকুমার

আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় চাকরী জীবন মানুষটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কৈশরে যৌবনে বড় বড় কথা বলিয়া ও তদপেক্ষা বড় বড় স্বপ্ন দেখিয়া চাকুরী জীবনে যে কি করিয়া মানুষটির রূপান্তরিত হইয়া যায় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আশার কথা সরকারি জীবনের জাঁতিকলের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মলাভ হইয়াছিল। ইহারা তো দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন কিন্তু ইহাদেরই পাশাপাশি বহু অখ্যাতনামা অক্লান্তকর্মী চাকুরীজীবি জন্মভূমির কল্যাণ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংবাদই বা কয়জন রাখেন?

স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এঁদেরই একজন। আমি তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁহার পরিবার বর্গের প্রায় সকলের সহিতই কমবেশী ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয় তাঁর একমাত্র কন্যাপুষ্প দেবীর সহিত আমার সহধ্যায়ী বন্ধু অধ্যাপক শান্তসুকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ উপলক্ষে। সে আজ পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। তাহার পরও বহু সুখে দুঃখে আনন্দে নানা ব্যাপার উপলক্ষে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অনেকের সহিতই আমার সংস্পর্শ হয়। তখন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি চাকুরীজীবি হিসাবে সুকুমার বাবুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর বিশেষ করিয়া ইংরাজী বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল গভীর। দেশের ও দশের চিন্তা তাঁহার কর্ম্মজীবনের একটী অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল।

তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না তা সত্ত্বেও তাঁহার ভিতরকার জ্ঞানপিপাসু মানুষটি নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে সদা জাগ্রত রাখিয়াছিল। তিনি জীবনে বহু অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন দুঃখ পাইয়াছিলেন প্রচুর কিন্তু কর্মজীবনের ক্ষেত্রে যাঁহারা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন এক অসাধারণ কর্মঠ পুরুষকে যিনি দুঃখে সান্ত্বনা চান নাই কারণ কর্মের মধ্য দিয়া তিনি দুঃখকে জয় করিয়াছিলেন।

তাঁহার শেষ জীবনের কয়েকদিন কন্যা জামাতা ও কনিষ্ঠ পুত্রের অক্লান্ত সেবায় হয়তো খানিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে মর্মান্তিক দুঃখ দিয়াছিল তাঁহার স্নেহ ও শেষ আশীর্ব্বাদ যে তাহাদের উপরও সমভাবে বর্ষিত হইয়াছিল তাহার পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। যে আত্মিক শক্তি তাঁহার কর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল তাহাই তাঁহাকে দুঃখ জয় করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। অবিভক্ত বাঙলা সরকারের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে তিনি যশ ও খ্যাতি পাইয়াছেন সত্য কিন্তু যাঁহারা সুকুমার বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁহারা জানিতেন ঐ খেতাব অপেক্ষাও মানুষটি অনেক বড় ছিলেন।
পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তো সি, আই, ই, খেতাব পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে কি তাঁহার পদমর্য্যাদা কিছুমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল? হয়তো এই স্বর্গত দেবাত্মার সহিত অন্য কোন মানুষের তুলনা করা ধৃষ্টতা হইতে পারে কিন্তু একথা সত্য যে পূর্ব্বে যে বিশিষ্ট বাঙ্গালী সরকারি চাকুরিয়ার শ্রেণীর কথার উল্লেখ করিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইত্যাদি যে শ্রেণীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ও যে সেই শ্রেণীভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি সরকারী উচ্চপদ ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। গ্রাম এবং গ্রামের লোক তাহাদের নানারূপ সমস্যা এই কর্ম্মীকে সর্ব্বদাই টানিত। কাজেই শ্রীনিকেতনের আহ্বান যখন রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে তাঁহার নিকট আসিয়া পৌছিল তিনি সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐ খানেই আমরা মানুষটির অন্তরের সত্তাকারের পরিচয় পাই।

সুকুমার বাবুর সহিত বহু ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম দেখিয়াছি তাঁহার বহুমুখী অভিজ্ঞতা দেখিয়াছি দেশের যাবতীয় সমস্যার সহিত সম্যক পরিচিতি লাভ করিবার জন্য তাঁহার অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ। গ্রাম উন্নয়ন সমস্যা ছিল এই সমস্যাগুলির পুরোভাগে। দেশের সংবাদ পত্রগুলিকে এ বিষয়ে তাহাদের যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না ইহা তাহার মনকে পীড়া দিত। সাংবাদিক হিসাবে

তিনি বহুবার আমাকে এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। প্রতিকূল অবস্থা তাঁহাকে ব্যর্থতা আনিয়া দিয়াছে তবু তিনি উৎসাহ হারান নাই।

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপর্য্যস্ত নোয়াখালি হইতে প্রত্যাগত আশ্রয় প্রার্থীদের সাহায্যের জন্ত একটি পুনর্বসতি কেন্দ্র খোলা হইল তখন শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুকুমারবাবু এবং আমাকে তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। আমি তখন কলেজের একজন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, কাজেই আমার সময় ছিল কম তাহার মধ্যে আমায় প্রত্যহ দুতিন ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত ঐ সময় সুকুমার বাবুর মত কর্ম্মী আমার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করা একা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। তাঁহার সার্ব্বাঙ্গীন অভিজ্ঞতা যে এই কাজে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিল তাহা বলিবার নয়। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কর্ম্ম কুশলতা দেখিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। নোয়াখালি তখনও সাম্প্রদায়িক বিপদগ্রস্থ আহ্বান আসিল আশ্রয় প্রার্থিদের একটি শিবিরের কার্য্যের তত্ত্ববিধান করিতে হইবে। সুকুমার বাবু তখনই স্বাস্থ্য ভালো ছিল না তথাপি সেই সুদূর গ্রামে তিনি নিজেই অগ্রণী হইয়া গিয়াছিলেন এই দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া; তাঁহার আগমনে স্থানীয় কর্ম্মীরা ব্যতিব্যাস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা হইল গরুর গাড়ীর দল ঢিমে তেতালায় তারা চলে। তা ছাড়া রিলিফের টাকা পয়সা খরচ করিবার উপর কোনওরূপ সরাসরি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিল না। সুকুমার বাবুর মত লোক যাওয়াতে তাদের বিব্রত হওয়ারই কথা। বলা বাহুল্য তাহারা বেশীর ভাগই রাজনৈতিক কর্ম্মী, কেন্দ্রীয় কমিটির উপর তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট।

ফলে প্রচার হইল (যে সুকুমার বাবু দেশের কাজের জন্ত আই, জি, আর পদত্যাগ করিয়া এক কথায় নিজের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন সেই) সুকুমার বাবু নাকি রিলিফের টাকায় চা সিগারেট খান। ইহাই হইল প্রকৃত কর্ম্মীর পুরস্কার। বলা বাহুল্য এই পরিস্থিতিতে যে কোন আত্মসম্মান সম্বলিত ব্যক্তির পক্ষে কার্য্য করা অসম্ভব।

সময় ও সুযোগ পাইলে সুকুমার বাবু গঠনমূলক কাজের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু দেশের সে সৌভাগ্য হইল না। যাঁহারা সুকুমার বাবুকে আমার অপেক্ষা অন্তরঙ্গভাবে চিনিতেন তাঁহারা জানেন আমার এ লেখায় অতিরঞ্জন দোষ নাই। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

অধ্যক্ষ আশুতোষ কলেজ
বাণিজ্য বিভাগ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

[illegible]

[illegible] করিয়া আমাকে যে তাঁহার [illegible]পূর্ণ জীবনী সম্বন্ধে কিছু লিখিবার নির্দেশ দিয়াছেন তজ্জন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। যদিও তাঁহার বজ্রমধুর স্নেহরাশি অযাচিতভাবে বর্ষিত হইত, জাতি ধর্ম ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে কিন্তু তাঁহার অন্তিম শয্যার পার্শ্বে বসিয়াও তাঁহার বরাভয় হস্তের যে শেষ স্নেহস্পর্শ পাইয়াছিলাম তাহাতেই সম্ভবতঃ আপনি ভাবিয়াছেন যে আমি তাঁহার স্নেহপাত্রদের একজন। তাঁহার স্নেহকণা লাভ করিবার মধ্যে যথেষ্ট গৌরব আছে এবং সেই গৌরবের পরিপূর্ণতা হইয়াছিল সেইদিন যেদিন তিনি শেষ শয্যায় থাকিয়া নিজেই আমাকে ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন :— হাজার হাজার ছেলে আমার ছিল, কিন্তু তুমি তো তাদের মত আমায় ছেড়ে যাওনি। আমি তাঁহার সেবা করিবার তেমন কোন সুযোগ পাই নাই, তাই লজ্জিত হইয়া মনে মনে ভাবিলাম যদি হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে অর্ঘ্য দিতে পারিতাম তাহা হইলে তাঁহার কথার হয়ত কিঞ্চিৎ সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিতাম। মুখে বলিলাম, "আপনার সব ছেলেরা ঠিকই আছে কিন্তু তাহারা জানে না যে আপনি এখন কিভাবে, কোথায় আছেন।" একথা শুনিয়া অতি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। যাহা হউক আমি যে তাঁহার স্নেহকণা লাভ করিয়াছিলাম তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব এবং একথাও স্বীকার করিব যে, অসংখ্য অসংখ্য লোকে তাঁহার প্রচুর স্নেহ পাইয়াছে কিন্তু সেই সব লোকদের ঠিকানাদি আপনার জানা থাকা সম্ভব নয়। থাকিলে তাঁহাদের কাছে তাঁহার জীবনীর বৈশিষ্ট্য মিলিতে পারিত। আমি তাহার কোন অংশ লিখিতে গিয়া যদি ভুল করি সে ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছি।

শ্রদ্ধেয় সুকুমার বাবুর কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে যে ঘটনাটির কথা আমার মনে পড়ে তাহাই আগে বলিব। তিনি যখন ডেপুটী ডেভেলপমেণ্ট কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার অধীনে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি নিজে যখন "বেঙ্গল য়্যাডাণ্ট এডুকেশন য়্যাসোসিয়েশন"এর কার্য্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত হই তখন তাঁহার যথেষ্ট সান্নিধ্যও লাভ করিয়াছিলাম। একদিন তিনি কোন একটি বিষয় রেজিষ্ট্রার বি, সি, মুখার্জ্জীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া সেই বিষয় পরে তাহাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণবশতঃ তাহা না করিয়া অন্য একটি কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার বালীগঞ্জের বাড়ীতে গেলেই তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ না করায় খুব রাগ করেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়টির জন্য রেজিষ্ট্রার বি, সি, মুখার্জ্জীর নিকট যাইতে বলেন। আমি বিশেষ কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে

তাঁহার বাড়ী হইতে চলিয়া আসি। আসিবার [illegible] অনেকে ডেপুটী ডেভেলপমেণ্ট কমিশনারকে বাঘের মত ভয় করে [illegible] রাগী লোক" বলিয়া যে মন্তব্য করে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবার আর কোন কারণ নাই। এক্ষেত্রে একথা উল্লেখ করিতে হইবে যে অফিসের অনেকের ন্যায় নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলায় বিষয় অন্ধ হইয়া তাঁহার "রাগ" করিবার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাই নাই সেদিন। যাহা হউক পরে রেভারেণ্ড বি, সি, মুখার্জ্জীর কাছে আসিয়া দেখি "আপন ভোলা ভোলানাথ সব ভুলিয়া গিয়াই সেখানে হাজির হইয়াছেন আমারও আগে আসিয়া। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"তুমি এত তাড়াতাড়ি এসে গ্যাছ; যাক এখন তোমার নিজের কাজে চলে যেতে পার; আর দরকার নেই, আমি নিজেই এসেছি এখানে।" যিনি নিজেই আমার আগে আসিয়া হাজির হইলেন তিনি কিছু পূর্ব্বে আমাকে রাগ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কেন তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে আরও অভিমান হইয়াছিল। কিছু আর না বলিয়া সেদিন বাসায় ফিরি কিন্তু পরবর্ত্তী দিনে রেঃ বি, সি মুখার্জ্জীর কাছে গেলেই তিনি বলিলেন :—"কাল সুকুমার বাবু বুঝি তোমার ওপর রাগ করেছিলেন। ভদ্রলোক রাগ করে মুস্কিলে পড়েছিলেন দেখে অবাক হোলাম। এখানে এসে বললেন—'আজ হরিপদর ওপর রাগ কোরে তার কোন কথাই শুনিনি, ভাল লাগ ছিল না তাই তোমার কাছে চলে এলাম।" প্রত্যুত্তরে রেঃ মুখার্জ্জী নাকি বলেছিলেন—"হরিপদ পুত্রস্থানীয় তাই অন্যায় কোরে তার ওপর রাগ কোরলেও তেমন দোষ কি? বিশেষতঃ তার অন্যায় ত্রুটি সংশোধনের জন্য রাগ কোরে তাকে সুশিক্ষাই দেওয়া হয়েছে।" সুকুমার বাবু নাকি অবাক হইয়া বলিয়াছিলেন :—"নিজের ছেলের কাছে অন্যায় কোরে রাগ করা যায় এ তোমার কেমন যুক্তি? আর হরিপদ নিজে কিছু বলেনি; আমিও কিছু জানতে চাইনি তাইতো কেমন লাগছিল।" রেঃ বি, সি, মুখার্জ্জীর মুখে ঐসব কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের মাঝে আমার সমস্ত অভিমান মুছিয়া গেল। ভাবিলাম, নারিকেলের মত বাহিরের শক্ত আবরণ দেখিয়া ভিতরের অমৃতের সন্ধান না করিয়া আমরা কত যে মারাত্মক ভুল করি তাহা আমার মত সাধারণ লোকে জানে না।

তাঁহার মনের শিল্পদৃষ্টিভঙ্গীর একটা বিশেষ সন্ধান দুই একবার পাইয়াছিলাম। একটা বিষয় প্রথমতঃ আমার কাছে অত্যন্ত সামান্য মনে হইয়াছিল কিন্তু তাহার শিল্পমনের বলিষ্ঠ কল্পনা সমস্ত বাংলায় যে পুষ্পশোভিত শান্তমধুর কুটির রচনা করিয়াছিল তজ্জন্য কবিবাঞ্ছিত শ্যামল সুন্দর গৃহের রূপদান দেওয়ার পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন বিশ্বমঙ্গলের চিন্তাধারার প্রাথমিক উৎসরূপে। একদিন তাঁহার বালীগঞ্জ প্রেসের বাড়ী হইতে আমাকে সঙ্গে

[illegible] [illegible] পূর্বে বাহির হইয়া ইটপাথরের গগনচুম্বী অট্টালিকাশ্রেণীর সীমানা ত্যাগ করিয়া কসবার একটি অবহেলিত অঞ্চলে চলিয়া [illegible]। সেখানকার কয়েকটি বাড়ী ছাড়াইয়া হঠাৎ একটা বাড়ীর সামনে আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—এই বাড়ীটা কেমন? বাড়ীটার মৌলিকত্ব আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই; শুধু খোলার ঘর, মাটির দেওয়াল ও বাঁশের চাটার তৈরী। প্রবেশ দ্বারে এক সবুজ সুন্দর লতা গাছ দেখিয়া বলিলাম—"গৃহস্বামী গরীব অথচ বড়লোকের মত বাড়ীর 'গেট' এর লতা গাছ লাগাইয়া বিলাসী মনের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,-"ওর চেষ্টাই সার্থক। ঐ লতাগাছ আমি বড় একজন কেমিষ্টের কাছে পাঠিয়েছি, ঐ গাছের পাতা খেলে গরুর দুধ বেশী হয় কিনা তাই পরীক্ষা করতে। আমাদের গরীব দেশের প্রত্যেকটি বাড়ী যদি তার ক্ষুদ্রত্বের মাঝে শ্যামলসুন্দর রূপের পরিপূর্ণতা পায় তা হোলে সেই কি হবে না বাংলার কুটিরের খাঁটিরূপ—বাংলার আদর্শ শান্তিকুটির। গৃহস্বামীর দৈন্য পরাজিত হয়েছে তার সনাতন সুন্দর রুচিবোধের সামনে। দেওয়ালটাই বা কেমন পরিষ্কার রাখা হয়েছে। আমি এমন সুন্দর বাড়ী কদাচিৎ দেখেছি।" তাঁহার শিল্পমুখীমনের যে আদর্শ কুটিরের স্বপ্ন ছিল তাহাই ছিল আর্য্যঋষিদের যুগে, তাহাই ছিল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে ও গান্ধীজীর সাধনায়। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীতে সুন্দর সুন্দর লতাপুষ্প গাছ রোপণ করিয়া গৃহকর্ত্তা অন্ততঃ গৃহকর্ত্রী গৃহাশ্রমকে তথা সমগ্র পল্লীকে এক স্বর্গপুরী তৈয়ারী করিবে। সহরতলী হইতে আসিয়া ঐ সব পুষ্পশোভিত বাড়ী হইতে ফুল ক্রয় করিয়া একদল লোক সহরে বিক্রয় করিবে। পক্ষান্তরে পল্লী-বালার যত্নপুষ্ট পুষ্পগুলির বিক্রয়লব্ধ পয়সা গৃহকর্ত্রীর তহবিলে সঞ্চিত হইবে।

তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধের যে সুমার্জ্জিত রুচি ছিল তাহার প্রমাণ সর্ব্বদা পাওয়া যাইত। ১৩৫২ সালের ১লা আষাঢ়ে তাঁহারই প্রচেষ্টায় মেঘদূত উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কলেজ স্কোয়ারের ষ্টুডেন্টস হল-এ। রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, হুগলী, কসবা, সোনারপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্ম, কদম ও বিভিন্ন পুষ্পাদি আনয়ন করিয়া উৎসবের বেদী সজ্জিত করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বাহিরের অনেক সুধী ব্যক্তিদের লইয়া অনুষ্ঠানের কার্য্য আরম্ভ হইবার মুখে সুকুমার বাবুকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করায় তিনি বলিয়াছিলেন :—"আজ আমরা সকলেই মহাকবির মেঘদূত উৎসব সমানভাবে উপভোগ করিব—কেহই আজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিব না।" তারপর পুরাকালের পণ্ডিতের বেশে বেদীর সম্মুখে আসিয়া তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করিয়া এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে শ্রোতৃমণ্ডলী

যেন দেশবন্ধুকে [illegible] [illegible] [illegible] সাথে আবাহন করিয়াছিলেন। এই সময়ে আর একদিন কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু তিথি পরিচালিত হয় তাহারই ইচ্ছানুযায়ী। আমরা উন্নয়নের বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী ঐ দুইটি উৎসবে তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করিয়াছিলাম এবং ঐ নির্দ্দোষ উৎসবের পবিত্র ভাবধারা আমাদের মনে চিরদিনের জন্ম রেখাপাত করিয়া আছে।

আর একটা ঘটনার কথা বলিয়া আমার বক্তব্যটির শেষ করিব। ঘটনাটি সাধারণ দৃষ্টিতে অভিনবত্বের দাবী করে না, কারণ সংসারে বহু বহু দানবীরের বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত আছে কিন্তু মানুষের মর্য্যাদাকে দানের ভিতর দিয়া যে উদ্বুদ্ধ করার একটা দৃষ্টান্ত তাঁহার কাছে পাওয়া গিয়াছিল তাহাই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। একদিন উন্নয়ন বিভাগের এক ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী সরকারী কার্য্যে "হেড্-কোয়ার্টার" হইতে বহুদূরে যাইবার জন্ম আদিষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিয়াছিল :—"আমি সামান্ত টাকার মাহিনার কর্ম্মচারী তাই এত খরচ কোরে আমি কাজ কোর্ব্ব কি ভাবে?" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে অফিসের সময় সে কেন যাতায়াতের জন্ম অগ্রিম টাকা লয় নাই এবং পরবর্ত্তী দিনে তিনিই তাহার জন্ম অগ্রিম টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। তখন ঐ কর্ম্মচারীটি "ট্রাম বাস"-এর ভাড়া হিসাবে কিছু পয়সা তাঁহার নিকট লজ্জিতভাবে চাওয়ায় তিনি পাঁচটি টাকা তাহাকে দিয়া বলিলেন—"এই টাকা তোমায় কর্জ্জ দিলাম—এ টাকা তুমি শোধ দিও সেইদিন যেদিন তোমার কোন টাকার অভাব থাকবে না বরং উদ্বৃত্ত হইবে।" এই ব্যাপারটি আমি অবাক হইয়া দেখিয়াছিলাম এবং অনেকদিন পরে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি টাকাটি দেওয়ার সময় ঐরূপ কেন বলিয়াছিলেন। একটু উদাসভাবে বলিলেন :—"টাকার খুব দরকার না হলে কেউ "ট্রাম বাস" এর ভাড়া চেয়ে নিতে আসে না। যার হাতে ট্রাম বাসের পয়সা নেই তার নিশ্চয়ই খুব অভাব। কর্জ্জ দেওয়ার নাম না কোরে ঐ টাকা দিলে মানুষের মর্য্যাদার ওপর আঘাত দেওয়া হোত, অথচ ঐ টাকা আমি নিঃস্বার্থভাবেই দান কোরেছিলাম। অভাবমুক্ত হোয়ে স্বচ্ছলতার সঙ্গে সংসার চালাতে পারে এমন লোক কয়জন চাকুরীজীবীর মধ্যে আছে তা আমি ভাবতে পারি না আর যদি তখন স্বচ্ছলতার সঙ্গে কেউ দিন কাটায় তা হোলে তার কাছ থেকে টাকা ফিরিয়ে না নিয়ে আত্মসম্মানবোধকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।"

ঐ সব ঘটনাগুলি ভিন্ন তাঁহার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে নিজস্ব সাবলীল গতিভঙ্গিমায় বিশিষ্ট রুচিবোধ ও সুমার্জ্জিত আভিজাত্যবোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। আর্য্যঋষিদের ভাবধারার সঙ্গে আধুনিক যুগের গতিবেগের সামঞ্জস্য করিয়া এক সোনার বাংলার স্বপ্ন তিনি দেখিতেন যাহা ভাবীকালের সকল

অবস্থার মধ্যে শান্ত সুন্দর ও অবিনশ্বর থাকিবে। নাম যশের আকাঙ্ক্ষাহীন প্রাণ লইয়া তিনি যে ভাবে জাতি, ধর্ম্ম ও দেশের সেবা সঙ্গোপনে করিয়া গিয়াছেন প্রকৃত নির্ব্বাক কর্ম্মীর মত, তাহাতে তাঁহার আসন আমাদের দেশের যে কোন শ্রেষ্ঠ নেতার আসনের কাছাকাছি হওয়া উচিত। নিবেদন ইতি।

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর, এগ্রিকালচার
ক্যানিং টাউন (২৪ পরগণা)

বিনীত—
শ্রীহরিপদ সরকার

কর্ম্মময় সুকুমার

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কার্য্যময় জীবনের আকস্মিক অবসান তাঁহার বন্ধুজন ও দেশের পক্ষে গভীর পরিতাপের কারণ হইয়াছে। সুকুমার আমার কলেজ জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম। তিনি আমার একশ্রেণী নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং ১৯০৪ সাল হইতেই যখন আমি এম. এ. ও সুকুমার বি. এ. ক্লাসের ছাত্র আমাদের দৃঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে তীব্র প্রতিবাদ ছাত্রমহল হইতে উত্থিত হয়েছিল তাহাতে আমরা উভয়েই নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমরা উভয়েই ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে প্রেসিডেন্সী কলেজের সরকারী ছাত্রাবাসে ১৯০৪-৫ সালে বাস করিতাম এবং এই ছাত্রাবাস তৎকালীন ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। তৎকালীন বড়লাট বঙ্গভঙ্গকারী কুর্জ্জনের বস্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলীতে অগ্নিসংযোগ এবং বিলাতী-বস্ত্রের স্তূপে অগ্নিদান এই দুটী কার্য্য ঐ ছাত্রাবাসে আমরা ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলাম। এই কার্য্যে আমাদের উভয়েরই সম পরিমাণে উৎসাহ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বর্জ্জন ও নূতন স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে ও সুকুমারের উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছিল আমি এই কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্যতম ছাত্রনেতা ছিলাম। এ হলো স্বদেশী ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা। কিন্তু আর একটী সংযোগ-সেতু ছিল সুকুমার ও আমার মধ্যে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং তদপেক্ষাও বিশালতর অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি। ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে আমাদের একটি রবীন্দ্র পাঠ চক্র ছিল। পরলোকগত অধ্যাপক রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, এবং আমি এবং বিনয়কুমার সরকার এইরূপ জনকয়েক ছিলেন তাহার উৎসাহী সভ্য; সুকুমারও আমাদের এই চক্রভুক্ত ছিলেন। এ সব হলো ১৯০৪-৫ সালের কথা। তারপর কলেজের শেষ ডিগ্রী অর্জ্জন করিয়া আমরা জগতে বাহির হইয়াছি।

ইহার পরে আমি সরকারী কলেজে, প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে তার পরে ১৯০৯-১৭ সালে রাজসাহী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত। প্রায় ১৯১৪ সালে আমি তখনও রাজসাহীতে, সুকুমার রাজসাহী বিভাগের কমিশনারের দপ্তরের প্রধান সহকারীর (পার্শন্যাল অ্যাসিস্‌টেণ্ট্‌) পদে জলপাইগুড়ীতে।

তখন আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়েন্দ্রকে (সে তখন পঞ্চম বর্ষীয় বালক মাত্র) সঙ্গে লইয়া সুকুমারের আমন্ত্রণে জলপাইগুড়ীতে কোন অবকাশে গিয়া ২।৩ দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। কি আদর আপ্যায়ন কি মধুর ব্যবহার সুকুমার ও তাহার পত্নীর নিকটে পাইয়াছিলাম তাহা এত দীর্ঘদিন পরেও স্মৃতিতে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে। আসল কথা এই সুকুমার অত্যন্ত মধুর স্বভাব, বন্ধুবৎসল এবং ঋজু প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, কোন ছল কাপট্য. অতিরিক্ত গাম্ভির্য্যের ছদ্মাবরণ তাঁর কখনও ছিল না। কাজেই আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব অটুট হইয়াছিল—আমরা সমপ্রাণ সখা ছিলাম বরাবরই। জমীদার বাড়ীর হাতীতে চড়ে সে যাত্রায় দুজন অনেকটা বেড়িয়েও এসেছিলাম।

তারপর সুকুমার সমবায় বিভাগে সহকারী রেজিষ্ট্রার হ'য়ে বদলী হলেন তখনও একাধিকবার রংপুরে ও অন্যান্য স্থানে দেখাসাক্ষাৎ ও ভাববিনিময় হয়েছিল।

১৯২১ সালে আমি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ক'রে সরকারী সম্পর্ক বিচ্যুত হলাম। সে জীবনের ইতিহাস বাংলাদেশের জনসাধারণ জানেন। দু বৎসর (১৯২৩-২৫) তো আমি ব্রহ্মদেশে জনসেবায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখ্‌লাম।

তারপরে ১৯২৬ সালে পুনরায় বাংলার কংগ্রেসে যোগদান ক'রে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইল। মাঝে মাঝে সুকুমারের সহিত দেখা হইত। কিন্তু আমি বিদ্রোহীদলের লোক। তাই সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা নিজেই করিতাম না।

পরে সুকুমার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া কলিকাতায় বসিলেন এবং পূর্ণসময়ের কিছু পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার ভার লইলেন। তার কিছু পূর্ব্বেই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়েন্দ্র কলিকাতায় অধ্যাপক হয়েছে এবং সুকুমারের সঙ্গে সমবায় সমিতি গঠনাদি ব্যাপারে সংযুক্ত হয়েছে। আমাদের বালিগঞ্জের ডোভার লেনের বাড়ীতেও সুকুমার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে অনেকবার এসেছেন এবং আমার সঙ্গে ও বহুবার দেখা হয়েছে। একবার আমার বৈদ্যবাটির "পল্লীমধু'তে ও সুকুমার এসেছিলেন। তীক্ষবুদ্ধি, সাধুপ্রকৃতি, কর্ম্মনিষ্ঠ সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে সুকুমার দেশের

অনেক মঙ্গলসাধন করেছেন। সমবায় আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক চেষ্টাও তিনি করেছেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের জন্যও তিনি কম করেন নি। এ হেন ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ভগবান তাহার আত্মার মঙ্গল করুন্।

পল্লীমধু
বৈদ্যবাটী

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খাঁটি মানুষ সুকুমার

সুকুমার বাবুর সঙ্গে পরিচয় জোড়াসাকোর বাড়ীতে। গুরুদেবের অসুখের সময় আমরা অনেকে জোড়াসাকোর বাড়ীতে একসঙ্গে। তিনিও তখন শ্রীনিকেতনে ছিলেন। গুরুদেবকে দেখতে আসতেন্। এই পরিচয় গুরুদেবকে কেন্দ্র করে, আর অধিকাংশ সময় কেটেছে তাঁর সঙ্গে শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, তাঁর রচনার সম্বন্ধে তাঁর কাজ নিয়ে আলোচনায়।

১৯১২ সালে যখন তিনি কৃষ্ণনগরে ডিপুটী ছিলেন তখন তাঁকে দেখেছি আমি। আমার তখন বয়স ১২ বৎসর। আলাপ হয়নি। মিউনিসিপ্যালিটীর ভোট গননায় নাকি সেখানে গোলমাল হত প্রতিবার তাই একজন খাঁটি সরকারী কর্মচারীকে তদারকেব ভার দেওয়া হয়। আর সেদিনের কথা স্মরণ বেশী নেই। একবার দেখেছিলাম তাঁকে একজন Exise Inspector এর কলেরার সময় সেবা করতে দিন রাত। তখন কৃষ্ণনগরে বছরে অন্ততঃ দুবার কলেরা হত—আর নূতন Saline Injection চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল।

কয়েক মিনিট আলাপে বুঝতে পারলাম রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনাই তিনি বারংবার পড়েছেন এবং পড়েন। রবীন্দ্রনাথ পড়া ও (এক অধ্যায় অন্ততঃ) গীতা পাঠ করা তাঁর প্রাত্যহিক কাজ ছিল। কিন্তু তবু আমি উল্লেখ করছি অনেকগুলি রচনা তিনি পুনঃ পুনঃ পড়েছেন—সবগুলিই ভাল করে পড়েছেন তা নয়। বাস্তবিক সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ বেশ ভাল করে পড়েছেন এমন বেশী লোকের কথা আমি জানিনা। শেষ কয়েক বৎসরে তিনি সরকারকে কি দান করেছেন আমি তা তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাল রকম করে জানবার চেষ্টা করিনি। এ নিয়ে আমাদের নিজেদের ছোট দলে আলোচনা হত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপালিনী একদিন সাহস করে গুরুদেবের (উত্তরায়ণের ঘরে) সামনে বলিলেন "গুরুদেব রামবাবু আপনার নূতন লেখাগুলি পড়েনি।" গুরুদেব বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই বল্লেন "জানি তোমরা সুকুমারবাবুর সঙ্গে শ্রীনিকেতনে

আমার পুরানো লেখাই বেশী পড়। নূতন কিছুই পড়না। শুধু তোমরা কেন দেশের অনেকেই পড়েন না। আমি কিন্তু মর্ম ছিঁড়ে রক্ত নিঙড়ে সে সব লিখেছি।" তিনি আমার সঙ্গে রেলে, মোটরে গরুর গাড়ীতে হাটাপথে যেতে শুধু পুরবীই উভয়ে আবৃত্তি করেছি। সে কথা বন্ধুরা কবিকে জানিয়ে দিলে তিনি প্রায়ই ইঙ্গিত কর্ত্তেন "পুরবীর উপরে তোমাদের প্রমোশন হয়নি—তোমরা আবার কি সাহিত্যের সমঝদার।" সাহিত্যসৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে সুকুমার বাবু হয়ত করেননি। কিন্তু কাব্যরস গ্রহণ করবার শক্তিও সকলের থাকে না। কবির নিজ সুর সকলের তন্ত্রীকে প্রহৃত কর্ত্তে পারে না। আরও একটা কথা—রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ, বহু গবেষণা সাময়িকপত্রে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সবগুলির যে দরকার আছে সুধীজন তা মনে কর্ত্তেন না। সজনীবাবু একদিন এক সভায় রবীন্দ্র ব্যাখ্যা পড়া নিষেধ করেছেন। গুরুদেব নিজে আমাকে বলেছিলেন—"আমার কাব্যের ভাষ্য কোনদিন ভালো লাগে শুধু পড়বে না হয় পড়বে না। বাস্তবিক ভাষ্যকারেরা সময়ে সময়ে কত কিছু অদ্ভুত বস্তুর অবতারণা করেন তার ইয়ত্তা নেই। গুরুদেব স্বর্গত হলে আমরা কয়েক বৎসর বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র সমিতি স্থাপন করে শুধু তাঁর রচনা থেকে পাঠ করেছি. কেউ কোন কবিতা, কোন প্রবন্ধ পাঠ করেন—টীকা করেন না। সুকুমার বাবু প্রায় শান্তিনিকেতন থেকে পাঠ কর্ত্তেন।

সুকুমার বাবু অবশ্য ইচ্ছা প্রকাশ কর্ত্তেন সারা রবীন্দ্র রচনায় 'একটী সামঞ্জস্যের সূত্র আছে তা তিনি উদ্ঘাটন কর্বেন একদিন।

আমরা যখন রবীন্দ্র সমিতিতে টাকা তুলেছিলাম (শ্রীযুক্ত অতুলগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজকান্ত গুহ, শ্রীবিনোদ সরকার, শ্রীযুক্ত বিলাস মুখোপাধ্যায় আরও অনেকে) তখন তাঁর ইচ্ছা ছিল "রবীন্দ্র রচনার মূলসূত্র" সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতি বৎসর আহ্বান করা হবে এবং লেখককে পুরস্কৃত করা হবে।

গুরুদেবের জীবিতকালে আমি এক প্রবন্ধ পাঠ করি (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে) রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ। তার সার কথা এই যে যতই কেন বলুন না mysticism হেয়ালি চরম কথা এই কবি, এই মনীষি ব্রহ্মোপলব্ধি না করলে এ রচনা উদ্ভূত হত না। সুকুমার বাবুরও যতদূর জানি এই মত।

কেন সুকুমার বাবু সরকারের কাজ ছেড়ে গুরুদেবের নিকটে থেকে কাজ কর্ত্তে চেয়েছিলেন? কেন তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন অনুক্ষণ তাঁর কথা শুনতে চেয়েছিলেন? ঠিক সেই কারণেই আমি ও তাঁর পদপ্রান্তে যেতে চেয়েছিলাম। যদি আমার বাল্যে বা কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় হত, যদি দেশে তাঁর নামে অপপ্রচার, বিরূপ সমালোচনা

না শুন্‌তাম তবে হয়ত বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁকে, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখতাম, ও হয়ত সেই স্নেহলাভ কর্ত্তে পারতাম।

আশ্চর্য্য কথা সুকুমার বাবু ছাত্রজীবনে হোষ্টেলে রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ কর্ত্তেন জনকতক ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে। ৫০ বৎসর আগেকার বাংলা দেশকে যারা ভালকরে জানেন তারা আমার কথায় বিস্মিত বা রুষ্ট হবেন না।

লেখা পড়ে মানুষকে দেখতে যাওয়া, চিন্‌তে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। সে প্রসাদ লাভ করেছি। কিন্তু সুকুমারবাবু সে শান্তি লাভ কর্ত্তে সংসারের সঙ্গে মানিয়ে নিলেন না। যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম, যেখানে অন্যায়, অত্যাচার সেই খানেই ছুটেছেন, স্বাস্থ্যের নিয়ম মানেন নি। তাই কি তাঁকে আকালে সংসার ছেড়ে যেতে হল? ব্যুরোক্রেসির সঙ্গে মিল হল না দেহভঙ্গ হল শীঘ্র; দেখাযাক্ সে আদর্শ আজ স্বাধীনতার দিনে কতখানি মূর্ত্তহয়।

এই স্বাধীনতা ও তৎসঙ্গে দেশের সাময়িক চরম দুর্দ্দশা রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যত-বাণী করেছিলেন। আজ অনেক বড়লোক দেখেছি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে। কিন্তু জীবন সার্থক এই মহামানবের সন্দর্শনে। এমন লোক দুজন আছেন ভাবতে পারছি না।

মহামানবের সান্নিধ্যেই সুকুমার বাবুর সঙ্গে পরিচয়, অন্তরঙ্গতা। সুকুমার বাবু বড়লোক ছিলেন কিনা জানিনা, খাঁটি মানুষ, স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন এ প্রতিতি আমার আজ হয়েছে।

৩২ ক্রীক রো (ডাঃ) শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী

4, King Edward Road
New Delhi.

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বিষয় কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইলে আমার কাছে একখানি পাঠাইয়া দিও। ইতি

To Sm. Puspa Devi. শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Parliamentary Secretary
Govt. of West Bengal.

Civil Supplies Department.
11. A. Free School Street.

স্নেহের শ্রীমতী পুষ্পরাণীদেবী

মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার বাবা আমার গুরুদেবের সহকর্মী ছিলেন। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে গ্রাম গড়বার কাজ শিখেছি। তাঁকে আমি সর্ব্বদা স্মরণ করি। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাঁর পায়ের তলায় উপবেশন করে কত পরামর্শ গ্রহণ করতে পারতাম। তবু আমি মনে করি তাঁরা অমর হয়ে আছেন। কেননা তাঁদের হাতে গড়া কাজই তাঁদের চির অমর করে রেখেছে এবং রাখবে।

সত্বর লেখা পাঠাচ্ছি। আমার স্নেহ ও ভালবাসা গ্রহণ করবে। ইতি

নিশাপতি

Dear Mrs Mukherjee

I was indeed very grieved to hear from you of the death of your father Rai Bahadur Sukumar Chatterjee whom I greatly respected. His death is a great loss to Bengal and to the Bankura District in particular.

I am very sorry that I have delayed so long in replying to your letter, but I have been trying to find amongst my diaries etc. the period when your father was S. D. O in Bankura, but have not been successful Do you mind letting me have this information ? and I shall then be only too pleased to let you have a brief account of my very happy associatious with your father and an appreciation of his sterling qualities I am very sorry for the delay and hope it will not greatly inconvenience you ? Would it be too much to ask you to send the unposted letter your father wrote to me ?

The Manor House
Churchdown Glos.
England 23-2-49

With kind wishes
Yours sincerly
Arthur E. Brown.

Conversationalist Sukumar

It is difficult for me to write about the late Sri Sukumar Chatterjee without pain. He was a very dear friend of mine and it was a privilege to know him.

We first met in 1921 when I was posted at Bankura. Sri Gurusaday Dutta was then the Collector of the district and we met at his house. Sri Dutt was then in the middle of his project to re-excavate the irrigation *bunds* in the district which were filling up, leaving the fields to the precarious grace of the rain. His idea was to get peasants to cooperate and to restore the *bunds* without any sort of external aid or grant. What was necessary was intensive propaganda, and Sri Sukumar would go from village to village and address the cultivators. On one occasion I heard him speak and I could instantly see that he had put his whole heart into the matter and as I subsequently came to know he would do so into whatever he undertook to do.

That was the principal trait in his character, an intense love of his country and anxiety to do public service to the best of his ability, not as a casual ocupation but as a single-hearted devotion. Those who knew him respected him as altogether a nobler soul than what one ordinarily comes accross.

After Bankura I met him at Dinajpur and we had some correspondence but I met him pretty frequently after I retired in Calcutta. He himself retired as Inspector-General of Registration, but before he was bound to retire under the rules. He did so to do, some work at Viswabharathi. His work there included something of the kind of work that always appealed to him ; adult education or something but I am hazy on this point. I do not know why he left Viswabharathi, but one found him next in charge of the superseded Municipality at Bhatpara and sometimes after the Development Office of Bengal. I am not writing about his official career but indicating the type of mind he had,

clear, acute and capable of undertaking whatever required organisation and contact with large bodies of men.

But the thing that made him many friends was his conversation, and his love of poetry. I never came accross a more brilliant conversationalist among Indians and he knew most of the great poems of Robindranath by heart. He would recite them and would bring out by recitation beauties that escape casual readers. I think it a good fortune that I heard him read and talk about Robindranath and to him I owed a great deal of pleasure which I would otherwise have lost.

My only regret is that I could not see him during his last illness. When I think of him I am filled with sorrow but that alas ! is unavailing. I could not tell him how much I owed him and he did not know.

57|3 Rajah Dinendra Street Pannalal Basu.

শ্রীনিকেতনে সুকুমার

দেশে এমন একদিন ছিল যে বড় কেউ পল্লীর কথা ভাবতো না। সাতাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই দুঃখে দুঃখিত হয়েই শ্রীনিকেতন স্থাপন করেন। শ্রীনিকেতনের পুরাতন নীলকুঠির চারিদিকের ঘন জঙ্গল ও দুর্গম পথের কথা আজও যারা জানে তারা স্বীকার করবেন সুরুলের নীলকুঠি সত্যই আজ শ্রীনিকেতনে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছেন গুরুদেবের সহকর্মীগণ, তাঁরা পরিকল্পনা রচনা ক'রে গুরুদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হতেন, গুরুদেব প্রতিদিন প্রতিমাসের কার্য বিবরণী পাঠ ক'রে কর্মীদের উৎসাহ দান ক'রতেন। সমস্যা, সমাধানের ও সদুপায়ের পথ হয়তো রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ ক'রতেন কিন্তু পল্লীপ্রাণ কর্মীদের আন্তরিকতায় তাহা কার্যকরী হ'ত।

আজ মনে পড়ে স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ ও তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্বর্গীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁহারা গ্রামের দুঃখে ও গ্রামের সমস্যায় কোনদিন অভিভূত হননি। পল্লীবাসীর তপ্ত অশ্রুধারাকে দুটী হাত দিয়ে যেমন মুছে দিতেন সেইরূপ অন্নবস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সমস্যার ব্যবস্থা ক'রে স্থায়ীভাবে প্রতিবিধান করতেন। এজন্য তাঁদের গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আত্মীয়রূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল; অভিভাবক ভেবে সকল দুঃখের কথা নিবেদন করতো। তাদেরই প্রচেষ্টায় শ্রীনিকেতনের পার্শ্বস্থ চারিশত পল্লীতে কর্মের আহ্বান দেখা দেয়, গ্রামে গ্রামে কর্মীদল গঠন হয়।

স্বর্গীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তার পরিপূর্ণ বিকাশ পরাধীনতার জন্য তখন সম্ভবপর হয় নি। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে আজ যারা পল্লীকে প্রাণের ক্ষেত্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কথা স্মরণ হয়। তাঁদের জীবনী তাঁদের কার্য্যক্রম ও বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হওয়ার দুঃসাহস ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিখবার বিষয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে গ্রামের পঞ্চায়েতদের সঙ্গে উপবেশন করে ন্যায় বিচারকে ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠাকে জাগ্রত করেছিলেন। গ্রামের কৃষি শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নতির জটিলসমস্যা সমাধানের পথ গ্রামের লোকেরাই উন্মুক্ত কর'তে পেরেছে। তাদের শক্তি জাগ্রত হয়েছে, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্ত্রীপুরুষ সংঘবদ্ধ হ'য়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার সাহস অর্জ্জন ক'রেছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমায় বলেছিলেন, "বিল্পবের বহ্নি বুকে নিয়ে আজ পল্লীসেবায় কার্যে নিযুক্ত হয়েছি, তুমি কংগ্রেস সেবী এজন্য মনে করো না আমি বিল্পব চাই না। আমি সমাজে বিপ্লব চাই কৃষিশিল্প কাজে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে। তবেই আমরা আর্থিক সাম্য, সামাজিক সাম্য স্থাপন করিতে পারবো। দেশ আজ অসাম্য অনৈক্য চায় না সকলেই চায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমবায়কে মূলমন্ত্রে ক'রে সমবায় সেচ সমিতি বীরভূমে সরকারী কর্মীদের পূর্বে স্থাপন করেছিলেন। শ্রীনিকেতনের সচীবের কর্মভার গ্রহণ করে অতঃপর তিনি পশ্চিম বঙ্গের চির দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য জলাশয় সংস্কার সেচ আইনের সাহায্যে বীরভূমে এক যুগান্তর আনয়ন করেন। সমবায় বিভাগের গলদ কোথায় তা তিনি জানতেন এজন্য বিশ্বভারতীর দ্বারা সমবায় আন্দোলনের নতুনরূপ দান করেন। বর্ত্তমান দুর্দিনে তাঁর অকাল মৃত্যু সত্যই জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি জীবিত থাকলে সত্যই দেশ নবরূপে নব আদর্শ গ্রহণ করতে পারতো। গুরুদেব সর্বহারাদের সেবার জন্য সহকর্মীদের বার বার আহ্বান করেছেন কিন্তু অধিকাংশ তথাকথিত তাঁর প্রিয় শিষ্য সুললিত ভাবে ছন্দ এবং আড়ম্বরকে প্রধান করেছেন। তারা অনাড়ম্বর ভাবে সহজ সরল ভাষায় গ্রামের কথক বাউল শিল্পি কবিদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একাজে শক্তিকে উৎসর্গ করেছিলেন। অস্পৃশ্যদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্য্যে মদ্যপান বর্জন কার্য্যে, সামাজিক পাপ দূরীকরণে ও আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাঁর এই কার্য্যের আহ্বানে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দণ্ডায়মান হতাম এক একটি কাজ করে। প্রতি দিনের কাজে সাফল্য নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আজ তিনি হয়ত আমাদের সম্মুখে নাই কিন্তু আমার চক্ষের সম্মুখে আজ কালী-মোহন বাবু এবং সুকুমার বাবু বিরাজমান।

শ্রীনিশাপতি মাঝি

একজন সত্যকার মানুষ

যতদূর স্মরণ হয়, ১৩৫২ সালের ১লা আষাঢ় হাঁসপাতালে একটি অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় টেলিফোনে ডাক এল, বন্ধুবর সাহিত্য-রসিক ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর কণ্ঠে আহ্বান পেলাম। ঐ দিনই রবীন্দ্র পাঠ চক্রের উদ্যোগে গোলদিঘীর ধারে ব্যাপটিষ্ট মিশন স্টুডেন্ট হলে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় কালিদাস দিবস প্রতিপালিত হবে এবং আমার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দেওয়া হয়ে উঠেনি, ত্রুটি মার্জ্জনীয় এবং আমাকে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত আবৃত্তি করতে হবে। আমি একটু বিব্রত বোধ করেই অনুযোগ করলাম ঐ হঠাৎ আক্রমণের জন্য; অনুরোধ করলাম সেবারের মত রেহাই দিতে; আর কোন সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক প্রবরকে ধরে কবি পূজা করবার প্রস্তাবও জানালাম। উত্তর এল রায় বাহাদুরের একান্ত ইচ্ছা এবং অনুরোধ যেন আমিই পাঠ করি। কেন জানি না মনে হল অনুরোধ নয় আদেশ। যাই হোক সম্মতি দিলাম। কিন্তু কোন রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হাঁসপাতালের আসুরিক বৃত্তি সমাপন করে বাড়ী ফিরেই ধূলিময় স্তূপের মধ্য হতে জীর্ণ এক খণ্ড মেঘদূত আবিষ্কার করে তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে এবং ঘর্ম্মার্ত্ত কলেবরে গন্তব্য স্থানে কোনমতে সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছিলাম। সে দিন যথার্থই প্রচণ্ড সূর্য্য এবং স্পৃহনীয় বর্ষণ ছিল, সকলেই তৃষিত চাতকের ন্যায় মেঘের দিকে চেয়ে আছে তার এক বিন্দু কৃপাবর্ষণের অপেক্ষায়; কাজেই, পাঁচটায় সময় ঠিক থাকলেও সাড়ে পাঁচটায় উপস্থিত হয়ে আমাকে বে-অকুব বনতে হয়নি। প্রায় দ্বার-পথেই এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ প্রবরের সঙ্গে কথা কইছেন আমার বন্ধুবর, সঙ্গে অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি আর একজন স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। "এই যে শেষ অবধি এসে পৌঁছেচেন" বলে সম্ভাষণান্তে বন্ধুবর উভয়ের সঙ্গেই আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই "Long" and "short" of my story হচ্ছেন অভিন্ন হৃদয় বড় ভাই এবং ছোট ভাই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই প্রথম দর্শন থেকেই জানি না কেন অলক্ষ্য নির্দ্দেশে আমার মনে তাঁদের সহৃদয় এবং প্রীতিবদ্ধ অন্তরঙ্গতার একটা নিঃসংশয় অনুভূতি পেলাম এবং আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্বের সঙ্গেই মনে হল যেন তাঁদের পার্শ্বে একটি তৃতীয় স্থান শূন্য ছিল বুঝি আমারই অপেক্ষায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমার এই ধারণা ও অনুভূতির পরিবর্ত্তনের দুর্ভাগ্য ঘটেনি। যথাসময়ে সভাপতি বরণের পর মহাকবির তর্পণ আরম্ভ হল; আমার উপর আদেশ হল উত্তর মেঘ আবৃত্তি করবার জন্য। সেদিনকার সেই অধিরূপ ভূয়িষ্ঠাপরিষদের সম্মুখে স্পন্দিত

হৃদয়ে দাঁড়িয়ে জানালাম যে যদি উত্তর মেঘের ৫৫টা শ্লোক আমি একে একে আবৃত্তি করতে থাকি তা হলে সেদিনকার সেই নিদাঘ তপ্ত অপরাহ্নে কবি পূজার পরিবর্ত্তে বিদ্বৎমণ্ডলীর ধৈর্য্যের ও সহ্যের পরীক্ষা গ্রহণ করাই হবে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আমার ইচ্ছা ও যুক্তিমত শ্লোক সংখ্যা কমিয়ে পাঠ করবার অবাধ অধিকার দিলেন। উদ্যোগ আরম্ভের মধ্য দিয়ে স্পষ্টই প্রতিয়মান হোলো যে সেদিনকার প্রধান হোতা শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। অব্যবহিত পরেই উদাত্তকণ্ঠে আদেশের ভঙ্গীতে জানালেন যে অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্র পাঠচক্রের উদ্যোগে এবং গুরুদেব সংস্কৃত ভাষার বিকৃত উচ্চারণ সহ্য করতে পারতেন না; যদি অসুবিধা না হয় তা হলে বিশুদ্ধ উচ্চারণেই যেন আমি পাঠ করি; বলা বাহুল্য শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই প্রচলিত বাঙ্গালীর উচ্চারণেই অভ্যস্ত এবং পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বিজ্ঞপ্তির পর আর কোন কথাই অচল। সেদিন আমার আবৃত্তি চেষ্টা কতটা ফলবতী হয়েছিলো জানি না, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ে ও আলাপে যে অনতুভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভে ধন্য হয়েছিলাম তার জন্য সর্ব্ব প্রথম ধন্যবাদ দিই আমার সোদরপম সুহৃদ ডাঃ অধিকারীকে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ বহু মনীষীর মেঘদূত ও কালিদাস আলোচনায় সেদিনকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল। তাঁর রুচি, সংস্কৃতানুরাগ ও রবি ভক্তির এই প্রথম নিদর্শন পেলাম। ঐ দিন থেকে আমি রবীন্দ্র পাঠচক্রের ঘরের লোক হয়ে গেলাম। কালিদাসের মেঘদূতের আলোচনার জন্যই হোক বা আমার আবৃত্তির দৈন্যে পীড়িত হয়েই হোক পরদিনই পর্জ্জন্যদেব অশ্রুবর্ষণ করে প্রাবৃটের সূচনা করে দিলেন।

তারপর এল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তর্পণ-দিবস ২২ শে শ্রাবণ। যথাকালে পাঠচক্রের আহ্বান এল, অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। এবার আদেশ হল উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার। সভয়ে এবং সকাতরে জানালাম যে আমি "রবীন্দ্র-সঙ্গীতে" নেহাৎ আনাড়ী। এবারেও ত্রাতা শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়;—অভয় দিয়ে বললেন যে স্থান ও কালোপযোগী যে কোন সংগীত আমি গাহিতে পারি। বেঁচে গেলাম! মঙ্গলাচরণরূপে একটী কীর্ত্তন গাহিলাম, তার মধ্যে ছিল "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে" শ্লোকটী। নারায়ণ, গুরুজন ও কবিগুরুর আশীর্ব্বাদে সেদিনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার হাত দুটী দৃঢ় বলে চেপে ধরে বললেন "ডাঃ রায় আমার মৃত্যুর পর যদি আপনি জীবিত থাকেন, নিশ্চয়ই তা থাকবেন, তা হলে আমার শ্রাদ্ধবাসরে আপনাকে এই কীর্ত্তনটী গাহিতে হবে,—আমার উইলে আমি লিখে যাব; আমার আত্মা পরম শান্তি পাবে"—আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে একটী বৈদ্যুতিক শিহরণ জাগিয়ে তিনি এই কথা বললেন,—যেন দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিলেন যে আমাদের

এই সম্বন্ধ এই বন্ধন নূতন নয়, যেন কোন অনাদিকালের পৃষ্ঠায় এর রেখা সম্পাত হয়ে রয়েছে। আমি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ; নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে রহিলাম; তখনও তিনি আমাকে তেমনি ধঁরে রয়েছেন, নাড়া দিয়ে হাসিমুখে বললেন— "মনে থাকবে ত?" জবাব দিলাম "সেত আমার মহাভাগ্য;" মনে হল যেন আজ একটী সত্যকার মানুষের স্পর্শ অনুভব করলাম। একটি প্রাণের সাড়া পেলাম, একটী শিশুর অনাবিল মধুর হাসি উপভোগ করিলাম। সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ ও নানা আলোচনার ভিতর দিয়ে সেই স্মরণীয় সন্ধ্যা অতিবাহিত হল। তাঁর হৃদয়ের পরিচয় এই দ্বিতীয় দিন পেলাম।

এমনি করে তাঁর সঙ্গে প্রচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, উপনিষদ, ইতিহাস, যখনই যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তাতেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা নিষ্ঠা ও সারল্য আমায় মুগ্ধ করেছে।

তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র বহুমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখেছি। কখনও দেখতাম বাঁকুড়ার "সম্মিলনী চিকিৎসা বিদ্যালয় ও হাঁসপাতালের" উন্নতির জন্য তাঁর ব্যগ্রতা ও ব্যবস্থা, কখনও বা নিরক্ষর প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য তাঁর ব্যগ্রতা ও ব্যবস্থা, কখনও বা আর্ত্তসেবায় আত্মনিয়োগ। স্বাস্থ্য তাঁর পূর্ব্বে কেমন ছিল তার পরিচয় কখনও পাইনি কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই দেখতাম স্বাস্থ্য তাঁর ভাল ছিল না। তথাপি মনে হোতো কর্ম্মসাগরে ডুবে থাকবার জন্য তাঁর প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকত, মনে হোতো যেন এই অন্তঃগূঢ় ঘনব্যথা সাধকের অন্তরের নিগূঢ়তম মর্ম্মস্থলে কোন করুণ কাহিনী জেগে রয়েছে যাকে ভোলবার জন্য তিনি কোন না কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকতে চাইতেন। জানি না আমার এ অনুমান সত্য কিনা। এত পরিশ্রম শরীর সহ্য করতে পারলে না; একদিন বিলাস বাবুর কাছে শুনলাম যে সুকুমার বাবু হৃদরোগে শয্যাশায়ী। সেই দিনই দেখা করতে গেলাম; গিয়ে দেখলাম উত্থান শক্তি রহিত, শ্বাস-কষ্ট পীড়িত এবং কথা কইতেও হৃৎকষ্ট বর্দ্ধিত হয়। বুঝলাম দিনসংখ্যা গণনার শেষ সীমানায় আগত প্রায়। অত্যন্ত ব্যথিত ভারাক্রান্ত চিত্তে ফিরে এলাম। তারপর রোগ শয্যায় বার কয়েক সাক্ষাৎ করেছি, হাতধরে অনেকক্ষণ নীরবে কেটে গেছে আলাপের উপায় ছিল না, কষ্ট লাঘবেরও কোন পন্থা ছিল না। তাঁর সঙ্গে শেষ কথা আমার হাতখানি ধরে কষ্টে বলেছিলেন "আপনার সঙ্গে আমার Spiritual relation আমার অনুরোধ ভুলবেন না" তাঁর সঙ্গে এই শেষ অশ্রুপাত।

কুলা ভেঙ্গে গেল, বিহঙ্গ ছুটি পেল, কালের বক্ষে আর্ত্তরোদন জুটিয়ে পড়ে মিশিয়ে গেল।

তাঁর শেষ অনুরোধ রক্ষাও একরকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই করতে পেরেছি

নারায়ণের ইচ্ছায় ও আশীর্ব্বাদে। তাঁর কন্যা পুষ্পরাণী পিতার চতুর্থ-দিবসানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধে একরকম জোর করেই আমায় তাঁর বাড়ীতে হাজির করালেন। বিলাস বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লতিকা দেবীর সঙ্গে এবং সেই শ্রাদ্ধ বাসরে যোগিবরের ইচ্ছা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হোল। পরে তাঁর একাদশ দিবসানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেই সময়ে নিজের অসুস্থতায় শয্যাগত থাকায় যেতে পারিনি। মনে হলো যে বড় ভাগ্য মহাপুরুষের কন্যা পুষ্পরাণী ও তদনুপমা শ্রীমতী লতিকা দেবীর সহিত শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করবার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম।

এই অনাড়ম্বর আত্মভোলা নীরব কর্ম্মীর এই রকম অবসান প্রাচীন কবির কথা স্মরণ করিয়ে দিল—

কুসুম স্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তীস্তু মনস্বিনঃ।
সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধ্নি সংস্থানং বিশীর্য্যেত বনেঽথবা ॥

স্নেহধন্য
শ্রীইন্দুভূষণ রায়

TO THE UNTRAMELLED BIRD*

(Translated by Sukumar Chatterjee and revised by Rabindranath)

Today a deep, dark shroud has descended upon the Earth,
Stretching across to the farthest horizon:
Today we cry out and enquire,-
We the birds of the cage-
O friend of my soul, listen unto me, my friend
Has the terrible night of Doom arrived ?
Has the Eternal light been wiped out ?
Has the solace of all days been lost to us ?
Is there no remnant left of the abounding grace of God ?
We look towards you and cry out in the agony of our souls,
We the birds of the cage.
When on a sudden the Spring came, intermittent gusts of Southern breeze,
Wafted the fragrance from the distant groves
Bearing messages of hope !
O friend of my soul, listen unto me, my friend.
At times when the dawn came at the end of the night,
The laughter of the morning penetrated into the cage,
Its magic chased away the despair of the fettered
And we felt a kinship with the great world of the free,
We, the birds of the cage.
Behold today we look at the Eastern mount of sunrise, but nothing is to be seen,
Not even a faint line of gold has been traced, burning the fringe of the dark expanse.
O friend of my soul, listen unto me, my friend,
The chains that bind us are more galling than ever
There is nothing to make us forget the misery of our cage.

Whom do we, with unavailing quest, inside our hearts and outside ?
That we may conjure up an illusion and delude ourselves—
Even that little light we have lost,
We the birds inside the cage.
But let not this anguish born of fright
Give pain to your soul,
Do not sit at the door of our cage and cry out your heart with profitless yearning—
O friend of my soul, listen unto me, my friend,
No iron fetters bind your feet,
Do thou soar above the range of the clouds
And pour out your songs from the limitless blue
Call unto us and proclaim that the morning sun has not gone out
So that we may close our eyes and believe you—
We, the birds of the cage.

* মোহিত কুমার সেনের সম্পাদনায় কাব্যগ্রন্থের রবীন্দ্রনাথের 'আজিকে গহন কালিমা লেগেছে ওগো' এই কবিতার অনুবাদ।

"শ্রদ্ধাঞ্জলি"

আমাদের সাথে তোমারে হারায়ে
ঝরেছে যাঁদের নয়ন জল,
পুষ্পাঞ্জলি ভরা অর্ঘ্যেতে
রহিল মিশায়ে সে পরিমল।
প্রীতি সৌরভে কত গৌরবে
তোমার পুণ্যকাহিনী গাথা,
বন্দনা করে সে মনিষী জনে
তনয়া শ্রদ্ধা আনত মাথা।

শুদ্ধিপত্র

১৩ই ডিসেম্বর বইটী বের করবার জন্য তাড়াতাড়ি করায় প্রথম ৫।৬ ফর্মায় প্রচুর ছাপার ভুল থেকে গেছে। পরে ততটা হয়নি। এই ত্রুটির জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। নিম্নে শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল। তবুও তাড়াতাড়ির জন্য অনেক ভুল অসংশোধিত রয়ে গেল। সংগ্রাহিকা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৭	র্তার	তাঁর
৮	১৪	শর্দ্দেুল	শার্দ্দুল
৯	১১	ভূলি	ভুলি
১১	১৫	কারন	কারণ
১১	২৭	বাড	বাড়ী
১৩	১৫	ভূলি	ভুলি
১৩	৫৩	কাহে	কহে
১৫	৪	ব্যাবহার	ব্যবহার
১৫	২১	ব্যাথা	ব্যথা
১৫	২৫	বণিতে	বর্ণিতে
১৮	১৬	সকলেরই	সরিলেই
১৮	২২	তার	তাঁর
১৯	৬	বেডিয়ে	বেরিয়ে
১৯	১২	ধৈয্যেয়	ধৈর্য্যের
১৯	১২	নিয়েছে	দিয়েছে
২০	২২	নৌহিত্র	দৌহিত্র
২২	৪	কাজ	কাছ
২২	১২	আমার	আবার
২২	১৩	দিলে	দিয়ে
২২	২১	ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা
২৩	৬	পরাপাকারী	পবোপকারী
২৩	২৭	যালে	যাবে
২৪	২৮	অপব্যাবহার	অপব্যবহার
২৫	১৩	অসুখের	অসুখের

২৫	২১	জিগেশ	জিগেস
২৬	১৪	কোথাউ	কোথাও
২৭	১৮	ব্যার্থিত	ব্যথিত
২৯	১৫	খুল্ল	খুল্ল
৩০	৭	বাঁকুরা	বাঁকুড়া
৩১	১৬	দেয়ো	দেওয়া
৩৪	৩	গিস্‌লেন	গিছ্‌লেন
৩৭	৩২	জিগেশ	জিগেস
৪০	৩	জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ
৪৪	১০	ব্যাস্ত	ব্যস্ত
৪৪	২৪	ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা
৪৪	২৯	ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা
৪৫	৩	অপব্যাবহার	অপব্যবহার
৪৫	৩	টচার	৮ টার
৪৫	৬	ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা
৪৫	১৭	ব্যাবহার	ব্যবহার
৪৫	১৮	বিন্দুমাত্র	বিন্দুমাত্র
৪৫	২৯,২১	ব্যাবহার	ব্যবহার
৪৫	২৫	কর্তৃত্ব	কর্ত্তৃত্ব
৪৫	২৭	বসে	বলে
৪৫	২৭,২৮,২৯,৩০	কোথাউ	কোথাও
৪৯	১৪	অপ্রস্তই	অপ্রস্তুতই
৫০	১০	তিরষ্কার	তিরস্কার
৫২	৩	মোনাকে	মোনোকে
৫৩	৯	ধের্য্যচ্যুতি	ধৈর্য্যচ্যুতি
৬৩	১৯	কনেছিলুম	করেছিলুম
৫৫	৬	প্রোঢ	প্রৌঢ়
৫৫	২৭	ছুটে	ছুটে
৫৭	২৫	বষয়	বিষয়
৬৩	১৯	কোথাউ	কোথাও
৬৫	৬	রাখাটি	রাখীটি
৬৬	৭	মেনোদিদি	মোনোদিদি
৭৩	১৬	১৩ই	৮ই
৭৭	১৪	যন্ত্রনা	যন্ত্রণা

৭৯	২৪	অধ্যয়	অধ্যায়
৮০	২১	হয়ে	হতে
৮৫	২৭	রানী	রাণী
৮৬	১৭	খয়চ	খরচ
৮৮	৩১	রক্ষায়	রক্ষার
৮৯	২৭,২৮	ইন্দুবোস	ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়
৯৭	৭-২৪, ২৭	সেই	নেই
৯৭	২১	নির্ভর	নির্ভর
৯৮	১৪	ভাল	ভাল
৯৯	১	সকলে	সকালে
১০০	১৬	খোজেন	খোঁজেন
১০১	২৪	শিগ্নির	শীগগির
১০৩	৩০	আমি এলে।	অমি এলে
১০৩	৩১	আমার	অমির
১০৭	১০	বল্লম	বললুম
১০৭	১৭	অন্তরর্যামী	অন্তর্যামী
১২২	৩	ধীরেন্দ্র মাথ	ধীরেন্দ্রনাথ
১১২	৭	কর্ম্মবচিব	কর্ম্মসচিব
১১৩	৭	Visya	Viswa
১২৪	১৯	accoutant	accountant
১৭৪	১৪	রোনাণ্ড	রোনাল্ড
১৭৪	২৮	ঋষীপ্রতীম	ঋষীপ্রতিম
১৮৬	১৪	সচীব	সচিব
১৯৯	২৮	অনাত্মীয়	অনাত্মীয়
২৫৫	১৯	Claus	Olaus.